মুক্তিযুদ্ধ
নাবিক ও নৌ-কমান্ডোদের জীবন গাঁথা



কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান



লেখক পরিচিতি

মোঃ খলিলুর রহমানের জন্ম ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০। বাড়ি সাতক্ষীরা জেলায়। তিনি ১৯৬৮ সালে বিএল কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং বাগেরহাট পিসি কলেজ থেকে ১৯৭৩ সালে কৃতিত্বের সাথে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। কলেজ জীবনে ৬ দফা এবং ১১ দফা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৬৮-৭০ সাল নাগাদ তিনি ছাত্রলীগের কলেজ শাখার সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সম্পাদক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পূর্ব ভাগেই তিনি কলেজ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। ২৬ মার্চ বিদেশী প্রচার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার খবর প্রাপ্তির পর পরই ২৭ মার্চ থেকে সহপাঠিসহ ক্যাপ্টেন শাহজাহান আলীর অধীনে দেবহাটা থানার সম্মুখস্থ মাঠ প্রাঙ্গণে ছাত্র-যুবক, পুলিশ-ইপিআর সম্মিলিত দলের সাথে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করেন। প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি ২০ এপ্রিল প্রথম পারুলিয়া ব্রিজের মুখে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে পরাজয় বরণের পর ভারতের টাকিতে অবস্থান পরিবর্তন করেন। পরবর্তীকালে এখানে ৯ নং সেক্টরের সদর দফতর প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তিনি এই ক্যাম্পে থেকে যুদ্ধে নানাবিধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২৮ এপ্রিল সাত জনের একটি ছাত্র প্রতিনিধি দলসহ তৎকালীন সিপিএম নেতা ও পরবর্তীতে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসুর শরণাপন্ন হন এবং তাঁর কাছে যুদ্ধের জন্য সাহায্য প্রত্যাশা করেন। কোলকাতার নারকেল ডাঙ্গা কলেজ

(পরের ফ্ল্যাপে দ্রষ্টব্য)

মুক্তিযুদ্ধ
নাবিক ও নৌ-কমান্ডোদের
জীবন গাঁথা

কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০১

প্রকাশক
শিরীন রহমান
৪ নীলাম্বর সাহা রোড
সেকশন, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫
ফোন ৮৬১৮০৪১

কৃতজ্ঞতা
বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী

প্রচ্ছদ
আশরাফুল হক মুকুল

গ্রাফিক্স
মোঃ আবু ইউছুফ রোমান

অঙ্গসজ্জা
সুইদিশ এইচ. সাংমা

কম্পিউটার কম্পোজ
নূপুর রহমান

মূল্য
পাঁচশত টাকা
Price U.S. $ 20 only.

মুদ্রণ
বর্ষা প্রাইভেট লিমিটেড
৮/৩ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
ফোন ৮৬১৭১৫৮, ৮৬১১৪৩৩

উৎসর্গ

যে প্রজন্ম
মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি

ভূমিকা

স্বাধীনতার পর অতিক্রান্ত হয়েছে আড়াইযুগ। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। এই অতিবাহিত সময়সীমার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ যাঁরা আজো বেঁচে আছেন এবং যাঁরা স্বদেশের টানে এই কঠিন সময় আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে তাঁদের অবদান পরিচিতি তুলে ধরার তেমন কোন গ্রহণযোগ্য উদ্যোগ আজো নেয়া হয়নি। তাই এ সম্পর্কে সঙ্গত কারণে পরবর্তী প্রজন্ম এখনো অজ্ঞাত।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বই যে একেবারে প্রকাশিত হয়নি উল্লিখিত সময়ের বেষ্টনীতে তা নয়। সেখানে যা প্রকাশিত হয়েছে তার বিষয়ও শুধুমাত্র যুদ্ধ কিন্তু এই যুদ্ধ পরিচালনাকারী যে ব্যক্তিটি জীবনবাজি রেখে নাড়ীর টানে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন তাঁর ব্যক্তি পরিচিতি স্থান পায়নি। সেখানে শুধু গুটি কতক যুদ্ধের কাহিনী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যোদ্ধা সম্পর্কে তাঁর পরিচিতি বিষদভাবে তুলে ধরার কোন প্রয়াস চালানো হয়নি। যোদ্ধা ও যুদ্ধ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং পরিপূরক। এ দু'টো শব্দ থেকে কেবল যুদ্ধটাকে কেটে এনে তাকেই মুখ্য করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপুর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ অনেকে বীরত্বসূচক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কালেভদ্রে তাঁদের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে স্মৃতিচারণ করতে দেখা যায় কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে সে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অবদান ও ব্যক্তির সার্বিক পরিচিতি সম্পর্কেও আজকের প্রজন্ম অতটা পরিচিত নয়। মাঝেমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান জীবনচিত্র কি অসহায় রূপ নিয়েছে বা নিচ্ছে সে সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় লেখা চোখে পড়ে। সেখানে একজন মুক্তিযোদ্ধার আর্থ-সামাজিক চিত্রই তুলে ধরা হয়। স্পষ্ট হয়ে উঠে সে সকল মুক্তিযোদ্ধার মানবেতর জীবন কাহিনীর খন্ডচিত্র। স্বাধীনতা যুদ্ধের ত্রিশ বছর পরও আত্মত্যাগী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার করুণ জীবন কাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতিবাচক দিকই পরিস্ফুটিত হয়। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা কর্তৃক নিগৃহীত ধর্ষিত বা বন্দিত্ব জীবন কাটিয়ে ছিলেন তাঁদের সে সময়কার দু:সহ জীবনের স্মৃতিচিত্র তুলে ধরার কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। বিভিন্ন বই পত্রে যদিও ছিটে ফোঁটা চিত্র চোখে পড়ে তাও যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে আগ্রহেরই যেন ঘাটতি রয়েছে বহুলাংশে যা নিগৃহীতের পর্যায়ভুক্ত।

নাবিক ও নৌ-কমান্ডোদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণও কৃতিত্বের দাবিদার। অথচ এই বাহিনী ও তাঁদের অসমসাহসিকতার পরিচয় তুলে ধরার কোন প্রয়াস আজো নেয়া হয়নি। তবে নাবিক ও নৌকমান্ডোদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা যেমন সংরক্ষিত ও অসম্পূর্ণ, তেমনি তাঁদের সম্পর্কে জীবনী লেখাও বেশ কষ্ট সাধ্য। তারপরেও সাধ্যের গন্ডীর ভেতরেই এই জীবনীধর্মী বইটি রচনা একটি ভিন্ন ও প্রথম উদ্যোগ এটা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে

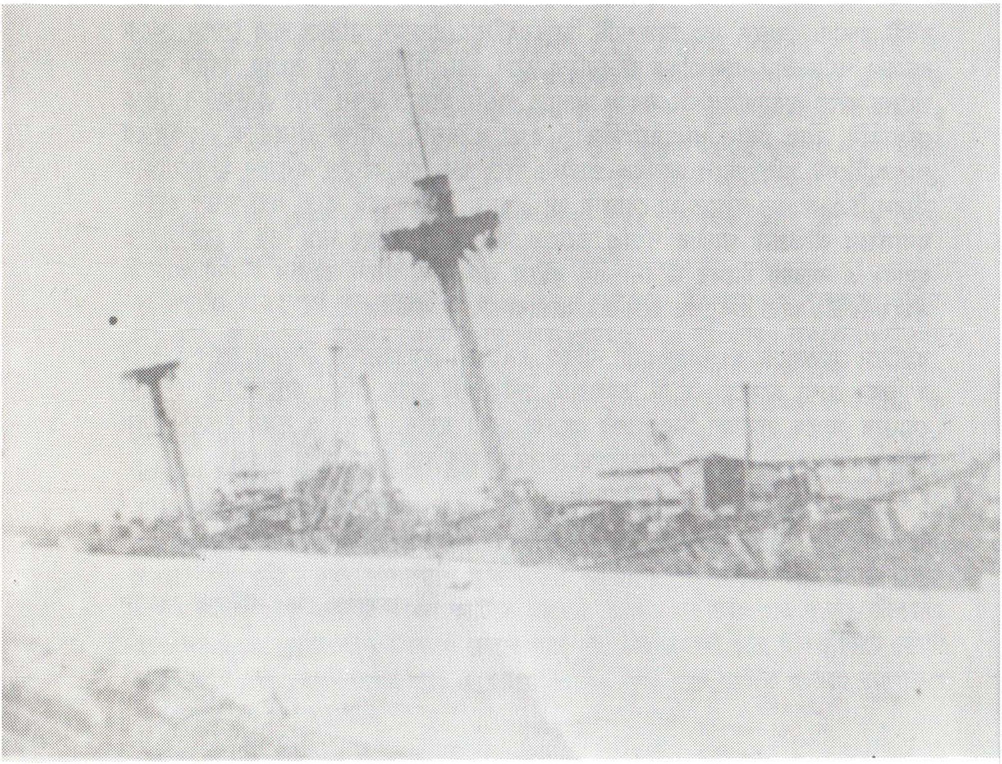
না। উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন দু'এর মধ্যকার বিভিন্ন জটিলতা থাকা সত্ত্বেও এই বইতে সন্নিবেশনের জন্য ৮৫০ জন নাবিক ও নৌকমান্ডোর জীবনচিত্র সংগ্রহ করতে প্রায় একযুগ নিরলস পরিশ্রম করতে হয়েছে। তারপরেও পরিশ্রম পুরোপুরি ফলপ্রসু হয়েছে তা বলবো না। তবে সাধ কে সাধ্যে পরিণত করতে নিরন্তর চেষ্টা করা হয়েছে।

নিরন্তর চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলপ্রসূ রূপায়ন হলো এই বইটি। আগেই বলে নেয়া ভাল যে, বইটি ইতিহাস নয়। ইতিহাসের তত্ত্ব বা বিশ্লেষণও নেই এই বইটিতে। স্বত:স্ফুর্তভাবে একজন নৌ-মুক্তিযোদ্ধা তাঁর সম্পর্কে তথা তাঁর যুদ্ধ সম্পর্কে ঠিক যেভাবে বলেছেন তারই পরিমার্জিত এবং লিখিত রূপ এ বইটি। বইটি রচনার এক পর্যায়ে দেখা গেছে একটি যুদ্ধের ঘটনা দুজন দুভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্যের দাবীদার তাঁরাই। সে সম্পর্কে তথ্য যাচাইয়ের কোন সুযোগ গ্রহণ করা হয়নি।

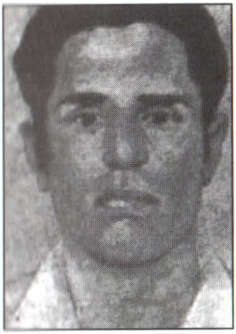
বইটি রচনার পেছনে মূল উদ্দেশ্যটি ছিল বইটিতে একজন মুক্তিযোদ্ধার শৈশব থেকে বর্তমান পর্যন্ত তাঁর ধারাবাহিক জীবনচিত্র তুলে ধরা। বইটির তথ্য সংগ্রহ পর্যায়ে যখন তাদের কাছে ধারাবাহিক জীবনকাল জানতে চাওয়া হয়েছে তখন তাঁরা এদিকটার গুরুত্ব দেখাননি, আর কোন ধারাবাহিকতাও রক্ষা করেননি। ব্যক্তি জীবনকে একেবারে পাশকাটিয়েই মুক্তিযুদ্ধকে সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। যে কারণে একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবন চিত্র অংকন বলতে যা বোঝায় তা এখানে একেবারেই তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। যথাসম্ভব অভিপ্রায় থাকার পরেও তথ্যের অভাবে অনেকের নাম এই বইয়ে গৃহীত হয়নি। এ কারণে যাঁদের জীবনী এই বইয়ে অন্তর্ভূক্তি পায়নি তাদের জীবনী পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় খন্ডে প্রকাশিত হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বইটিতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নাবিক এবং নৌ-কমান্ডোদের ঠিকানা সম্বলিত দু'টি তালিকা দেয়া হয়েছে। দু'টি তালিকাই নৌবাহিনী সূত্রে প্রাপ্ত। সেক্ষেত্রেও একজন যোদ্ধার সম্বন্ধে সত্যতা নিরুপণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। তথ্য ও সময় দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কমাণ্ডো মোঃ খলিলুর রহমান



'৭১ সালের ১৫ আগস্ট রাত্রে মংলা বন্দরে নৌ-কমান্ডো কর্তৃক ডোবানো সোমালিয়ান জাহাজ এস.এস. লাইটনিং।



বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ রুহুল আমিন, ১৯৩৪ সালে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার অর্ন্তগত বাগপাচড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আজহার মিয়া এবং মাতার নাম মুসাম্মৎ জুলেখা খাতুন। রুহুল আমিন বাগপাচড়া প্রাইমারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১৯৪৯ সালে সোনাইমুড়ী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মোহাম্মদ রুহুল আমিন ১৯৫১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে নাবিক হিসেবে যোগদান করে করাচীতে অবস্থিত পিএনএস বাহাদুর ও পিএনএস কারসাজ নৌঘাঁটিতে কর্মজীবন শুরু করেন। নৌবাহিনীর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এবং প্রকৌশল শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার-১ পদে উন্নীত হন। পরবর্তীতে তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর জাহাজ পিএনএস বাবর, পিএনএস খাইবার এবং পিএনএস তুগ্রীল-এ দক্ষতা ও কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। চাকরি জীবনে তিনি বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শুভেচ্ছা সফরে গমন করেন।

রুহুল আমিন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে নিয়োজিত থাকাকালে বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরন প্রত্যক্ষ করে '৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মোহাম্মদ রুহুল আমিন চট্টগ্রাম নৌঘাঁটির অধীনস্থ পিএনএস কুমিল্লা গানবোটে ইঞ্জিনিয়ার অফিসারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ২৫ মার্চের কালো রাত্রে বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর পাকিস্তান বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার পর তিনি কর্মস্থল ত্যাগ করে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং গ্রামের ছাত্র, যুবকদের সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। প্রায় দু'মাস প্রশিক্ষণের পর ১৯৭১ সালের মে মাসে রুহুল আমিন ২৫ জন দক্ষ লোক ও অকুতোভয় ছাত্র, যুবকসহ আগরতলা সেক্টর হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হন এবং তৎকালীন মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর নির্দেশক্রমে রুহুল আমিন ভারত থেকে প্রাপ্ত নৌজাহাজ বিএনএস পলাশ-এ যোগদান করেন। আগরতলা ত্যাগ করে প্রথমে ২৪ পরগণা জেলার হাসনাবাদে নৌবাহিনীর ডেটাচমেন্ট ক্যাম্পে যোগ দেন। এই ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নেভীর সাব লেঃ, বি. এম. আলম। কিছুদিন এখানে অবস্থান করার পর নৌবাহিনীর বাঙালি সদস্যের সংখ্যা বেড়ে যায়।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের ৮ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অক্টোবর মাসে রুহুল আমিন সহ ৪৪ জন বাঙালি নাবিক এবং ১২ জন নৌকমান্ডো খিদিরপুরে ''গার্ডেন রীচ ডক ইয়ার্ডে'' মেরামতাধীন (মডিফাইড) রণতরী 'পদ্মা' এবং 'পলাশ' এ যোগ দেন। একই সংগে তিনি বাংলাদেশের অপর রণতরী বিএনএস পদ্মা নামক নৌজাহাজের স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। গানবোট দু'টি মাইন বহন, জলসীমায় মাইন স্থাপন এবং ৪০/৬০ মি.মি. বিমান বিধ্বংসী কামান ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর ১২ অক্টোবর কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান প্রফুল্ল কুমার সেন কর্তৃক 'পলাশ' এবং 'পদ্মা' নামে কমিশন করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেন। প্রত্যেকটি জাহাজে দু'টি করে ৭০০ অশ্বশক্তির জার্মান ম্যান ইঞ্জিন এবং দুটি করে লাইট ইঞ্জিন বসিয়ে এরপর গানবোট দু'টিতে অন্যান্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ গ্রহণ করার জন্য আইএনএস নেতাজী সুবাস জেটিতে স্থানান্তর করা হয়। এখানে ভারত সরকারের মাধ্যমে বিপুল পরিমান কামানের গোলা, ক্ষুদ্র অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগৃহীত হয়। দু'টি জাহাজের গতিবেগ ছিল ১৫ নটিক্যাল মাইল।

নৌবাহিনীর বাঙালি কোন অফিসার মুক্তিযুদ্ধে যোগ না দেওয়ায় পদ্মা'র কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত হন ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ মিত্র এবং পলাশ এর লেঃ রায় চৌধুরী। দু'টি গানবোটের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন লেঃ নান্টু (আই.এন)। পদ্মার নির্বাহী অফিসার ছিলেন সাব লেঃ ব্যানার্জী (আই.এন)। আরও দু'জন ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডো অফিসার ছিলেন লেঃ ইকবাল ও লেঃ খলিল। জুনিয়র ছিলেন লিডিং সিম্যান চমন সিং। সুবাস জেটিতে প্রতিটি জাহাজে ৪টি করে মোট ৮টি মার্ক-১১ গ্রাউন্ড মাইন সাবধানতার সাথে বসানো হয়। প্রতিটি মাইনের ওজন ছিল ৫০০ পাউন্ড।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তায় গানবোট দুটি ভারতীয় জলসীমায় নৌ-মহড়া দিতে শুরু করে। ১০ নভেম্বর গানবোট দু'টি প্রথম মংলা বন্দরের প্রবেশ মুখে সন্তর্পনে ৮টি গ্রাউন্ড মাইন স্থাপন করতে সমর্থ হয়। রুহুল আমিন এই অভিযানে অংশ নেন।

নির্ভীক ও স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রাণ বাঙালি বীর সন্তানদের দুঃসাহসিক প্রতিরোধের ফলে দেশের অধিকাংশ স্থানে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পরাজিত ও নিহত হতে থাকলে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বুঝতে পারে বাঙালির বিজয় অবশ্যম্ভাবী। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর মংলা বন্দরে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণকালে বিএনএস পদ্মা এবং পলাশ মংলা বন্দর হয়ে খুলনার উদ্দেশে যাত্রা করে। এই অভিযানে ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডার মহেন্দ্র নাথ সামন্ত (মহা বীর চক্র) এর নেতৃত্বে আইএনএস পানভেল এবং বিএসএফ এর টহল জাহাজ চিত্রাঙ্গদা ও অংশ নেয়। রূপসা নদী বেয়ে খুলনা

শিপইয়ার্ডের কাছে পৌঁছলে বোমারু বিমানের আঘাতে রণতরী দুটিতে আগুন ধরে যায়। বিমান হামলায় রুহুল আমিন তাঁর ডান হাতটি হারান। ইঞ্জিনরুমে আগুন লেগে গেলে জাহাজে রক্ষিত গোলাবারুদ বিকট শব্দে ফুটতে শুরু করে এবং জাহাজ ক্রমে পানির নীচে তলিয়ে যেতে থাকে। জাহাজ রক্ষার আর কোন উপায় না দেখে তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তীরে উঠলে রাজাকার আলবদর বাহিনীর হাতে রুহুল আমিন বন্দি হন।

সেদিন রাজাকারদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মোহাম্মদ রুহুল আমিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অকুতোভয় বীর যোদ্ধাকে গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর স্থাপন করায় মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় সর্বোচ্চ ''বীরশ্রেষ্ঠ'' সম্মানে ভূষিত করা হয়। এই অভিযানে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের সহযোদ্ধা ছিলেন মোঃ আফজাল মিয়া বীর উত্তম, শহীদ দৌলৎ হোসেন মোল্লা বীর বিক্রম, জালালউদ্দিন বীর উত্তম, ক্যাপ্টেন মোঃ ইসহাক বিএন, আবু তাহের এমসিপিও(ই), চীফ রাইটার আতাউল হক, আঃ কুদ্দুস, রুহুল আমিন তালুকদার এম.ই-১, মুজিবুল হক, লেঃ (অবঃ) এ.মতিন, রফিকউল্ল্যা, সিরাজুল মাওলা (পিও) বীর উত্তম, কামালউদ্দিন অঃ সাঃ লেঃ। শহীদ নৌকমান্ডো রফিকুল ইসলাম, বশির আহমেদ নৌকমান্ডো, সামসুদ্দিন সামু নৌকমান্ডো, মানিক চন্দ্র নৌকমান্ডো, গোলাম রব্বানী নৌকমান্ডো, সিরাজুল ইসলাম নৌকমান্ডো সহ মোট ৫৬ জন নাবিক এবং নৌকমান্ডো।

১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মহান বীরের মরদেহ চরম অবজ্ঞা ও অবহেলায় রূপসা নদীর তীরে পড়ে থাকে। খুলনা শত্রুমুক্ত হলে তাঁর সহযোদ্ধারা স্থানীয় জনগণের সহায়তায় রূপসা রেল ষ্টেশনের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করেন।

(সূত্র বর্ণনা লেঃ কমান্ডার জালালউদ্দিন বিইউ, ক্যাপ্টেন মোঃ ইসহাক বিএন, আবু তাহের এমসিপিওই)



শহীদ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, আমাদের দেশের সংগ্রামের এক পর্যায়ে যে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা হয়েছিলো, তার ইতিহাস লেখার চেষ্টা করা হয়নি। কেবল বর্তমান প্রজন্ম নয়, সে সময়ে যারা যুবক বা প্রৌঢ় ছিলেন তাদেরও অনেকে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' ঐতিহাসিক মামলা এবং জড়িত ব্যক্তিদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামী অবদান ও মামলার পরিণতি সম্পর্কে বহুলাংশে অপ্রচ্ছন্ন ধারনা বহন করছেন। তার ফলে আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সশস্ত্র বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার কাহিনী ক্রমান্বয়ে আলোর বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ শাসকদের এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলার সূত্র ধরেই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।

লেঃ কমাণ্ডার (নেভি) মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে মামলা শুরু হওয়ার বারো বছর পূর্বে সামরিক বাহিনীর কতিপয় অফিসার ও কর্মী তাঁদের কর্মক্ষেত্রের বৈষম্য ও পূর্ব বাংলার ওপর নানা ধরনের নির্যাতনের প্রেক্ষিতে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের পর স্বাধীনতা ঘোষনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক শক্তির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের বেশ কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা গোপনে তাঁদের এই প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন দানের আশ্বাস ও দেন। এর অগ্রনায়ক ছিলেন শহীদ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। একদফা আন্দোলনের অগ্রদূত ও পাক সরকারের বাঙালি হত্যা তালিকার এক নম্বর ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সব কিছুর উপরে বিপ্লবী। সংগ্রাম ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল তার বিপ্লবী সংগ্রামের মূলতন্ত্র। বাংলা ১৩৩৯ সালের ২ আশ্বিন, রবিবার, তৎকালীন বরিশাল জেলার, পিরোজপুর থানার অর্ন্তগত ডুমরিতলা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোফাজ্জেল আলী ও মাতা লতিফুন্নেছা বেগম। পিতা ছিলেন একজন সরকারী চাকরিজীবী। ১৯৪৭ সালে, মোয়াজ্জেম হোসেন মেট্রিক পাশ করে বাগেরহাট মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষা জীবনের সূচনা করেন। ১৯৫০ সালে ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে যোগদান করেন। সেই বছরই কর্তৃপক্ষের মনোনয়ন লাভ করে রাজকীয় নৌ-বাহিনীতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বৃটেনে প্রেরিত হন। বৃটিশ নৌ-বাহিনীর সুপারিশক্রমে তিনি পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এক বছর চাকরি করার পর মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিশেষ শিক্ষা লাভের জন্য মনোনীত হন ও পুণরায় বৃটেনে গমন করেন। ১৯৫৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি ফরিদপুর জেলার, পাংসা থানার মরহুম জনাব কাজী আবদুল মাজেদ এর কনিষ্ঠ কন্যা কোহিনুর বেগমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁদের দুই

ছেলে ও এক মেয়ে ওয়ালী নোমান, ওয়াসী নোমান ও ওয়াদিয়া নোমান। এখন সকলে প্রবাসী।

তিনি ১৯৬৬ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে বদলি হন এবং ১৯৬৭ সালের ১১ মার্চ পুনরায় তাঁকে বরিশালে বদলি করা হয়। ১৯৫৭ সালে, ইংল্যান্ডে অবস্থান কালে লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি করে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক ও সামরিক রণকৌশলের নকশা তৈরি করেন।

১৯৫৮ সালে এই বিদ্রোহের পরিকল্পনা নেয়া হয়। তাঁদের ধারণা ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল সম্ভব হবে। প্রস্তুতি পর্বে এর সাথে কোন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক না থাকলেও পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানী, কর্ণেল (অব:) ওসমানী ও কয়েকজন পদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাথে তাঁদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম পরিকল্পিত নতুন রাষ্ট্রের একটি শাসনতন্ত্র ও রচনা করেছিলেন এবং রাষ্ট্রের নাম, পতাকা পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছিল। মনোরা দ্বীপের হিমালয়া নৌঘাটিতে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালির বিদ্রোহের পরিকল্পনা এই প্রথম। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন যদিও অতিমাত্রায় গোপনীয়তা রক্ষা করতেন তবুও প্রয়োজনে তিনি বিশ্বস্ত কয়েকজনের কাছে এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তাদের সক্রিয় ভাবে সম্পৃক্ত করেন।

১৯৬০ সালে পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের পর সামরিক ছাউনির ভয়ংকর বেড়াজালের ভেতর থেকেই ১৯৬৪ সালে 'বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী' নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। অস্ত্র সাহায্যের আশায় যোগাযোগ করেন ছয়-সাতটি বিদেশী দূতাবাসের সাথে। শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করলেন ভারতীয় দূতাবাসের ১ম সেক্রেটারী মিঃ পিএন ওঝার সাথে।

এর পূর্বে বিদ্রোহীরা দীর্ঘ সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাঁদের কর্মতৎপরতা এগিয়ে নিয়ে যান। অসংখ্য গোপন মিটিং ও কুটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থ এবং অস্ত্রও সংগ্রহ করেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে তাঁদের গোপন কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের দ্বিতীয় দফায় আলোচনা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের অন্যতম এবং বর্তমানে জীবিত মোহাম্মদ খুরশীদ (নেভী) জানান বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে শেখ মুজিবের ৩ অথবা ৪ বার গোপন বৈঠক হয়েছিল। প্রতিবারই শেখ মুজিব তাঁদের কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন এবং তার সহযোগিতার কথা বলেন। এই মামলার ৮ নম্বর আসামী কর্পোরেল (অব:)

আব্দুস সামাদও ঘটনার সত্যতা এবং অস্ত্র সংগ্রহের কথা স্বীকার করেন। মামলার অপর আসামী লে: ক: (অব:) আব্দুর রউফ পরিকল্পনাকারীদের যে সব গোপন বৈঠক হত তিনি তার বিবরণ লিখে রাখতেন। তিনিও এই পরিকল্পনা সত্য বলে জানিয়েছেন।

১৯৬৭ সালের ১২ জুলাই, অস্ত্রের ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনার জন্য ষ্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও আলী রেজা সমন্বয়ে গঠিত তার প্রতিনিধি দল বেলোনিয়া হয়ে আগরতলা গমন করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জনৈক কর্ণেলের সাথে অস্ত্র সাহায্যের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ বৈঠকের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে ''আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'' দাঁড় করে। ১৯৬৭ সালের ৯ ডিসেম্বর ১৮০নং সিদ্ধেশ্বরী রোডে তাঁর অনুজ 'রাজ' এর বাসা থেকে মোয়াজ্জেম হোসেনকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনানুযায়ী গ্রেফতার করা হয়। এরপর থেকে দৈনিক সকাল-সন্ধ্যা দুবার তাঁর উপর বিভিন্ন সামরিক কায়দায় অমানুষিক নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালানো হয় এবং তাকে আটক রাখা হয় কুর্মিটোলা সেনানিবাসে তৃতীয় পাঞ্জাব মেসে। এখানে যে ঘরে তিনি বন্দি ছিলেন তার একপাশে থাকতেন আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যপাশে জনাব রুহুল কুদ্দুস। ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি থাকাকালীন তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে ও বুঝতে পারেন। শেখ মুজিবুর রহমানও অন্তরঙ্গভাবে তাঁকে উপলব্ধি করেন। তৃতীয় পাঞ্জাব মেসের বন্দীশালা থেকে একটি বড় গাড়িতে স্পেশাল ট্রাইবুনালে তাদের আনা হতো। গাড়িতে উঠেই সহকর্মীদের নিয়ে মোয়াজ্জেম হোসেন সমস্বরে গাইতেন- ''ধন-ধান্যে পুষ্পে-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'' এবং ''বাংলা মার, দুর্নিবার, আমরা তরুণ দল''। একবার তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তার অনুগত কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে স্বীকার করবেন, ''আমরা দোষী। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেছি। সুযোগ পেলে ভবিষ্যতেও করব''। কিন্তু প্রধান কৌশলী সালাম খান ও শেখ মুজিবুর রহমান এর পরামর্শে এ সিদ্ধান্ত তিনি পাল্টান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আগাগোড়া ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সরকারের সমস্ত অভিযোগ আর বিপ্লবীদের সমস্ত গোপন কাজ চলেছে মোয়াজ্জেম হোসেনকে কেন্দ্র করে। সরকারী উকিল জনাব কাদেরের পরামর্শেই শেষে মামলার নাম 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান' করা হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। এই মামলার ফলে রাজনৈতিক গণসচেতনতা জাগ্রত হয়। সাথে সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে। মামলার আসামীরা ব্যাপক জন সমর্থন অর্জনে সমর্থ হন। অন্যদিকে সরকারের কাছে এই মামলা আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সরকার নি:শর্তভাবে মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। একজন বাদে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ মুক্তি

দেয়া হয়। উল্লেখ্য ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে আসামী আমীর হোসেন বিশ্বাস ঘাতকতা করে পিন্ডিতে নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার অফিসে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহ সংক্রান্ত সমস্ত গোপন ঘটনা লিখিত ভাবে ফাঁস করে দিয়েছিল। মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দি অবস্থায়ই ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ঢাকা সেনানিবাসে হাবিলদার মঞ্জুর শাহ গুলি করে হত্যা করে।

১৯৬৯ সালে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হতে মুক্তি লাভের পর বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি দেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে দাবী আদায়ের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ব্যর্থ হন।

১৯৭০ সালের ১০ মে, পল্টন ময়দানে তার রাজনৈতিক জীবনে প্রথম জনতার সম্মুখীন হন। বাংলাদেশের নেতাদের মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে স্বাধীন বাংলার স্বপক্ষে বলতে গিয়ে বলেন, ''সাতকোটি বাঙালি আজ মুক্তির নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে। তারা বাঁচতে চায়। মানুষের মত বাঁচতে চায়। তারা নিজেদের ভাগ্যের মালিক নিজেরাই হতে চায়................. বাংলাদেশ বাঙালির। বাংলার ভাগ্য নিয়ন্তা হবে বাঙালি। তিনি কোন বিদেশী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর এ বাংলাতন্ত্রের ভিত্তি ছিলো পাঁচটি- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা।'' তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে জনতার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে জনতার কাছে ছুটে যান তিনি। জনসভার পর জনসভা করেন। তাঁর কথা জনতার কাছে সুন্দর ও সহজ ভাবে ব্যক্ত করেন। একাত্তরের প্রথম দিকে তিনি সামরিক, বেসামরিক ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের সমন্বয়ে পুণরায় গঠন করেন গুপ্ত সশস্ত্র বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী। ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক বাঙালি অফিসার তাকে বলেন, ''সরকার ইকবাল হল ও তাঁর উপর খুব খেপে আছে। যে কোন মুহূর্তে ইকবাল হলের উপর আক্রমণ হতে পারে এবং তাকে হত্যা করতে পারে''। এ ঘটনার পর তিনি তার বিশ্বস্ততম সহকর্মী মানিক জামান সাহেবের ২নং বিজয় নগরস্থ (শহীদ বাবুলের বাড়ি) বাসভবনে গভীর রাত পর্যন্ত তারা দুজন সশস্ত্র বিপ্লবের বিষয়ে আলোচনা করতেন। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেনকে এক জরুরী বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। বৈঠকে তিনি বলেন, ''দেশের বর্তমান অবস্থার একমাত্র সমাধান সশস্ত্র আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন নয়''। অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থের কথা তিনি উল্লেখ করলে শেখ মুজিবুর রহমান তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ তার গুপ্ত সশস্ত্র বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কিছু সদস্য নিয়ে চলে যান, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানের সামরিক অবস্থানগুলি পরীক্ষা করে দেখতে। ২২ মার্চ তিনি ফিরে আসেন। ২৪ মার্চ খুব ভোরে তিনি জামান

সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ, পল্টন ময়দানের জনসভায় ''জাতীয়তাবাদী দল'' নামে তার নবগঠিত দলের নাম ঘোষনার তারিখ নির্ধারন করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সৌভাগ্য তার হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আনুমানিক সকাল ৬-১৫ মিনিটে ৩৬নং এ্যালিফেন্ট রোডে অধ্যাপক আবুল হোসেন সাহেবের ভাড়া বাসা থেকে পাকবাহিনীর ২৬নং ইউনিটের কর্নেল তাজ এর নেতৃত্বে পাকবাহিনীর হাতে ৫টি গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহ পাকিস্তানী জল্লাদেরা মিলিটারী গাড়ির সাথে বেঁধে, রাস্তার উপর দিয়ে ছেচড়ে টেনে নিয়ে কোথায় ফেলে দেয় তা আজও অজানা। মৃত্যুর পূর্বে ২৬ টিরও বেশী জনসভায় তিনি বলেছিলেন ''আমি ছয় বুঝি না, নয় বুঝি না, এগারো বুঝি না, আমি বুঝি শুধু ১-দফা, যা বাংলা ও বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ''। ইতিহাস আজ প্রমান করে দিয়েছে তার ঐ বোধশক্তি কতখানি সত্য ছিল।

সূত্র: শহীদের স্ত্রী মিসেস কোহিনুর বেগমের সাক্ষাৎকার, তারিখ ৭-৬-২০০০।

শহীদ আব্দুর রকীব মিয়া, বীর বিক্রম, পিতা- হাজী হাতেম আলী মুন্সী। ১৯৪৬ সালে গাজীপুর জেলার অন্তর্গত সফিপুর এর শোলা প্রতিমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এস.এস.সি পাশ করার পর তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। প্রাথমিক এবং প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে বিভিন্ন জাহাজে এবং স্থাপনায় দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনী তার নৌবহরে সংযুক্তির জন্য ফ্রান্স থেকে দু'টি সাবমেরীন খরিদ করে। শহীদ আব্দুর রকীব মিয়াসহ ৫৪ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং নাবিককে উক্ত সাবমেরীন পরিচালনা করতে প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬৯ সালে ফ্রান্সের তুলন নৌঘাঁটিতে পাঠানো হয়। আব্দুর রকীব মিয়া সাবমেরীন ম্যানগ্রোতে দু'বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক ইআরও-২ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। উক্ত সাবমেরীনে তিনি ছাড়াও ১২জন বাঙালি কর্তব্যরত ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, বাংলাদেশে গনহত্যা শুরু হলে সাবমেরীনে অবস্থানরত বাঙালি নাবিকেরা বিদেশী প্রচার মাধ্যমে সেই সংবাদ জানতে পারেন। ২৬ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনার কথা জানার পর সাবমেরীনে অবস্থানকারী বাঙালিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গোপনে বৈঠক করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করতে থাকেন। ৩১ মার্চ, '৭১ তাঁদের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ১ এপ্রিল সাবমেরীন 'ম্যানগ্রো' ফ্রান্স ত্যাগ করে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রার কথা তারা জানতেন।

ইতিমধ্যে সাবমেরীনের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী ১৩ জন বাঙালির মধ্য থেকে ৯জন একমত হয়ে সাবমেরীন থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। এজন্য তাঁরা উক্ত নৌঘাটিতে প্রশিক্ষনরত আফ্রিকান কয়েকজন বন্ধুর সাহায্য নিয়ে ৩১ মার্চ, সন্ধ্যায় তুলন পোতাশ্রয় ত্যাগ করেন। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য 'দিয়ে স্পেনের মাদ্রিদে পৌঁছে এখানকার ভারতীয় দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে ভারতে পৌঁছানোর জন্য সাহায্য কামনা করেন। মাদ্রিদে ভারতীয় দূতাবাসের চার্যদ্য এফেয়ার্স ছিলেন মিঃ বেদী। তিনি ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে ৮ জন নাবিকের নিরাপত্তা প্রদান এবং বিমান যোগে ভারত পৌঁছানোর সার্বিক ব্যবস্থা করেন। তুলন থেকে ৯জন বাঙালি পক্ষ ত্যাগ করলেও পথিমধ্যে নাবিক আঃ মান্নান ভারতে না এসে লণ্ডন চলে যান।

১০ এপ্রিল '৭১ শহীদ আব্দুর রকিব মিয়া এবং অপর ৭ জন নাবিক নয়াদিল্লীতে পৌঁছে ভারতীয় নৌবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল এম.এ.জি. ওসমানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৮ জন নাবিকের মাঝে কোন সিনিয়র অফিসার না থাকায় চীফ পেটি অফিসার গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ দলের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন।

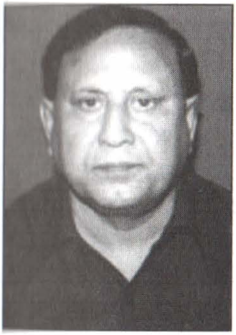
ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তারা পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগকারী নাবিকদের পরিকল্পনা জানতে চান। সেই সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কোন যুদ্ধ জাহাজ ছিলনা এবং জাহাজ খরিদ করার মত অর্থও ছিলনা। ফলে পাকিস্তান নৌবাহিনীর আগ্রাসন মোকাবেলা করার জন্য ৫০০ সদস্য নিয়ে একটি কমাণ্ডো বাহিনী তৈরির সমন্বিত সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেন। শহীদ আঃ রকীব মিয়াসহ ৮ জন নাবিক প্রথমে ভারতীয় নৌবাহিনীর অধীনে ১৫ দিন দিল্লীর পাশ্ববর্তী যমুনা নদীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর বিভিন্ন যুবশিবির থেকে যুবক মনোনীত করে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ঘাঁটি গড়ে তোলেন। ভারতীয় প্রশিক্ষকদের সাথে ৮ জন সাবমেরীনারও প্রশিক্ষক হিসেবে যুবকদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন।

অক্টোবর মাস পর্যন্ত আঃ রকীব মিয়া ক্যাম্পে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে একই মাসে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ৮ জন নৌকমাণ্ডোর একটি দল নিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ কালাইপাড়া মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ফুলছড়ি ঘাটে অবস্থানকারী পাকিস্তানী সৈন্যদের জন্য রসদ বহনকারী জাহাজ মাইন লাগিয়ে ধ্বংস করা। এই সময় ফুলছড়ি ঘাটে ৫টি অস্ত্র ভর্তি জাহাজ অবস্থান করছিল। ভূঞাপুরে মাটিকাটায় পূর্বে দু'টি জাহাজ মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তখন শত্রু জাহাজ অতি সতর্ক অবস্থায় ছিল।

২৫ অক্টোবর গাইড মুক্তিযোদ্ধা কালাচাঁদ এর সাথে পরামর্শ করে শহীদ আব্দুর রকীব মিয়া তাঁর অধীনের ৮ জন নৌকমাণ্ডোকে সাথে নিয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাটের দক্ষিণে একটি মাদ্রাসার পাশ দিয়ে ৫ মাইল প্রশস্ত যমুনা নদীতে নেমে পড়েন। বুকে একটি লিমপেড মাইন। বর্ষা মৌসুম হওয়াতে সে সময় নদীতে ছিল প্রচণ্ড স্রোত। স্রোতের অনুকূলেই কমাণ্ডোরা যমুনা পাড়ি দিয়ে ফুলছড়ি ঘাটে অবস্থানকারী জাহাজের নিকট পৌঁছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য জাহাজের সন্নিকটে পৌঁছানোর পর পরই জাহাজ পুণরায় যাত্রা শুরু করে। প্রচণ্ড ঘূর্ণায়মান স্রোতে কয়েকজন কমাণ্ডো তলিয়ে যান এবং জাহাজের প্রপেলারের আঘাতে তাঁর শরীর খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। অসমসাহসী যোদ্ধা সাবমেরীনার আব্দুর রকীব মিয়া এখানে শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শনের জন্য তাকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করা হয়। তাঁর এই আত্মত্যাগ এবং দুঃসাহসীকতা তুলনাহীন। শহীদের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব তাঁর প্রাপ্য ছিল, সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা এমন মন্তব্য করেন।

যমুনার প্রবল স্রোতে শহীদ আব্দুর রকীব মিয়া এবং অন্যান্য কমান্ডোদের পবিত্র মৃতদেহ ভেসে যাওয়ার ফলে স্বাধীন দেশের মাটিতে কোথাও সমাধিস্থ করা সম্ভব হয়নি।

(তথ্য: উইং কমান্ডার হামিদুল্লা খান বীর উত্তম এবং কর্নেল নুরুন্নবী খান বীর বিক্রম এর সাক্ষাতকার ভিত্তিতে)



গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ, বীর প্রতীক, একাত্তরের ১৩ মে, ভারতের পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ঘাঁটি। পাকিস্তান নৌবাহিনীর ৮জন অসমসাহসী বীর নাবিক পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফ্রান্সে প্রশিক্ষণরত সাবমেরীন থেকে পালিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে ভারতে চলে আসেন। এই দলটি ছিল বিদেশের মাটিতে সামরিক বাহিনীর ভিতরে প্রথম এবং বৃহৎ পক্ষ ত্যাগকারী সামরিক দল। ফ্রান্স থেকে পক্ষ ত্যাগকারী সাবমেরীনার দল ভারতীয় নৌবাহিনীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে নৌকমাণ্ডো বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্বল্প সময়ে, স্বল্প জনবলের মাধ্যমে অধিক সাফল্য অর্জনের জন্য এই রণনীতি গ্রহণ করা হয়।

ফ্রান্স থেকে পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং নৌকমাণ্ডো (আত্মঘাতী) দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন সাবমেরীনার গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ বীর প্রতীক, পিতা- মরহুম আলহাজ্ব শহর আলী গাজী, স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম- গড়ইখালী, থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; বর্তমান-৪০, বি.কে রায় রোড, খুলনা সদর, খুলনা। জন্ম ১৯৩৪ সালের ৪ এপ্রিল। গড়ইখালির এক ছোট মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। সেখান থেকে তাঁর নানাবাড়ি সোনাদানা গ্রামের পাঠশালা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মামা ছিলেন খুলনা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ।

তিনি ১৯৫৩ সালে খুলনা জেলা স্কুল থেকে ১ম বিভাগে মেট্রিক, ১৯৫৫ সালে বিএল কলেজ থেকে আই এসসি পাশ করেন। এ সময় তিনি প্রগতিবাদী ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। তিনি কলেজ শাখায় সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগদান করেন। সাড়ে চার বছর করাচীর কারসাজ ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। এখানে ভাল ফল করার প্রেক্ষিতে তাঁকে রেডিও ইলেকট্রিক্যাল আর্টিফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। অত:পর তিনি পিএনএস শাহজাহানে যোগদান করেন। কর্মদক্ষতার ফলে অতি অল্প সময়ের মাঝে কর্তৃপক্ষ তাঁকে পেটি অফিসার থেকে চীফ পেটি অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদান করে। ইতিপূর্বে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে কেহ পেটি অফিসার থেকে চীফ পেটি অফিসার হননি। একই সময়ে তিনি আইএসএসবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু বাঙালি হওয়ার দরুন তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়নি। অথচ একই সাথে আইএসএসবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অবাঙালিদের

পদোন্নতি দেয়া হয়। পাকিস্তানে চাকরিরত অবস্থায় তিনি বিএসসি এবং পরে লন্ডন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬৩ সালে তাঁকে সাবমেরীন গাজীতে বদলি করা হয়। ১৯৬৪ সালে তুরস্ক থেকে আগত ৪০ জন সাবমেরীনার দলের লিয়াজো অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৬৭ সালে তিনি তুরস্ক গমন করেন এবং সেখানে চীফ সাবমেরীন ইনষ্ট্রাকটর হিসেবে কাজ করেন। সে সময় তুরস্ক নৌবাহিনীর সাথে সাবমেরীন যোগে ব্লাক সি ও মেডিটারিয়ানসীতে বিচরণ করেন। এ সময় তুরস্ক কর্তৃপক্ষ তাঁকে ইস্তাবুল, ইজমীর, আঙ্কারা সহ বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়। অত্যন্ত দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে তুরস্ক কর্তৃপক্ষ তাকে সনদ প্রদান করেন।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে পুনরায় সাবমেরীনে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, নির্মাণ শৈলী এবং পাকিস্তান কর্তৃক খরিদকৃত সাবমেরীন মনগ্রো আনার জন্য কর্তৃপক্ষ তাকে ফ্রান্স প্রেরণ করে এবং এখানে দুই বৎসর ফ্রান্সের তুলন পোতাশ্রয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তিনি আন্ডার ওয়াটার সোনার গ্রুপ এর দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৭১ -এর ৩১ মার্চ প্রশিক্ষণ এর মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়। বিবিসি প্রচার মাধ্যমে ২৫ মার্চ '৭১ বাংলাদেশে গণহত্যার সংবাদ শ্রবণ করার পর জাহাজ মনগ্রোতে কর্মরত ১৩ জন বাঙালি নাবিকের মাঝে ৯ জন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করেন। এর আগে ফ্রান্সে তাঁদের খরিদকৃত গাড়ি ফ্রীজসহ মূল্যবান সামগ্রী পাকিস্তান পাঠিয়ে দেন যাতে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাদের মনোভাব বুঝতে না পারে। অনেক প্রতিকুল পরিবেশের মধ্য দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ৮ জন নাবিক ভারতীয় দূতাবাসের সাহায্যে ১০ এপ্রিল ভারত আগমন করেন। বোম্বের মেয়র বিমান বন্দরে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। যাত্রাপথে নাবিক আব্দুল মান্নান দল ত্যাগ করে লন্ডন চলে যান। সাথের অন্যান্য নাবিকরা জনাব রহমতউল্লার চেয়ে অনেক জুনিয়র থাকায় সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

বোম্বে থেকে তাঁরা দিল্লী পৌছানোর পর ভারতীয় যুদ্ধ বিষারদগণ তাঁর কাছে তাঁদের পরিকল্পনা এবং কিভাবে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চান তা লিখিত ভাবে পেশ করার জন্য বলেন। তিনি ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি প্লান কর্তৃপক্ষের নিটক জমা দেন। যার ফলশ্রুতিতে নৌকমান্ডো বাহিনী গঠিত হয়। ১৪ এপ্রিল ত্রিশ পৃষ্ঠার এই পরিকল্পনার একটি কপি তিনি দিল্লীতে জেনারেল ওসমানীর নিকট দিয়েছিলেন।

৮ জন নাবিক মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি ওসমানীর সাথে সাক্ষাৎ করে ভারতের নৌবাহিনীর যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনাক্রমে ১০০০ সদস্যের নৌকমান্ডো বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই

[illegible] প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন যুব শিবির থেকে ৩৫০ জন যুবক মনোনীত করে, ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। ৮ জন বাঙালি সাবমেরীনার এবং ভারতীয় প্রশিক্ষকদের দ্বারা ৩ মাস কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ৩৫০ জন যুবকের কমান্ডো প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ বীর প্রতীক, এই ক্যাম্পে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের পক্ষে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন।

অক্টোবর মাসে তিনি ৪০ জন কমান্ডোকে নিয়ে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে আগমন করেন এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, বিএলএফ সদস্য, নৌ কমান্ডো, ইপিআর, পুলিশ, সেনাবাহিনী সদস্য সহ প্রায় ৪০০০ মুক্তিযোদ্ধার বিশাল এক বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে তিনি হাতিরডাঙ্গায় নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পসহ অত্র এলাকায় ১৯টি মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ঘাঁটি গঠন করেন। সিনিয়র নৌকমান্ডো বজলুর রহমান নং-০০৯ ও শফিক আহমেদ নং ০১২৬ এর উপর প্রশিক্ষণ এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

গাজী মোঃ রহমতউল্লা'র নেতৃত্বে মংলা ও চালনা বন্দরে নৌকমান্ডো কর্তৃক অসংখ্য জাহাজ ধ্বংস এবং আশাশুনি থানা, দাকোপ থানা, পাইকগাছা থানা, কপিলমুনি, বারো আড়িয়া, বটিয়াঘাটা, বড়দল, চাপড়া রাজাকার ঘাঁটি শত্রুমুক্ত করা হয়। ১০ নভেম্বর তাঁর অনুজ আইয়ুব আলী গাজী শহীদ হন। কপিলমনি অপারেশন শেষে ফেরার পথে অপরভাই মূছা গাজী গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন এবং পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন। খুলনা শহর দখল করার জন্য তিনি তাঁর অধীনস্থ মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মরনপণ যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৭ ডিসেম্বর, খুলনা শহর দখল করেন এবং সার্কিট হাউসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। একই দিন পাকিস্তানী সৈনিকদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৭ ডিসেম্বর জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে তিনি ঢাকা চলে আসেন। ২৮ ডিসেম্বর ঢাকাতে সেক্টর কমান্ডারদের যে মিটিং হয় সেখানে তিনি ১০নং সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করেন। এদিন দেশ গঠনে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। সশস্ত্র বাহিনী পুন: গঠনের জন্য জিয়াউর রহমানকে প্রধান করে যে কমিটি হয় তিনি এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি সেদিন মিটিং এ নৌকমান্ডো এবং বাঙালি নাবিক যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের দ্বারা নৌবাহিনী গঠনের পরামর্শ দেন। তিনি জে: ওসমানীর অধীনে বাংলাদেশের নৌবাহিনী গঠনের জন্য দায়িত্ব লাভ করেন। এই সময় নৌবাহিনীর হাতে কোন যুদ্ধ জাহাজ ছিল না। এসটাবলিশমেন্ট বলতে চট্টগ্রামে ঈশা খাঁ, খুলনায় তিতুমীর, নারায়নগঞ্জে মেরীন একাডেমীও ঢাকাতে বর্তমানে নৌ প্রধানের বাড়িটি সে সময়ও নৌবাহিনী ব্যবহার করতো।

তিনি ঢাকা সেনানিবাসের মধ্যে বর্তমানে হাজী মহসীন এবং মোনায়েম খানের বাড়িটি নৌবাহিনীর ব্যবহারের জন্য সরকারের নিকট থেকে নেন যা এখনও আছে। ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে তিনি মাত্র ২১ জন সদস্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অফ অনার জানান।

১৯৭২ সালে সকল সেক্টর কমাণ্ডারবৃন্দ এক সাথে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যান। এ সময় তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু স্পষ্টত জানান পাকিস্তান থেকে নৌবাহিনীর যে সব অফিসার ফেরত আসবেন তাদের মাঝে সিনিয়র ব্যক্তি নৌ প্রধান হবেন। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে ক্যাপ্টেন নুরুল হক নৌপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ তাঁর অধীনে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু এম এইচ খানকে নৌ প্রধান বানানোর জন্য বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্তকে তাঁর নিজের জন্য একই সাথে দেশের জন্য ক্ষতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

১৯৭১ সালে ফ্রান্সে একসাথে প্রশিক্ষণরত এম ইসলাম এবং এম মোস্তফাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আহবান জানান কিন্তু তাঁরা তাঁদের আহবানে সাড়া না দিয়ে পাকিস্তান ফিরে যান। সেখান থেকে যুদ্ধবন্দী হয়ে দেশে ফিরে আসার পর তারাই নৌ প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। এ সব সিদ্ধান্ত দেশের প্রগতির অন্তরায় ছিল।

নৌকমাণ্ডো যাঁরা একবার যুদ্ধে অংশ নিবেন তাকে সর্বোচ্চ (জীবিত) খেতাব প্রদানের অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করেন যে, ''নৌ যোদ্ধাদের সাইটেশন নির্ধারিত করেছেন ভারতীয় নৌ বাহিনীর একজন কমাণ্ডার। তিনি যাচাই না করে তার পাশে যারা ঘুর ঘুর করেছে তাকেই বীরত্ব সূচক খেতাব প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। যে জন্য অনেক প্রখ্যাত যোদ্ধাও এই খেতাব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।'' উক্ত ভারতীয় কমান্ডার কোন ব্যক্তিকে দু'টি খেতাব প্রদানের সুপারিশ করেছেন কিন্তু দু'টি খেতাব প্রাপ্ত উক্ত সাবমেরীনার এর ভূমিকা বিতর্কিত হওয়ার কারণে ভারতীয় সমরবিদগণ দ্বিতীয় দফায় তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখেন। তাই মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব খেতাব বন্টন নিরপক্ষে এবং সঠিক হয়েছে বলে মনে করেন না।

তিনি স্বাধীনতা উত্তর ষ্টাফ অফিসার হিসেবে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী পুণঃগঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯৭২ সালে কমিশন প্রাপ্ত হন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তাঁকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়।

১৯৭৬ সালে নৌবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নতুন প্রতিষ্ঠিত বরিশাল টেক্সটাইল মিলস লিঃ, রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস লিঃ এবং সাতক্ষীরা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করেন। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে তিনি চাকরি থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। অতঃপর নিজ এলাকায় রপ্তানীযোগ্য চিংড়ি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরনের ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা এবং চিংড়ি মাছের নার্সারী প্রতিষ্ঠা করেন।

আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধা এবং দক্ষ প্রশাসক গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ বর্তমানে খুলনা শহরে নিজ বাস ভবনে অবসর জীবন যাপন করছেন। মুক্তিযুদ্ধের সকল অনুষ্ঠানে যোগদান সহ স্বাধীনতা বিরোধীদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর চেহারায় এই মানুষটি সকল মহলে দাদু হিসেবে পরিচিত।

(সূত্র ভোরের কাগজ এবং প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে)



মীর মোশতাক আহমেদ রবি, পিতা-মীর এশরাক আলী, (ইসু মিয়া) গ্রাম-সুলতানপুর, সাতক্ষীরা সদর, জেলা- সাতক্ষীরা। বর্তমান ৪ সার্কিট হাউজ রোড, ইষ্টার্ণ হাউজিং এপার্টমেন্ট রমনা, ঢাকা। জন্ম তারিখ ২১-১-১৯৫৪ (স্কুল সার্টিফিকেট অনুযায়ী)।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ছাত্র আন্দোলনে সাতক্ষীরা জেলার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। এসময় ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করে পাকিস্তান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে ঐক্য গড়ে তোলেন। ১৯৭০ এর শেষভাগে ও '৭১ এর প্রথম ভাগে তৎকালীন মহকুমা সদর সাতক্ষীরাতে ব্যাপক পোষ্টারিং হয়। পোষ্টারের মূল ভাষ্য ছিল ''আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব''। প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এ পোষ্টার দেয়ালে লাগালে পুলিশ, ডিএসবি সহ গোয়েন্দা সংস্থাসমুহ অবাক হয়ে যায়। মোশতাক আহমেদ এই পোষ্টারিং করায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন বন্ধ ঘোষনা করলে ৩রা মার্চ সাতক্ষীরা কলেজ প্রাঙ্গন থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল জঙ্গী রূপ ধারন করে পাকা পুলের ব্রিজ পার হয়ে ''চাপড়া লজ'' এর নিকট পৌঁছালে উক্ত বাড়ি থেকে আতিয়ার, মতিয়ার ও লিয়াকত অকারণে গুলিবর্ষন করে। নিহত হন আব্দুর রাজ্জাক। আহত হয় খলিলুল্লাহ ঝড়ু, আলিউল্লাহ স্যারের পিতা, আব্দুল ওয়াহেদ মিয়া। মিছিলে ছাত্র বৃন্দের মধ্যে নেতৃত্ব দেন মোশতাক আহমেদ রবি।

২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। এদিন সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ পাকা পুলের মাথায় পাকিস্তান পতাকার স্থলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। ২৫ মার্চ, ঢাকায় গণহত্যার সংবাদ সাতক্ষীরায় পৌঁছলে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সাতক্ষীরা থানা সহ ট্রেজারীর সকল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছাত্র, যুবক ও জনগণের মাঝে বিতরণ করে। তাদেরকে সংগঠিত করে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়.। মীর মোশতাক আহমেদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি লগ্নে সাতক্ষীরা শহরের সকল সংগ্রামী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন।

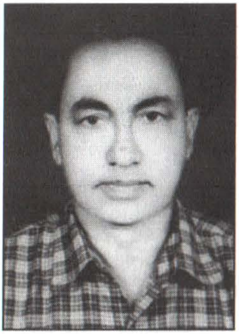
১৮ এপ্রিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাতক্ষীরা শহরের দখল গ্রহণ করে ভোমরা সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এদিন ভোমরা সীমান্তে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ইপিআর, পুলিশ ও ছাত্র- জনতা সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মীর মোশতাক আহমেদ এই যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি ৯নং সেক্টরের সেক্টর কমাণ্ডার মেজর জলিলসহ টাকিপুর ক্যাম্প গঠন করেন। তিনি সহকারী ক্যাম্প কমাণ্ডার হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১২ মে উচ্চতর নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তিনি মনোনীত হন। এদিন লাইনে দণ্ডায়মান

প্রায় ৪০০০ যুবকের মাঝে মাত্র ৮৫ জন যুবক এই কমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলে আসেন। অন্যান্য যুব শিবির থেকেও শতাধিক যুবককে একই দিন ক্যাম্পে সমবেত করা হয়। নানাবিধ বিবেচনা করে তাদের নাম তালিকাভূক্ত করা হয়। প্রথম মীর মোশতাক আহমেদ রবির নাম তালিকাভূক্ত করা হয়। প্রশিক্ষণকালীন ক্যাম্পের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ১২ জন কমাণ্ডোসহ সিলেট জেলার চা বাগান এলাকায় অপারেশনের জন্য প্রেরিত হন। অক্টোবর মাসে ধামাই চা বাগানে তিনি একটি সফল অভিযান পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন। অতঃপর তাঁর গ্রুপ সহ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বাধীনতা উত্তর পুণরায় ছাত্রজীবন সমাপ্ত করেন। তিনি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেও যোগদান করেন নাই।

কর্মজীবনে শুরুতে তিনি মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাষ্টের কর্মকর্তা ছিলেন। বিদেশে বেশ কিছুদিন থাকার পর বাংলাদেশের অন্যতম হোটেল, ''হোটেল সোনারগাঁও'' এর পরিচালক হিসেবে দীর্ঘ ৮ বৎসর কর্মরত থাকেন। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। পরবতীর্তে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রনালয়ের উপদেষ্ঠা কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে ৪ বৎসর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সভাপতি (ফুটবল) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে সাতক্ষীরা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ, এফ বি সি সি আই, ইত্যাদির সদস্য হিসেবে জড়িত আছেন। খুলনা বিভাগীয় সংস্কৃতি সংসদের সেক্রেটারী সহ বিভিন্ন ক্রীড়া, সামাজিক, সংস্কৃতি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমাণ্ডো এসোশিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দেশের অন্যতম ব্যবসায়ী হিসেবে ব্যাপক সমাদৃত। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর সহযোদ্ধা হিসেবে তার পূরণকৃত ফর্মে স্বাক্ষর দানকারী ৩ জনের মাঝে অন্যতম। তিনি একটি সংগঠন কর্তৃক স্বাধীনতা স্বর্ণ পদকও প্রাপ্ত।

বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা রওশন আরা বেগম তাঁর সহধর্মিনী। তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র দেশের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় ইষ্ট ওয়েষ্টে বিবিএ-তে এবং কনিষ্ঠ পুত্র সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

(সূত্রঃ পদত্ত বর্ননা। তারিখঃ ২০ আগস্ট ২০০০)



গাজী আব্দুস সালাম ভূঁইয়া, বীর প্রতীক, পিতা- শহীদ শাহনেওয়াজ ভুঁইয়া। গ্রাম- নান্দাইল, থানা- নান্দাইল, জেলা- ময়মনসিংহ। ১২ ডিসেম্বর ১৯৪২ নিজ বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৫৮ সালে নান্দাইল চণ্ডীপাশা হাই স্কুল থেকে মেট্রিক এবং ১৯৬১ সালে আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ থেকে আই.এস.সি পাশ করেন এবং চাকরিতে প্রবেশের পর ১৯৬৬ সালে বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি আওয়ামীলীগ নেতা ও থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

১৯৬২ সালে আনন্দ মোহন কলেজে বি.এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। নৌবাহিনীতে প্রবেশের অন্যতম কারণ হলো, ময়মনসিংহ টাউন হলে তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী ময়মনসিংহ পরিদর্শনে এলে আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্ররা কাল পতাকা দেখায় এবং দেয়ালে দেয়ালে সামরিক শাসন বিরোধী শ্লোগান লিখে রাখে। এর নেতৃত্বে ছিলেন জনাব আঃ সালাম ভুঁইয়া। ফলে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। ওই সময় পাকিস্তান নৌবাহিনীতে লোক নিয়োগ চলছিল। আঃ সালাম ভুঁইয়া ১৯৬২ সালের ৩ অক্টোবর আনন্দমোহন কলেজ মাঠে নৌবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ান। নিয়োগ কর্মকর্তা ছিলেন পাবনা জেলার নৌবাহিনীর লেঃ কমাণ্ডার জনাব ইসলাম। আঃ সালাম জনাব ইসলামকে কোনকিছু গোপন না করে ঘটনা খুলে বলেন। তার নামে ওয়ারেন্ট আছে তাও গোপন করেননি। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জনাব ইসলাম, আঃ সালাম ভুঁইয়াকে নৌবাহিনীতে ভর্তি করে নেন এবং প্রশিক্ষণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান।

প্রথম ৬ মাস পি.এন.এস. বাহাদুর, এরপর ৬ মাস পি.এন.এস. হিমালয়াতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ৬৩ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানের বৃহত্তম রণতরী ''পি.এন.এস. বাবর'' এ যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে আঃ সালাম ভুঁইয়া ''বাবর'' জাহাজের একজন নাবিক হিসেবে ভারতের ''দ্বারকা'' আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ৬৬ সালে পি.এন.এস. দিলওয়ারে বদলি হন। ১৯৬৭ সালে নেভীর হাসপাতাল শিফাতে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে ফ্রিগেট ''টিপু সুলতানে'' বদলি করা হয়। ১৯৭০ সালে ন্যাভাল শীপ মুনসিফে যোগদান করেন।

''বাবর'' ও ''টিপু সুলতানে'' চাকরিকালীন সময়ে তিনি শুভেচ্ছা সফরে পৃথিবীর ১১টি দেশ ভ্রমন করেন। পূর্ব-আফ্রিকানদের স্বাধীকারের উজ্জীবিত চেতনা দেখে আঃ সালামের মাঝে নিজের দেশের স্বাধীনতার ভাবনা উদ্রেক

হয়। যে কারণে পূর্ব বাংলার স্বাধীকার আন্দোলনের জন্য লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (শহীদ) এর নেতৃত্বে বিপ্লবী গোপন সংগঠনের সাথে জড়িত হন। এই গোপন সংগঠনের একটি শাখার দায়িত্ব দেয়া হয় আঃ সালাম ভুঁইয়ার উপর। যার শেষ পরিণতি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান যুদ্ধ জাহাজ মুনসীফ হতে বিশেষ বিবেচনায় ছুটি নিয়ে ঐ দিন বিকেল ৩টায় ঢাকায় পৌছেন এবং ২৫ মার্চ রাতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টাদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আত্মীয় অধ্যাপক এর বাসভবনে রাত্রি যাপন করেন। এসময় তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেন। পরদিন কারফিউ শিথিল করলে তিনি ঢাকা ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে ৩ দিন পর নিজ গ্রামের বাড়িতে পৌছেন। এরপর তিনি নান্দাইলের ছাত্র যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সংগঠিত করেন।

১৫ মে, কিশোরগঞ্জ থেকে এক কোম্পানি পাকিস্তানী সৈন্য নান্দাইল পৌছে শান্তি কমিটির সদস্য এবং থানার ও.সি. আঃ আউয়ালকে নান্দাইলের ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠককে গ্রেফতার করার নির্দেশ প্রদান করে। ৭ জনের মাঝে আব্দুস সালাম ও তার পিতা শহীদ শাহনেওয়াজ ভুঁইয়ার নাম অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাঁরা এই সংবাদ জানতে পেরে আত্মগোপন করেন।

১৮ মে, আঃ সালাম এলাকার কিছু সংখ্যক ছাত্র-যুবককে সাথে নিয়ে তাড়াইল, কেন্দুয়া, মদন, মোহনগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, তাহেরপুর, মধ্যনগর হয়ে ১ জুন ভারতের মহেষখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌছেন। এরপর কিছুদিন রংড়া ও বাঘমারা ক্যাম্পে অবস্থান করার সময় ভারতীয় বি.এস.এফ ক্যাপ্টেন জানতে পারেন যে, আঃ সালাম পাকিস্তান নৌবাহিনীর একজন নাবিক। তখন ক্যাপ্টেন মুরারী তাঁকে তোরা বি.এস.এফ. ক্যাম্পে নিয়ে যান। তিনি আঃ সালামকে কল্যানীতে অবস্থানরত নৌবাহিনীর সদস্যদের সাথে অবস্থানের জন্য সিদ্ধান্ত নেন। এরপর 'পলাশী' নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ক্যাপ্টেন মুরারীকে অনুরোধ জানান যে, তিনি জীবনের ঝুকি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শেষ মুহূর্তে আসতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লড়তে চান। হয় পাকবাহিনীকে মারব না হয় মরব। এই কথা উর্দুতে বললে ক্যাপ্টেন মুরারী সন্তুষ্ট হয়ে আঃ সালামকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এজন্য আমার নিকট কি সহযোগিতা চাও? তিনি মর্টার সহ বিভিন্ন আর্মস ও এ্যামুনেশনের জন্য বলেন। কিন্তু এগুলোর ব্যবহার আঃ সালাম জানতেন না বিধায় ক্যাপ্টেন মুরারী জেসিও র‍্যাংকের একজন পাঞ্জাবী ইনস্ট্রাকটরকে এককভাবে অবসর সময়ে তাকে শিখিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। সফল ভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ২৬ জুন আব্দুস সালামকে তোরা মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পের ইনস্ট্রাকটর হিসেবে দায়িত্ব দেন।

বাংলাদেশ সরকারের সেনাবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড গঠন করার জন্য ২০ জুলাই ক্যাপ্টেন অলি আহমদ তোরা যান এবং সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যসহ আঃ সালাম ভুইয়াকে তেলঢালা নিয়ে আসেন। এখানে তার ভাল না লাগায় আগষ্ট মাসে মেজর তাহের ১১নং সেক্টর গঠন করেছেন জানতে পেরে তিনি মহেন্দ্রগঞ্জ চলে আসেন। মেজর তাহের কালাইপাড়াতে মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করে ৫ জন প্রশিক্ষক নিয়োগ করেন। আঃ সালাম ভুইয়া তাঁদের একজন।

কামালপুর যুদ্ধে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ শহীদ হলে মেজর তাহের আঃ সালামকে কামালপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদানের নির্দেশ দেন। তখন এই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন লেঃ মাহফুজ। তাঁর টু আই সি হিসেবে আঃ সালাম দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিছুদিনের মাঝে লেঃ মাহফুজ ঢালুতে এক যুদ্ধে শহীদ হলে ১১নং সেক্টর হেড কোয়ার্টার ডিভিশনে শহীদ লেঃ মাহফুজ এর নামে ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিকদের নিয়ে মেজর আবু তাহের একটি কোম্পানী গঠন করেন। এই কোম্পানীর নাম করন করা হয় মাহফুজ কোম্পানী। মাহফুজ কোম্পানীর কমাণ্ডার হিসেবে আঃ সালাম ভুইয়াকে দায়িত্ব দেয়া হয়। একই সাথে তিনি ধানুয়া কামালপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করেন।

১০ সেপ্টেম্বর, পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেওয়ানগঞ্জের দক্ষিণে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন পাটওয়ারীর মুক্তিযোদ্ধা ঘাটি আক্রমন করে। আঃ সালাম সাথে সাথে তার কোম্পানী নিয়ে ক্যাপ্টেন পাটওয়ারীর পাশে এসে যুদ্ধে অংশ নেন। ৭ ঘন্টা ব্যাপী যুদ্ধে পাকবাহিনী পরাজিত হয়।

১৪ নভেম্বর, মেজর আবু তাহের ঢাকার প্রবেশ দ্বার কামালপুরে ত্রিমুখী আক্রমন পরিচালনা করেন। পশ্চিম দিকে ছিলেন ক্যাপ্টেন আজিজ ও তাঁর বাহিনী পূর্বদিকে টেংরামারীতে আঃ সালামের অধীনস্থ মাহফুজ কোম্পানী। উত্তর দিকে মিত্রবাহিনীর শিখ ও মারাঠা রেজিমেন্টের দু'টি কোম্পানী রাত ১২টা থেকে মিত্রবাহিনী কামালপুর পাকবাহিনীর ঘাঁটির উপর শেলিং শুরু করে। ভোর ৪টা থেকে অগ্রবর্তী বাহিনী কামালপুর ঘাঁটির সন্নিকটে পৌছে। বিভিন্ন কৌশলে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে কামালপুর ঘাঁটিতে প্রবেশ করবে। আঃ সালাম ভুইয়া, নজরুল এবং মজিদ ভোর ৫-৩০ মিঃ কামালপুরের সন্নিকটে দেওয়ানগঞ্জ রাস্তায় অবস্থান নেন।

১১নং সেক্টর কমাণ্ডার মেজর আবু তাহের কামাল পুরের উত্তরে বর্ডার লাইনে তেঁতুল গাছের নিকটে দাড়িয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। ওয়াকি টকিতে আঃ সালাম মেজর তাহেরের সাথে কথা বলেন। আব্দুস সালাম কামালপুর শত্রু দূর্গের সন্নিকটে জেনে তিনি তাড়াতাড়ি চলে আসেন। বিজয় যখন সন্নিকটে তখন শত্রু বাহিনীর পাতা বুবি ট্রাফে মেজর

আবু তাহেরের একটি পা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পা বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন। এদিন কামালপুর বিজয় তার স্বপ্ন ছিল। ১৪ নভেম্বর ছিল মেজর আবু তাহেরের বিবাহ বার্ষিকী।

যুদ্ধে সেক্টর কমাণ্ডার আহত এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেংগে যায়। সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। এর পর পরই মুক্তিবাহিনী কামালপুর ঘাটিটিকে চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ করে রাখে। ১৫/২০ দিন অবরুদ্ধ থাকায় পাকিস্তানী সৈন্যদের খাদ্য শেষ হয়ে যায়। তারা উড়ন্ত পাখি গুলি করে মেরে তার মাংস খেয়েও বাঁচতে চেষ্টা করে। অবশেষে ৪ ডিসেম্বর তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

৫ ডিসেম্বর, আঃ সালাম শ্রীবর্দী থানা ও কুরুয়া পাকবাহিনীর ঘাঁটি দখল করেন। ৬ ডিসেম্বর বকশীগঞ্জ এবং একইদিন রাতে শেরপুর শহর অবরোধ করেন। ৭ ডিসেম্বর শেরপুর শত্রুমুক্ত হয়।

৮ ডিসেম্বর, ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার শেরপুর পৌছে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন কোম্পানী পরিদর্শন করেন। তিনি ক্যাপ্টেন আঃ আজিজ ও আঃ সালাম কে জামালপুর মুক্ত করার পর টাঙ্গাইল মুক্ত করার নির্দেশ দেন।

৯ ডিসেম্বর, থেকে ক্যাপ্টেন আজিজ ও মাহফুজ কোম্পানী এবং আরও কয়েকটি কোম্পানী সমন্বয়ে জামালপুর ২ দিন যাবত অবরোধ করে রাখেন। এরপর পাকবাহিনী ভোররাতে চাঁদর মুড়ি দিয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে যেয়ে জনতা ও মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রাণ হারায়। ১১ ডিসেম্বর জামালপুর মুক্ত হয়।

জামালপুর মুক্ত হওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার- ক্যাপ্টেন আজিজ ও আঃ সালামকে জামালপুর হতে ময়মনসিংহ হয়ে কালিহাতী, টাঙ্গাইল, কালিয়াকৈর, টংগী এবং ঢাকা প্রবেশের নির্দেশ দেন।

১২ ডিসেম্বর, ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার ক্যাপ্টেন আজিজ ও আঃ সালামকে ময়মনসিংহে যেতে নির্দেশ দেন। এবং তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, নিয়াজী ৩ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে তাদেরকে ময়মনসিংহ থেকে কালিয়াকৈর ফিরে যেতে হবে।

১৪ ডিসেম্বর তিনি যখন কালিয়াকৈর উদ্দেশ্যে কোম্পানী সহ রওনা দিবেন পূর্ব মুহুর্তে জানতে পারেন যে, ১৭ নভেম্বর শত্রুবাহিনী তাঁর পিতাকে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে গুলি করে হত্যা করেছে এবং সম্পূর্ণ বাড়ি পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুত্রের মৃত্যু সংবাদে তার পিতামহ মোঃ ছাবিদ আলি ভুইয়া ও হাটফেল করে মৃত্যুবরন করেছেন। আঃ সালাম ভুইয়ার পক্ষে ঢাকা অভিযানে যাওয়া সম্ভব হলোনা। তিনি ক্যাপ্টেন আজিজের উপর

তার কোম্পানীর ভার দিয়ে ১৪ ডিসেম্বর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য আঃ সালাম ভুঁইয়াকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। পিতা এবং পিতামহকে হারানোর ফলে স্বাধীনতা উত্তর নৌবাহিনীতে যোগদান করতে পারেননি।

গাজী মোঃ আঃ সালাম এর এলাকায় থানা শান্তি কমিটি এবং রাজাকারদের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ

নাম	পদ	ইউনিয়ন
কাজী তসাদ্দক আলী	সভাপতি	নান্দাইল
এ.এফ.এম. ইসহাক	সহ-সভাপতি	নান্দাইল
আব্দুল গণি ভুঁইয়া	সাধারণ সম্পাদক	নান্দাইল
ডাঃ আব্দুল খালেক	সদস্য	নান্দাইল
আরিফ উদ্দিন আকন্দ	সদস্য	বেতাগইর
ইব্রাহীম মাষ্টার (ভাটী সাভার)	সদস্য	নান্দাইল
মোবারক আলী	সদস্য	শেরপুর
মোয়াজ্জেম হোসেন	সদস্য	নান্দাইল
ইয়াজদর সরকার	সদস্য	খারুয়া
আলী আকবর ভুঁইয়া ঝালুয়া)	সদস্য	নান্দাইল
মোমতাজ উদ্দিন ভুঁইয়া	সদস্য	রাজগাতী
লিলুর বাপ	সদস্য	নান্দাইল
আব্দুল্লাহ খান	সদস্য	আচারগাঁও
হাসান আলী ফকির	সদসা	মুশুণ্ডী
মোসলেম উদ্দিন	সদস্য	চণ্ডীপাশা
আব্দুল হামিদ (বালিয়াপাড়া)	সদস্য	নান্দাইল
কুতুব উদ্দিন খান	সদস্য	নান্দাইল
মহব্বত আলী ভুঁইয়া ঝালুয়া	সদস্য	নান্দাইল

রাজাকারদের নাম ঃ

নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
আব্দুল গফুর	ভাটিসাভার, পাঁচালী	নান্দাইল
আঃ মতিন ভুঁইয়া	কাকচর	নান্দাইল
জসিম উদ্দিন ভুঁইয়া	কাকচর	নান্দাইল
শাহেদ আলী	কাকচর	নান্দাইল
আব্দুল কুদ্দুছ	কাকচর	নান্দাইল
আব্দুল মন্নান	কাকচর	নান্দাইল
খোরশেদ খান	চণ্ডীপাশা	চণ্ডীপাশা
ইসমাইল হোসেন	ভুঁইয়াপাড়া	নান্দাইল
সিদ্দিক	নান্দাইল রোড	নান্দাইল
হাফিজ উদ্দিন	মেরাকোনা	শেরপুর
খলিলুর রহমান	দশবলিয়া	চণ্ডীপাশা
নূরুল ইসলাম (আলবদর প্রধান)	বারুইগ্রাম	চণ্ডীপাশা

এলাকায় আরও অনেক রাজাকার ছিল। উল্লেখযোগ্য কুখ্যাত কয়েকজনের নাম এখানে দেয়া হলো।

(তথ্য ঃ প্রদত্ত বর্ণনা তারিখ ঃ ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯)



শহীদ আফতাব উদ্দিন, পিতা-মৃত মোঃ নূরউদ্দিন আহমেদ, গ্রাম-কাশিয়াডাঙ্গা, থানা-শার্শা, জেলা-যশোর। জন্ম- ১৯৫০ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা-এইচ.এস.সি পাশ। ১৯৭১ সালে যশোর এম.এম. কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে `৬৯ এর ছাত্র ও গণআন্দোলনে যশোর শহরে ছাত্র জনতাকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

২৫ মার্চ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যশোর সেনানিবাস থেকে সাজোয়া গাড়ী সাজিয়ে শহরে টহল শুরু করে। এদিন রাতে যশোর পুলিশ লাইন সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তারা নগ্ন হামলা চালায়। ২৬ মার্চ যশোর শহরে সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকে। এরমাঝে ছাত্র নেতৃবৃন্দ পুলিশ লাইন এবং ইপিআর ক্যাম্পে অবস্থানরত সৈনিকদের প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করতে থাকেন।

এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অগ্রাভিযান শুরু করলে তিনি সীমান্ত পার হয়ে ভারতের বনগাঁ ৫নং টালিখোলা ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখানে একমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং একই সাথে ইপিআর এবং সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর পরিচালিত অপারেশনে সহযোগী হিসেবে কাজ করতে থাকেন।

১২ মে, নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য পলাশী চলে যান। দীর্ঘাঙ্গী এবং সুস্বাস্থের অধিকারী আফতাবউদ্দিন একজন প্রথম কাতারের নৌকমাণ্ডো ছিলেন। ১৫ই আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযান শেষে ভারতে ফিরে যাওয়ার পথে ৭ জন কমাণ্ডো দল সাতক্ষীরা জেলার বুধহাটাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এ্যাম্বুশে ঢুকে পড়েন। তাঁদের সাথে ছিল ক্ষুদ্র ষ্টেনগান এবং গুলিভর্তি মাত্র দুটি করে ম্যাগজিন। শত্রুর দ্বারা ঘেরাও বুঝতে পেরে তাঁরা প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যান। যুদ্ধে আফতাবউদ্দিন এবং সিরাজুল ইসলাম শহীদ হন। মুজিবুর, ইমাম বারী, ইমাদুল হক এবং খলিলুর রহমান শত্রুর হাতে বন্দি হন। শেখ মহসীন আলী পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। শহীদ আফতাবউদ্দিনের নামে নাভারনে একটি সড়কের নামকরন করা হয়েছে।

(সূত্র ঃ শহীদের অনুজ কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর, ৯৯)

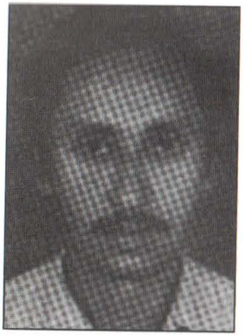


কমডোর মোঃ গুলজার হোসেন (অব:) এমএসসি, পিএসসি, বিএন পিতা-আলহাজ্ব মোঃ সমছউদ্দিন চৌধুরী। গ্রাম- তিলকপাড়া, ডাক-সুকুরের হাট, থানা-মিঠাপুকুর, রংপুর। বর্তমান-বাসা নং ৪৫১, সড়ক নং ৩১, নিউ ডিওএইচএস মহাখালী, ঢাকা-১২০৬। জন্ম- ১০ এপ্রিল ১৯৪৩ সাল। নিজ গ্রামের তিলকপাড়া ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর স্থানীয় হাই স্কুল থেকে মেট্রিক এবং ১৯৬৭ সালে কুড়িগ্রাম কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। কারমাইকেল কলেজ হতে বিএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬৫ সালে ফলিত গনিত শাস্ত্রে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন ও ১৯৭০ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করে ২৫-১-৭১ সালে সরাসরি কমিশন লাভ করেন। অতঃপর পিএনএস হিমালয়, পিএনএস কারসাজ ও যুদ্ধ জাহাজ পিএনএস বদর-এ ট্রেনিং গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে করাচী হতে ঢাকা চলে আসেন এবং একটিং সাব লেঃ হিসেবে '৭১-র ২৫ মার্চ ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে কর্মরত ছিলেন। এদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি সৈনিক এবং নিরস্ত্র জনগনকে হত্যা শুরু করলে তিনি সপক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। চট্টগ্রামের কুমিরা এলাকায় প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুক্তিবাহিনী পিছু হটে গেলে তিনিও সহযোদ্ধাসহ পিছুহটে ফেনী চলে আসেন।

এরপর মুক্তিযোদ্ধারা অনিবার্য কারণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তিনি পালিয়ে নিজ এলাকা রংপুর চলে যান। এখানে মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগদান করে নেতৃত্ব প্রদানসহ প্রতিরোধ গড়েন এবং ফুলবাড়ী, দিনাজপুর ও হিলী এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর পুণরায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল কমডোর হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি নৌ সদরে সহকারী নৌ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এবং নৌবাহিনী গড়ার কাজে বিশেষ অবদান রাখেন এবং নৌস্থাপনা ও জাহাজে কৃতিত্বের সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, আমেরিকা ও চীন সফর করেন। ২০০০ সালে পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। বর্তমানে নিজ বাড়িতে অবসর জীবন যাপনের পাশাপাশি নানা সামাজিক কাজে লিপ্ত আছেন

(তথ্যঃ কমোডোর অব: গুলজার হোসেন, তারিখ- ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০০)



শহীদ মোহাম্মদ হোসেন ফরিদ, বীর প্রতীক, পিতা- আহমদ মিয়া। গ্রাম- কাটির হাট, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পূর্বে চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে চেইনম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৫ মার্চ, পাকবাহিনী শহরে গনহত্যা শুরু করলে তিনি নিজ গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের হরিনা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদেন। ১৫ জুন, তিনি নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী উপস্থিত হন। ১৫ আগষ্ট, চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

১২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর বহি:নোঙর অভিযানে ব্যর্থ হয়ে তিনি সহ ৫জন নৌকমান্ডো পাকিস্তান বাহিনীর হাতে বন্দি হন। দল নেতার অদূরদর্শী এবং হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে এমন মর্মান্তিক ঘটনার অবতারনা হয় বলে অভিজ্ঞরা মনে করেন। মোহাম্মদ হোসেন ফরিদকে শত্রু সৈন্যরা নির্মমভাবে হত্যা করে। স্বাধীনতা উত্তর সরকার তাঁকে বীর প্রতীক খেতাব প্রদান করেন। তাঁর সাথে বন্দি হন এম এন মাওলা বীর প্রতীক, আমীর হোসেন বীর প্রতীক, নুরুল হক বীর প্রতীক, আবুল হাশেম। এই চারজনকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকে রাখে। স্বাধীনতার পর তাঁরা মুক্তি পান। এর মাঝে সরকার তিনজনকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন। কেবল আবুল হাশেমকে খেতাব দেয়া হয়নি। অথচ পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারে তিনি আজও বধির এবং ভারসাম্যহীন।

(তথ্য সূত্র প্রদত্ত বর্ণনা কমান্ডো মোঃ আমির হোসেন)



লে: কমাণ্ডার (অব:) জালালউদ্দিন বীরোত্তম, পিতা- মরহুম ইসমাইল মোল্যা। গ্রাম- পলাশবাড়ীয়া, ডাক- মণ্ডলগাতী, থানা- মহম্মদপুর, জেলা- মাগুরা। বর্তমান- মীরপাড়া মোড়, পোষ্ট+থানা+জেলা- মাগুরা। জন্ম- ২ অক্টোবর ১৯৪২।

নিজ গ্রাম পলাশবাড়িয়া ফ্রি প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে মাগুরা মাদ্রাসা থেকে মেট্রিক এবং পরে (HET) পাশ করেন। ১৯৫৬ সালে যশোর জেলা সদরে নাবিক হিসেবে নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। অতঃপর পিএনএস বাহাদুর করাচীতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর আড়াই বৎসর বিভিন্ন যুদ্ধ জাহাজে বেসিক ট্রেনিং গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ চাকরি জীবনে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করেন। ১৯৫৯ সালে প্রশিক্ষণের জন্য লণ্ডন চলে যান। ১৯৬৪ সালে পিএনএস বাবর জাহাজে বদলি হয়ে আফ্রিকা এবং এশিয়ার ৭টি দেশ ঘুরে বেড়ান। তিনি সিটো ও সেন্টো নৌ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে পিএনএস খাইবার নামক জাহাজে বদলি হয়ে ডোয়ারকা, সমরনাথ মন্দির আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে পিএনএস ঢাকা নামক তেলবাহী জাহাজ খরিদের জন্য আমেরিকা গমন করেন। ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে পিএনএস বখতিয়ার চট্টগ্রামে বদলি হন এবং এখানে নৌ কলোনীতে পরিবার পরিজন সহ অবস্থান করতে থাকেন।

১ মার্চ থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত অবস্থায় পাকিস্তানীদের বহু নির্মমতা প্রত্যক্ষ করে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ৭ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কর্তৃক এম.ভি. সোয়াত এবং এম.ভি. রুস্তম জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ খালাস করার প্রত্যক্ষদর্শী। এই সময় তিনি মেজর জিয়াউর রহমানকে অস্ত্র খালাস কাজে তত্ত্বাবধান করতে দেখেছেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তিনি গোপনে পাকিস্তানী জাহাজ ত্যাগ করেন এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত গমন করেন। ২৪ পরগনা জেলার অর্ন্তগত টাকী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অবস্থান কালে মে মাসে এম.এন. সামন্ত অপর ৯০ জন নৌকমাণ্ডোর সাথে তাকেও নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত করে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌ প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে প্রেরণ করেন। নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে আগষ্ট মাসে হিরন পয়েন্ট অভিযানে অংশ নেন। ১২ জন কমাণ্ডো দলের অধিনায়ক ছিলেন কমাণ্ডো হুমায়ুন কবীর।

তাঁদের নিরাপত্তা প্রদান এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে মেজর জিয়াউদ্দিন এবং আরও ১০/১২ জন স্থল বাহিনীর যোদ্ধাকে দেয়া হয়।

মেজর জিয়াউদ্দিন এই দলটিকে হিরন পয়েন্ট না নিয়ে বগিতে তার ক্যাম্পে একমাস আটকিয়ে রাখেন। এসময় জালালউদ্দিন বুঝতে পারেন মেজর জিয়া সম্মুখ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে চান। তিনি ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রের মজুত গড়তে থাকেন। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় নৌ কমাণ্ডোদল মেজর জিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ক্যাম্প ত্যাগ করে ভারতে ফিরে যায়।

অক্টোবর মাসে তিনি হাসনাবাদে সমবেত বাঙালি নাবিকদের সাথে একত্রিত হয়ে গার্ডেন রীচ ডক ইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ ''পদ্মা'' এবং ''পলাশ'' তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। নভেম্বর মাসে এ দুটি যুদ্ধ জাহাজ মংলা বন্দরের প্রবেশ মুখে ৮টি গ্রাউণ্ড মাইন স্থাপন করে। যার আওতায় ৩টি বানিজ্য জাহাজ ও ১টি পাকিস্তানী গানবোট বিধ্বস্ত হয়।

১০ ডিসেম্বর ''পদ্মা'' ও ''পলাশ'' গানবোট ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজের সাথে দু:সাহসিকভাবে খুলনা অভিযান কালে বিমান হামলায় বিধ্বস্ত হয়। জালালউদ্দিন এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং জাহাজ বিমান দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি সাঁতরিয়ে আত্মরক্ষায় সমর্থ হন। ভারতীয় নৌবাহিনীর কমাণ্ডার এম.এন. সামন্ত তাঁকে বীরোত্তম খেতাব প্রদানের সুপারিশ করেন।

মোঃ জালালউদ্দিন স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৯০ সালের ২ অক্টোবর লেঃ কমাণ্ডার হিসেবে চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে নিজ বাড়িতে অবসর জীবন যাপন এবং সমাজ সেবায় নিয়োজিত আছেন।

(তথ্যঃ লেঃ কমাণ্ডার (অব:) জালাল উদ্দিন বি,ইউ, তারিখ- ২৮.৯.১৯৯৯)



মোঃ আব্দুল কাদের, ১৯৭১ সালে ৯ মাসের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং জাতির অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে জাতি জয়লাভ করে। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয় একটি নতুন দেশের নাম। আজ দীর্ঘ ৩০ বছর পরও সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা খুজে পাই অনেক ঘটনা এবং যুদ্ধ কালের গহবরে পরিচর্যার অভাবে হারিয়ে গেছে। তাই বর্তমান প্রজন্মের কাছে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ অসম্পূর্ণ এবং ঝাপসা একটি ছবি মাত্র।

সে সময় মুক্তিযুদ্ধে যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন কিংবা যারা স্বচক্ষে অবলোকন করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। যারাওবা বেঁচে আছেন তাঁদের কাছে এই মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতি বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট উদ্যোগ সময় মত নেয়া হয়নি বলেই ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিশেষ বিশেষ যুদ্ধগুলোর বর্ণনা এবং বিশেষ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা হয়তো লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু অসংখ্য সাধারন মুক্তিযোদ্ধার অংশগ্রহণে যে সব দুঃসাহসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার বর্ণনা কোথাও খুজে পাওয়া যায়না। এসব অসমসাহসী যোদ্ধাকেও কেউ জানেনা- চেনেনা। অথচ এসব আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধার সাহসী ভূমিকা, দেশপ্রেমের বর্ণনা জেনে আজকের প্রজন্মও দেশকে ভালবাসতে শিখত। অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে দেশ গড়ার কাজে অনুপ্রেরিত হতো।

১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এমনই এক দুঃসাহসী তরুণ, মোঃ আব্দুল কাদের। সেই সময়ে সাতক্ষীরা কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। পিতা- মোঃ আব্দুল মোতালেব। আঃ কাদের ১৯৫২ সালে সাতক্ষীরা জেলার দেবনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

ছাত্র জীবন থেকেই ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। '৬৯ সালের অভূতপূর্ব ছাত্র ও গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

২০ এপ্রিল পাকিস্তানী জান্তা যশোর সেনানিবাস থেকে সাজোয়া বহর নিয়ে সাতক্ষীরা প্রবেশ করার পূর্বেই আঃ কাদের বন্ধু বান্ধবসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। টাকী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প হতে ১৩ মে, উচ্চতর নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে উপস্থিত হন। তিন মাস প্রশিক্ষণ শেষে তিনি সাবমেরীনার আহসানউল্লার নেতৃত্বে মংলা বন্দর অপারেশনে অংশ নেন। বিশেষ দু'টি সাংকেতিক গানের মাধ্যমে ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের দু'টি

সমুদ্র বন্দর এবং দু'টি নদী বন্দরে একসাথে অভিযান পরিচালিত হয় এবং ২৬টি শত্রু জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এরপর অক্টোবর মাসে বাহাদুরাবাদ ঘাটে ফেরী ডোবানোর জন্য লেঃ দাস বাবুর সাথে তিনি কমাণ্ডো মফিজ উদ্দিন, শাহজাহান আলম এবং আঃ মালেক সহ ১৬ জন কমাণ্ডো শিলিগুড়ি পৌঁছেন। একইদিন দাসবাবু মটর দূর্ঘটনায় নিহত হন। অতঃপর আব্দুল কাদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করে ৪ জন কমাণ্ডোকে বাহাদুরাবাদ ফেরী ঘাট অপারেশনে পাঠানো হয়। তাঁরা এদিন একটি ফেরীযান মাইনের সাহায্যে ডুবিয়ে দিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে আসেন। ফেরী ডুবির ফলে উত্তরবঙ্গের সাথে পাকবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত ব্যাঘাত সাধিত হয়।

এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বিপরীত দিকে নৌকমাণ্ডোদের নির্লিপ্ততার কারণে অনেক সুযোগ সন্ধানী যোদ্ধা দাবীদার হীন এসব যুদ্ধ সমূহকে নিজের বলে উল্লেখ করে কৃতিত্ব কুড়িয়েছেন, খেতাব পেয়েছেন।

স্বাধীনতার পর আঃ কাদের ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। বর্তমানে তিনি সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানায় জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।



বদিউল আলম, বীরোত্তম, একাত্তরের ১৫ আগষ্ট। এই দিনে মধ্যরাতের পর তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নদী ও সমূদ্র বন্দর সমূহ প্রলঙ্করী মাইনের আঘাতে কেঁপে ওঠে। দখলদার বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসওএস বার্তা পাঠাতে থাকে সারা বিশ্বে। নৌকমাণ্ডো বাহিনীর মাইন হামলায় দখলদার বাহিনীর সাথে ভিন্ন দেশের পন্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ একের পর এক তলিয়ে যায় চট্টগ্রাম, মংলা, চাঁদপুর, নারায়নগঞ্জ বন্দরে গভীর পানির নীচে। নৌকমাণ্ডো বাহিনীর এই প্রথম অভিযানকে অপারেশন জ্যাকপট বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। জ্যাকপট পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন ফ্রান্স থেকে আগত ৪ জন সাবমেরীনার। ১৫ আগষ্ট সাবমেরিনার বদিউল আলম চাঁদপুর বন্দর অভিযানে দু:সাহসীকতার সাথে সফল নেতৃত্ব দিয়ে শত্রু বাহিনীর ৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন।

সাবমেরীনার মোঃ বদিউল আলম বীর উত্তম, পিতা মোজাম্মেল হক সরকার, মাতা রাবেয়া খাতুন। তিনি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার রামপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ ভাই ৫ বোনের মাঝে তিনি তৃতীয়। বর্তমান চীফ সিকিউরিটি অফিসার, জনতা ব্যাংক, হেড অফিস, ঢাকায় কর্মরত। ভরতখালী উচ্চ বিদ্যালয় হতে মেট্রিক পাশ করে রংপুর পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি হন। এই সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতঃপর তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালে সাবমেরীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ফ্রান্স গমন করেন।

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ, পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে; বদিউল আলম তখন ফ্রান্সের তুলন পোতাশ্রয়ে সাবমেরীনে প্রশিক্ষণরত। পাকিস্তান নৌবাহিনী কর্তৃক খরিদকৃত সাবমেরীন থেকে ৮ জন নাবিকের ভারতে আশ্রয় গ্রহণকালে তিনিও ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তায় ভারত চলে আসেন এবং নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ঘাঁটি স্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন এবং এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের একজন প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৫ আগষ্ট চাঁদপুর বন্দরে ২০ জন কমাণ্ডোর অভিযানকালে তিনি নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ অভিযানে উপদল নেতা ছিলেন সালাহ উদ্দিনন আহমেদ বীর উত্তম, মমিনউল্লা পাটোয়ারী বীর প্রতীক, আ: গফুর এবং আলী আশরাফ। এদিন চাঁদপুর নদীবন্দরে জাহাজ, বার্জ, পল্টুন, মিলে ৬টি টার্গেট ধ্বংস করে শত্রু সৈন্যের মূলে আঘাত হানতে সমর্থ হন। দলনেতা হলেও অভিযানে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসা লাভ করে। অতঃপর চাঁদপুর নদী বন্দরে সফল অভিযান শেষে তিনি পলাশী নৌ প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

অক্টোবর মাসে তিনি দ্বিতীয়বার দলনেতা মনোনীত হয়ে ৪০ জন নৌকমাণ্ডোসহ মংলা সমুদ্র বন্দর অভিযানে গমন করেন। এই সময় দলটির নিরাপত্তা প্রদানের জন্য স্থলবাহিনীর যোদ্ধা সামছুল আরেফিন সহ ৪০ জন স্থলবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাকে মংলা এলাকায় পাঠানো হয়। কয়েকদিনের ব্যবদানে সাবমেরীনার গাজী মোঃ রহমত উল্লাহ উপস্থিত হয়ে খুলনার দক্ষিণ অঞ্চলের সমগ্র মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এখানেও সফল দলনেতা হিসেবে দায়িত্বপালন বদিউল আলমকে প্রশংসার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়। অক্টোবর মাস থেকে নভেম্বর '৭১ পর্যন্ত মংলা ও চালনা বন্দরসহ খুলনার দক্ষিণাঞ্চল, দাকোপ, পাইকগাছা ও আশাশুনি থানার অধীন জলপথে অসংখ্য জাহাজ, বার্জ, গানবোট, লঞ্চ, টাগ, ধ্বংস করতে সমর্থ হন। তাঁর প্রতিটি অভিযান ছিল অতি দুঃসাহসিক এবং রোমাঞ্চকর। একই সাথে তিনি অত্র এলাকার রাজাকার ও শত্রু ঘাঁটি দখলে অংশগ্রহণ করেন।

দুইমাস একাধিক্রমে অনেকগুলি দুঃসাহসিক অভিযানের পর নভেম্বর মাসের শেষে ভারত প্রত্যাবর্তন করেন। একাধিক যুদ্ধে সুপরিকল্পিত ও দুঃসাহসিকতার সাথে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য তিনি বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হন।

স্বাধীনতা শেষে তিনি নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে নৌবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর জনতা ব্যাংকে নিরাপত্তা কর্মকর্তার চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি ৩ কন্যা এবং এক পুত্রের জনক।

(সূত্র ঃ প্রদত্ত বর্ণনা এবং বদিউল আলম সংবর্ধনা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত স্মরনিকা '৯৮)



মোঃ আব্দুর রহিম, স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রচণ্ড আঘাত আসে একাত্তরের ১৫ আগষ্ট। এদিন মধ্যরাতের পর বাংলাদেশের সকল সমুদ্র ও নদী বন্দর কেঁপে ওঠে দূর্ধর্ষ নৌকমান্ডোদের মাইনের আঘাতে। বাংলার দামাল যুবকরা দেশকে শত্রুমুক্ত করার কঠিন অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করার জন্য আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছাড়াই মাইন বুকে বেঁধে আত্মাহুতি দেবার জন্যে রাতের অন্ধকারে নেমে পড়েছিলেন বর্ষায় ফুঁসে ওঠা কর্ণফুলি, পদ্মা, পশুর, বুড়িগঙ্গার উত্তাল জলরাশির মাঝে। লক্ষ্য একটাই শত্রুর জাহাজে মাইন লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয়া। বর্ষায় বাংলার খরস্রোত নদীর ভয়ংকর রূপ, নদীর হাঙ্গর, শত্রুর কামানের গুলি, জাহাজের ডেপথচার্জ কোনো কিছুর ভয়ই এই দু:সাহসী বীরদের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে পারেনি। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসমসাহসী নৌকমান্ডোদেরই একজন মোঃ আব্দুর রহিম, পিতা-মরহুম আব্দুল কুদ্দুস, গ্রাম-নয়াগাঁও কামরাঙ্গীরচর, ডাক-আশ্রাফাবাদ, জেলা-ঢাকা ১৩১০। ১৯৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর নিজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবাববাগিচা প্রাথমিক বিদালয় থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে নতুন পল্টন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে এস.এস.সি এবং ১৯৭৪ সালে ঢাকা সিটি কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের মিছিল, বিরোধী দল মুসলিম লীগ ও এন.এস.এফ. এর গুন্ডা দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

১৯৭১ সালে যখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন দেশব্যাপী ছাত্র ও গণআন্দোলন শুরু হয়। এ সময় যুবক আঃ রহিম স্কুল ত্যাগ করে মিটিং ও মিছিলে যোগ দিতেন। মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে সকল স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন ঢাকা শহর ছাত্র জনতার পদভারে প্রকম্পিত হতে থাকে। তাঁর পিতা মরহুম আব্দুল কুদ্দুস স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। তিনিও সব সময় মিটিং মিছিলে অংশ নিতেন।

এরপর চলে আসে ২৫ মার্চের কাল রাত্রি। রাত্রি দ্বিপ্রহরে হঠাৎ ঢাকা শহর গুলি আর কামানের ভারী গোলায় কাঁপতে শুরু করে। আঃ রহিম এর গ্রাম থেকে ২ কিলোমিটার দূরেই পীলখানা ইপিআর সদর দপ্তর। পীলখানা ইপিআর ক্যাম্পে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে তারা বুঝতে পারেন যে, এখানে যুদ্ধ চলছে। এর মাঝে রাত্রির অন্ধকারে ২/১ জন ইপিআর আহত অবস্থায় কামরাঙ্গির চরে পৌঁছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আব্দুর রহিম এবং তাঁর বড় ভাই সহ স্থানীয় জনগণ তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। সারারাত

গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। ২/৪টি গুলি তাদের গ্রামে এসে পড়ে। ভোর না হতে দলে দলে আহত বাঙালি ইপিআর সদস্যে গ্রাম ভরে যায়। কামরাঙ্গির চর গড়ে উঠে আশ্রয় কেন্দ্রে। স্থানীয় জনগণ সামর্থ অনুযায়ী তাদের সেবা-শুশ্রুষা করতে থাকেন।

পাকিস্তানীদের এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ দেখে যুবক আব্দুর রহিম এর মাঝে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জেগে উঠে। তিনি একদিন বাড়ির কাউকে না জানিয়ে পিতার পকেট থেকে মাত্র ১৫০টি টাকা নিয়ে ভোর না হতে বাড়ি ত্যাগ করেন। তখন রাস্তাঘাট প্রায় অবরুদ্ধ। কখনও পায়ে হেঁটে কখনও যানবাহনে একসময় যশোর এসে পৌঁছেন। শহরে না ঢুকে গ্রামের মেঠোপথ ধরে সরণার্থীদের দলে মিশে বনগাঁ উপস্থিত হন। ১৭ এপ্রিল তিনি টালিখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। এখানে কয়েকদিন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১২ মে ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ দাস এবং সাবমেরীনার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন সহ একটি রিক্রুটিং টিম টালিখোলা ক্যাম্পে পৌঁছে সমবেত সকল যুবককে ফল-ইন করান। তখন ক্যাম্পে ৩০০০ এর উপর যুবক। এরমধ্য থেকে মাত্র ৪৫ জনকে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত করেন। আব্দুর রহিম মনোনীত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ১২ মে ১৯৭১ রাত ৮টায় মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। ১০ ঘন্টা সামরিক ট্রাকে একটানা যাত্রায় সকলে ক্লান্ত। এ দিন তকীপুর থেকেও শতাধিক যুবক পলাশী এসে হাজির হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী রাতের খাবার সরবরাহ করে। ১৩ মে, সকাল থেকে আঃ রহিম এর নতুন জীবনে প্রবেশ। ক্যাম্প স্থাপনের জন্য তাবু টানাতে হবে। কিন্তু চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ। সকলে গাইতী, কোদাল, দাঁ, কুড়াল চালিয়ে জংগল পরিষ্কার করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তাবু স্থাপন করেন। একদিনে একটি জঙ্গল সামরিক ঘাটির রূপ ধারন করে। পাশে ভাগিরথী নদী। ক্ষীন স্বচ্ছ স্রোত প্রবাহ হচ্ছে। ছোট ছোট মাছগুলিকে পানির নীচে সাঁতার কেটে ছুটে পালাতে দেখা যায়।

এখানেই তিনমাস কঠিন এবং বিপদজনক বিস্ফোরক এর প্রশিক্ষণ গ্রহণ একই সাথে পানির নীচ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে সাঁতার রপ্ত করতে হয়। আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ করে অপারেশনে পাঠানোর প্রস্তুতি চলে। আব্দুর রহিম ২০ জন কমাণ্ডো দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জ বন্দর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। সাবমেরীনার আব্দুর রহমান ছিলেন দলের পরিচালক। উপ পরিচালক ছিলেন আব্দুর রহিম ও আব্দুল মালেক। ৭ আগষ্ট, পলাশী ত্যাগ করে বিমানে তারা আগরতলা পৌঁছেন। সীমান্ত অতিক্রম করে নৌকায় কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন অচেনা পথ ধরে সোনারগাঁও থানায় জাঙ্গালিয়া গ্রামে এসে উঠেন। সেখানে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ভেবে বন্দর থানার আর এক বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আশ্রয় স্থলে থেকে

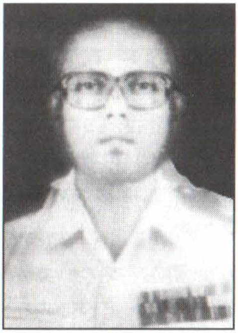
১৫ আগষ্ট অপারেশন জ্যাকপটে অংশগ্রহণ করেন। এই অপারেশনে জাহাজ ও বার্জ মিলে ৪ টি টার্গেট বিধ্বস্ত হয়।

অক্টোবর মাসে পুনরায় আবদুর রহমান এর নেতৃত্বে ২২ জন কমান্ডো নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অপারেশনের জন্য প্রেরিত হন। এই অপারেশনে কয়েকজন নতুন কমান্ডো ও দলভুক্ত হন। তাদের মাঝে, কাজী এমদাদ, হাবিবুল হক, জসিম উদ্দিন ছিলেন। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই দল অত্র এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।

আব্দুর রহিম এর অংশ গ্রহণকৃত অপারেশন হলো অক্টোবর মাসে বন্দর থানার সাইলোর সম্মুখে গম ভর্তি দু'টি বিদেশী জাহাজ ধ্বংস। এই অপারেশনের মাত্র একদিন পর কাঁচপুর ফেরী ডোবা। এই অপারেশনে অংশ নেন আঃ রহিম, আঃ মালেক ও জসিমউদ্দিন। তাঁর অংশগ্রহণকৃত শেষ অপারেশন ছিল মদনগঞ্জে একটি গানবোট ধ্বংস। তাঁর সাথে সহযোদ্ধা ছিলেন কাজী এমদাদুল হক, হাবিবুল হক খোকন। তিনি ৪টি দু:সাহসিক অভিযানে অংশগ্রহণ করলেও বীরত্বসূচক খেতাব থেকে বঞ্চিত হন।

স্বাধীনতার পর তিনি ছাত্র জীবনে ফিরে যান। ১৯৭৪ সালে সিভিল এভিয়েশনে চাকরি গ্রহণ করেন। শ্রমিক ইউনিয়ন করার জন্য ১৯৮৩ সালে সামরিক আইনের অধীনে তিনি চাকরিচ্যুত হন। আদালতের স্মরনাপন্ন হলে চাকরি ফিরে পান। কিন্তু তিনি আর চাকরিতে যোগদান করেননি। বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডো এসোসিয়েশন এর প্রচার সচিব এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যানে নিবেদিত। স্ত্রী হাসিনা আক্তার বিএ, বিএড, একজন শিক্ষিকা। দুই কন্যা রুবাইয়া রহিম প্রিয়াংকা ও রিজওয়ানা রহিম। কমান্ডো মোঃ আব্দুর রহিম সদা হাস্যোজ্বল একজন নিবেদিত মুক্তিযোদ্ধার প্রতীক।

(সূত্র ঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখ ঃ ৩০ অক্টোবর ৯৯)



মোঃ আফজাল হোসেন, বীর উত্তম, ইআরএ-২, পিতা-মৃত মোঃ জমির উদ্দিন। গ্রাম-ভাড়ারুল, পোষ্ট-ধীরাশ্রম, থানা-জয়দেবপুর, জেলা- গাজীপুর। বর্তমান ঠিকানা-নৌবাহিনী ভবন, শহীদ নিয়ামত সড়ক, পশ্চিম বিলাসপুর, ডাকঘর-গাজীপুর, জেলা-গাজীপুর-১৭০০।

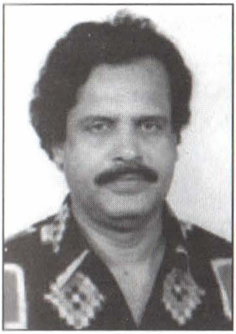
তিনি ১৯৪০ সালের ১ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে মেট্রিক পাশ করার পর ১৯৫৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগদান করার পর পিএনএস কারসাজ, ড্রিগ রোড করাচী-৮ এ তিন বৎসর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ১৯৬০-১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি নৌ যুদ্ধ জাহাজ পিএনএস বাবর, পিএনএস আলমগীর, পি এন টাগ রুস্তম ও নৌ ঘাঁটি হিমালয়াতে চাকরি করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তিনি ৬০ দিনের বাৎসরিক ছুটিতে নিজ গ্রামে ছিলেন। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আগরতলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখানে একমাস অবস্থান করার পর তাঁকে নৌবাহিনীতে যোগদানের জন্য কলকাতা পাঠানো হয়। অক্টোবর মাসে তিনি বাংলাদেশের যুদ্ধ জাহাজ ''বি এন এস পলাশ'' এ যোগদান করেন।

১০ ডিসেম্বর খুলনা অভিযান কালে ভূল বশতঃ ভারতীয় বোমারু বিমানের বোমা হামলায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। বোমার আঘাতে তাঁর একটি চক্ষু ছিটকে বের হয়ে যায় এবং ডান হাত মারাত্মকভাবে আহত হয়। খুলনার রূপসা নদীতে ভাসমান অবস্থায় ভারতীয় গানবোট কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে কলকাতায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনমাস চিকিৎসাধীন থাকার পর তাঁর ডান চক্ষুতে একটি পাথর বসিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু ডানহাত পঙ্গু থেকে যায়। হাসপাতাল থেকে রিলিজ হয়ে তিনি দেশে ফিরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকায় চাকরিতে যোগদান করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সরকার তাকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৯১ সালে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ কন্যা এবং এক পুত্র সন্তান রেখে যান।

(সূত্র: তথ্য ১৯৯৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর মরহুমের স্ত্রী মিসেস মরিয়ম আফজাল কর্তৃক প্রদত্ত)



অরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য, পিতা- মৃত সুধীর ভট্টাচার্য্য গ্রাম- পাড়ালা, ডাকঘর- খাটুয়াডাঙ্গা, থানা- মনিরামপুর, জেলা-যশোর। বর্তমান-১২৪ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জণ রোড (রেল রোড), যশোর শহর, যশোর। ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় গোপালপুর জুনিয়র হাই স্কুল (তৎকালীন) থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন, কেশবপুর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে এস এস সি, যশোর জিটি কলেজ থেকে এইচ এস সি, সরকারী মাইকেল মধুসুধন মহাবিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মান সহ স্নাতক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ (আপার) এবং এলএল.বি ডিগ্রী লাভ করেন। ৩১ আগস্ট '৭৯ তারিখে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদপ্রাপ্ত হয়ে যশোর জেলা বারে যোগদান এবং ২৬ মে ১৯৮২ সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগের জন্য সনদ প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত।

১৯৬৯-৭১ সালে দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্র থাকাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনে মিছিল-মিটিং সহ যশোর শহর, মনিরামপুর থানা সদরে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলেন। ৫ এপ্রিল ১৯৭১ নিজ এলাকা ত্যাগ করে ভারতের ৫নং টালিখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। ১১ মে ১৯৭১ কর্ণেল ওসমানী, তোফায়েল আহমেদ, মেহেরপুরের তৎকালীণ এসডিও তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর সিনিয়র অফিসার কমাণ্ডার সামন্ত প্রমুখ টালিখোলা কাম্পে আসেন এবং সুইসাইড স্কোয়ার্ড গঠনের জন্য ক্যাম্পে সমবেত প্রায় ৫০০ ছাত্র যুবকের মধ্য থেকে অরুণ ভট্টাচার্য্যসহ ২০ জনকে বাছাই করে ভারতীয় সামরিক যানে করে ১২ মে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী প্রান্তরে নিয়ে উপস্থিত হন।

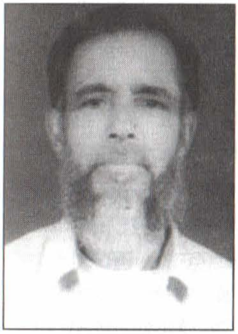
পলাশী প্রান্তরে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত নৌকমাণ্ডো হিসাবে কঠোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং বুকে মাইন বেঁধে জাহাজ সহ নদী বন্দরের নৌযান ধ্বংস করার জন্য অন্যান্য কমাণ্ডোর সাথে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে অপারেশনের জন্য তাঁকেসহ মোট ৬০ জনের চৌকস নৌকমাণ্ডোকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। কারণ অন্যান্য নদী বন্দরের তুলনায় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে অপারেশন করা ও জাহাজ ধ্বংস করা ছিল অধিক মাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ। ২ আগষ্ট ১৯৭১ পলাশী ক্যাম্প ত্যাগ করে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে রাত্রী যাপন এবং ৩ আগষ্ট দমদম বিমানবন্দর থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানে গৌহাটি হয়ে ঐ গ্রুপকে আগরতলায়

নিয়ে যায়। আগরতলা ডেলটা ক্যাম্পে রেখে ২ দিন যাবৎ রাস্তা ঘাটের ম্যাপ ও যাতায়াতের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং ৮ আগষ্ট দিনগত রাতে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে লিমপেট মাইন, গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ, ফিনসসহ অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এরপর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রু বেষ্টিত এলাকার মধ্য দিয়ে নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করে তাঁরা ১৪ আগস্ট কর্ণফুলী নদীর বিপরীত পাড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে পৌছেন। প্রথম অপারেশনের সার্বিক ব্যবস্থা করেছিলেন ১নং সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম।

১৫ আগষ্ট ১৯৭১ রাত ১টায় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে অপারেশনে অংশ নেন। ঐ অপারেশনে অন্তত: ১০টি জাহাজ, বার্জ গানবোর্ট, পলটুন ইত্যাদি পানিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয় এবং অনেকগুলি আংশিক ধ্বংস হয়। অত্যন্ত সফল অপারেশন শেষে অরুণসহ কিছু সংখ্যক কমাণ্ডো আগরতলা নৌ-ক্যাম্পে ফিরে যান। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে গোপালগঞ্জ এর গাজী আমিন এবং অরুণ ভট্টাচার্য্য দুটি গ্রুপের নেতৃত্ব নিয়ে চাঁদপুর আসেন এবং দক্ষিণবালিয়া গ্রামের শামছুর রহমানের বাড়িতে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে চাঁদপুর নৌবন্দরসহ পার্শ্ববর্তী নৌপথে বিভিন্ন অপারেশন করে শত্রু বাহিনীকে নৌপথে বিপর্যস্থ করে তোলেন। ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চাঁদপুর শহর দখল অভিযানে নৌকমাণ্ডো অরুণ বীরত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখেন। চাঁদপুর দখলের পর অরুণসহ নৌকমাণ্ডো বাহিনী নদী পথে ঢাকা মুখী অগ্রসর হন এবং নারায়নগঞ্জ শহরে প্রবেশ করে মেরীন একাডেমীতে ক্যাম্প স্থাপন করেন এবং ঢাকা মুখী সমস্ত নৌপথ নৌকমাণ্ডোরা দখল করে শত্রুবাহিনীর যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখলেও তাঁকে বীরত্বসূচক খেতাব দেয়া হয়নি।

১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের পর অরুণ ভট্টাচার্য্য পুণরায় ছাত্র জীবনে ফিরে আসেন। বর্তমানে ঢাকায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে আইন প্রাকটিসে নিয়োজিত। তার এক পুত্র অঞ্জন ও এক কন্যা জয়া। স্ত্রী রীতা ভট্টাচার্য্য।

(সূত্র ঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখ- ২৭ সেপ্টেম্বর ৯৯)



মোঃ সিরাজুল মাওলা, বীর উত্তম (পিও), পিতা-মরহুম ছিদ্দিকুর রহমান, গ্রাম-নাওপুরা হাজীবাড়ী, ডাক-খাজুরিয়া, থানা-কচুয়া, চাঁদপুর। বর্তমান- ডব্লিউ/এফ/৪ ফিরোজ শাহ কলোনী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। ১৯৪৩ সালের ১ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। মেট্রিক পাশ করার পর ১৯৬২ সালের ৮ মে ওডি/ইউটি হিসেবে ঢাকার আজিমপুরস্থ পলাশী ব্যারাকের রিক্রুটিং সেন্টারে তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। অতঃপর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তিনি করাচী চলে যান। ''পিএনএস বাহাদুর'' -এ তিন বৎসর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ১৯৬৫ সালে পিএনএস জাহাঙ্গীর এবং পিএনএস হিমালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি এক্সডিও খুলনা, পিএনএস রাজশাহী, পিএনএস ঢাকায় কর্মরত ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ তিনি কর্মস্থল চট্টগ্রামে অবস্থানরত পিএনএস কুমিল্লা থেকে মাত্র ৭ দিনের ছুটি নিয়ে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। ২৫ মার্চ গণহত্যার পর পুনরায় কর্মস্থলে না ফিরে নিজ এলাকায় তিনি প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হলে তিনি ২নং সেক্টরের অধীন মেজর খালেদ মোশাররফ এর নেতৃত্বে শালদা নদী, মন্দাভাগ, চৌদ্দগ্রাম, মুন্সীরহাট যুদ্ধে এমপিসিসি এবং ওপিএস হিসেবে ৮১ এম এম মর্টার প্লাটুনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

অত:পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১০ ডিসেম্বর খুলনা অভিযানকালে পলাশ গানবোটে ৪০/৬০ বাফার গানের গানার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। জাহাজের অধিনায়ক ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর বাঙালি অফিসার লেঃ রায় চৌধুরী। অভিযানকালে তিনি বোমারু বিমানের আঘাতে আহত হন এবং কলকাতার ব্যারাকপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে সুস্থ হয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। '৭১ সালের যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য সরকার তাঁকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৮০ সালের ৮ জুলাই পেটি অফিসার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

(তথ্যঃ এস মাওলা, বি ইউ, তারিখঃ ৩১-১-২০০০)



শহীদ সিরাজুল ইসলাম, আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে সম্মান ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় '৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ২৬ মার্চ হতে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাস সংঘটিত এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। এতে প্রায় ৩০ লাখ লোক শাহাদাৎ বরন করেন, শারিরীকভাবে অক্ষম এবং আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে অগনিত নিরীহ দেশবাসী। অনেক নারী বর্বর পাক হানাদার বাহিনীর লালসার শিকারে পরিণত হয়। এছাড়াও অনেক শিশু পিতা-মাতা হারিয়ে এতিম হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনসাধারনের ভিতর হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের জন্ম হয় এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাল্টা আক্রমনের মাধ্যমে। ৯ মাসের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রথমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। যা পরবর্তীর্তে সুপরিকল্পিত এবং নিয়মিত যুদ্ধের আকার নেয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষ এবং আধুনিক যুদ্ধ সম্ভারে সজ্জিত পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যক বাঙালি সৈনিক এবং ছাত্র-যুবকরা পেরে উঠছিল না। সেই সুযোগে পাকিস্তান বিশ্ব দরবারে প্রচার করছিল যে, দেশের পূর্বাংশে কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাষী কার্যকলাপ সৃষ্টির চেষ্টা চালালে তা কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে। সেখানে কোন মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছেনা।

পাকিস্তান তার এই মিথ্যা দাম্ভিকতার জবাব পায় ১৫ আগষ্ট মধ্যরাতের পর। দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ আত্মঘাতী নৌকমাণ্ডোরা একসাথে বাংলাদেশের ৪টি বন্দরে আক্রমণ চালিয়ে ২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। সমগ্র বিশ্ব অবাক বনে যায় বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য দেখে। বিদেশী খ্যাতনামা পত্রপত্রিকা এবং প্রচার মাধ্যমে ফলাও ভাবে প্রচারিত হয় বাংলাদেশের বন্দরে অসংখ্য জাহাজ ডুবির কথা। অত:পর পাকিস্তানী সামরিক শাসকের টনক নড়ে।

এই অসামান্য সাফল্য অর্জনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদেরই একজন শহীদ সিরাজুল ইসলাম। ১৯৫২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মফস্বল শহর সাতক্ষীরার কাটিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা- মোঃ আকতার আলি সরদার। সিরাজুল '৭১ সালে সাতক্ষীরা কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ১৮ এপ্রিল, পাকিস্তান হানাদার বাহিনী সাতক্ষীরা শহরে অগ্রাভিযান পরিচালনা করে। এর আগেই সিরাজুল বন্ধুবান্ধব, সহপাঠীসহ সন্নিকটে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯ এপ্রিল ভোমরা সীমান্তে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন এসপি মাহবুব এবং

ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন। যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনী চরম মার খেয়ে পিছু হটে সাতক্ষীরাতে ঘাঁটি তৈরি করে। এরপর চলে তাদের নির্মম অত্যাচার। সিরাজুল এর জবাব দিতে তখন ২৪ পরগণা জেলার অর্ন্তগত তকীপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ রত।

১২ মে ১৯৭১। তকীপুর ক্যাম্পে ভারতীয় নৌবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাসহ কর্ণেল ওসমানী, তোফায়েল আহমেদ এবং গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ আসেন নৌবাহিনীর সুসাইডাল স্কোয়াডে লোক ভর্তির জন্য। মনোনয়নকারী দল ৫০০০ যুবকের মধ্য থেকে ৮৫ জন যুবককে মনোনীত করেন। সুঠামদেহী সিরাজুল নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য অন্যান্য বন্ধুর থেকে বিদায় নিয়ে পলাশীর উদ্দেশ্যে চলে যান।

এরপর পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের পাশ্ববর্তী ভাগীরথী নদীতে একটানা তিনমাস কঠোর পরিশ্রম করে সাথীদের সাথে নিজেকে একজন চৌকস নৌ-যোদ্ধা হিসেবে প্রস্তুত করতে সক্ষম হন।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় ক্যাম্পে উপস্থিত ৩৫০ জন যুবকের মধ্য থেকে ১৬০ জন যুবককে বেছে নেয়া হয় অপারেশনের জন্য। সিরাজুল প্রথম অপারেশনে মনোনীত হয়ে ভয়াবহ মংলা সমুদ্র বন্দরে জাহাজ ডোবাতে যাত্রা করেন। সঙ্গী ৬০ জন সহযোদ্ধা। দলনেতা ছিলেন সাবমেরীনার আহসানউল্লা।

১৫ আগষ্ট সন্ধ্যার পর সুরখালী থেকে বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে বন্দরে পৌঁছতে ভোর হয়ে যায়। আর কয়েক মিনিট পরই পূব আকাশে সূর্য উদিত হবে। তবুও দলনেতা সাবমেরীনার আহসানউল্লাহর নির্দেশ অপারেশন করতে হবে। তড়িৎ গতিতে সকলে পায়ে ফিনস্ লাগিয়ে বুকে একটি শক্তিশালী মাইন নিয়ে উপ দল নেতার অধীনে সাঁতরিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে যান। তখন চারিদিকে ফর্সা। জাহাজের ডেকের নাবিকদের খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। এর মাঝে ৪৮ জন নৌকমাণ্ডো জাহাজে মাইন লাগিয়ে কচুরিপানার আড়াল করে নির্বিঘ্নে ফিরে আসেন। সফল অভিযানের মাধ্যমে সার্থক হয় পলাশীর শিক্ষা গ্রহণ। এদিন একমাত্র কমাণ্ডো মহেন্দ্র জাহাজীদের নজরে পড়ে তাদের উদ্ধারকারী জালের সাহায্যে জাহাজের উপর চলে যান। প্রত্যুৎপন্নমতি মহেন্দ্র ইতিমধ্যে পায়ের ফিনস্ খুলে ফেলে দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে সে সাঁতরিয়ে নদী পার হচ্ছিল বলে জাহাজের লোকদের জানায়। জাহাজের ক্রুরা তাকে চা পানে আপ্যায়ণ করে। আর সময় নেই। কয়েক মিনিট পরেই মাইনের বিস্ফোরন ঘটবে। সে তড়িঘড়ি চা শেষ করে তাদের দেয়া কাপড় জড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে যায়। আর পানির কমাণ্ডোরাও তখন ২ মাইল দূরে কিনারে উঠে উদ্ধারকারী নৌকায় চড়ে বসেন। খুশিতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। সফল হন দলনেতা সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ।

কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিপদ সবখানে পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে। '৭১ সালে সমগ্র বাংলাদেশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিনত ছিল। মংলা বন্দর থেকে ১০০ মাইল পথ শত্রুর মাঝখান দিয়ে আবার ভারত ফিরে যেতে হবে। পরিকল্পনা তাই। কিন্তু ফিরে যাওয়া নিয়ে স্থলবাহিনীর যোদ্ধা, যাঁরা নৌ কমাণ্ডোদের নিরাপত্তাার জন্য এসেছিলেন তাদের সাথে মত বিরোধ ঘটে। সে ঘটনা অনভিপ্রেত-ইতিহাসের উপাত্ত নয়।

যে কারণে সিরাজুল, আফতাব, মুজিবর সহ ৭ জন কমাণ্ডো পৃথকভাবে নৌকাযোগে ভারত ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাধসাধে আবহাওয়া। প্রচণ্ড ঝড়ে তাঁদের নৌকা নদী ভূল করে শত্রু ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সাতক্ষীরা জেলার অর্ন্তগত বুধহাটাতে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে কমাণ্ডো সিরাজুল এবং আফতাব উদ্দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। বন্দি হন মুজিবুর রহমান, ইমাম বারী, ইমদাদুল হক, খলিলুর রহমান। শেখ মহসীন আলী পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

গুলিবিদ্ধ সিরাজুল মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকেন। পিপাসায় কাতর। পানি চাইলে পাষণ্ড হায়েনাদের একজন উলঙ্গ হয়ে তার মুখে প্রশ্রাব করে দেয়। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সিরাজের নিথর দেহ। এ এক মহতি আত্মত্যাগ? অঙ্গীকার পূরণের দৃঢ়তা সিরাজ এবং আফতাবউদ্দিনকে মহিয়ান করেছে। তাঁদের রক্তে ভেজা মাটিতে আজ চারিদিকে সবুজের সমারোহ। অমৃতলোকে বসে তাঁরা হাসছে। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রাখে বন্ধুদের প্রতি। অকৃতজ্ঞ জাতির সাথে মিশে তাঁদের সহযোদ্ধারা স্বাধীনতার পর পাঁচটি বছর না যেতেই লুঙ্গি পাঞ্জাবী ছেড়ে সাফারী স্যুট ধরেছে। পাকিস্তানী ফেরত সামরিক কর্মকর্তাদের খুশি করতে কাবুলি পায়জামা পাঞ্জাবী পরে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায়রত। শহীদ সিরাজুল ইসলাম এবং আফতাবউদ্দিনকে সমাহিত করা হয়নি। শত্রুরা তাঁদের মরদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেয়। তাই এই আত্মত্যাগী বীরদের সমাধিস্থল কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

১৯৭১ সালের সেই ভয়ঙ্কর আগষ্ট। পাকিস্তান শত্রুবাহিনীর নাকের ডগায় এক একটি প্রচণ্ড শক্তিধর মাইনের বিস্ফোরন ঘটিয়ে একই দিনে পাকিস্তানী শাসক কূলের কয়েক হাজার মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি, যুদ্ধাস্ত্র এবং রসদ ধ্বংস করেছিলেন এদেশের তরুণ নৌকমাণ্ডোরা। ১৫ আগষ্ট, রাতে বাংলাদেশের দুটি সমুদ্র বন্দর এবং দুটি নদী বন্দরে ২৬টি জাহাজ ডুবি ঘটে।

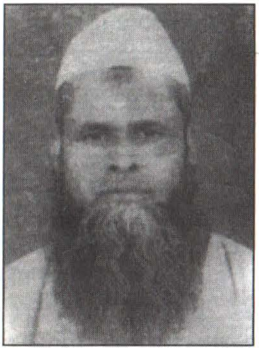
১৯৭১ সালে সিরাজুল কলেজ জীবন থেকেই ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ৬৯ সালের ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। '৭১ সালের ১ মার্চ থেকে সাতক্ষীরা শহর আন্দোলনকারী ছাত্র জনতার পদভারে প্রকম্পিত হতে থাকে। পাকিস্তানী প্রশাসনের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে রাতে বিভিন্ন

বিপ্লোবাত্মক পাকিস্তান বিরোধী পোষ্টারে শহর ছেয়ে যায়। শহীদ সিরাজুল ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে থেকে এমন অনেক কাজ করেছেন যা প্রশাসনের মূলে আঘাত হানতে সক্ষম হয়। ছোটবেলা থেকেই সিরাজুল ছিলেন স্বাধীন চেতা। অন্যায় সিদ্ধান্তকে কোনভাবেই মেনে নিতেন না।

১৮ এপ্রিল পাকবাহিনী সাতক্ষীরা শহরে প্রবেশ করলে তিনি গ্রাম্য পথ ধরে ভারতে চলে যান। যাওয়ার আগে সিরাজুল বলে যান, যাই যুদ্ধে, রক্ত দিয়ে আসি, নাহলে যে দেশটা স্বাধীন হবেনা। একজন অকুতোভয় নৌকমাণ্ডো হিসেবে তিনি ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ১৫ আগষ্ট, মংলা বন্দর অভিযান শেষে ভারতে ফিরে যাওয়ার পথে পাকিস্তান শত্রুবাহিনীর এ্যাম্বুশে পড়ে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন তিনি। যুদ্ধে যাওয়ার আগে যা বলেছিলেন সে কথা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছেন সিরাজুল। তাঁর রক্ত দিয়েই স্বাধীনতা আনতে হলো।

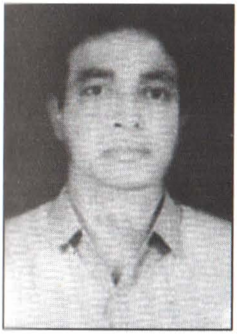
তার পরের চিত্র ভিন্ন। সকলের ন্যায় সিরাজের আত্মত্যাগও মলিন হতে চলেছে। রাজাকার শ্বাপদের থাবা বিস্তার শুরু করেছে। ১৯৭২ সালে শহীদ সিরাজুল এবং শহীদ আফতাব উদ্দিনকে হত্যার অপরাধে আশাশুনি থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি হত্যা মামলা করেন। এই হত্যার প্রত্যক্ষ-দর্শী হিসেবে স্বাক্ষ্য দেন মুজিবর রহমান, ইমামবারী, ইমদাদুল হক, খলিলুর রহমান। আদালতে প্রত্যেকেই আসামীদের চিহ্নিত করেন খুনী হিসেবে। তারপরও বিচারক আসামীদের মুক্তি দেন। সেই মামলায় আসামী পক্ষের কৌশলী ছিলেন বিচারপতি জনাব লতিফুর রহমান। কিন্তু আজও শহীদ সিরাজের মা ক্ষমা করেননি খুনীদের। তিনি এই হত্যার বিচার চান।

(সূত্র: শহীদের মাতার প্রদত্ত বর্ণনা। তারিখ: ১০-৮-১৯৯৯)



আমিন উল্লাহ শেখ, বীর বিক্রম, নভেম্বর ১৯৩৬ সালে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানাধীন পাইকপাড়া গ্রামে এক সাধারন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর জনাব শেখ ১৯৫৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর সাবমেরীনে প্রশিক্ষণ কোর্স গ্রহণের জন্য তিনি ফ্রান্সে যান। ফ্রান্সের তুলন নৌ-ঘাটিতে পেশাগত কোর্স গ্রহণ কালীন বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান বাহিনীর বাঙালি নিধন অভিযান ও ২৬ মার্চ এর স্বাধীনতার আহবান জাহাজে কর্মরত অবস্থায় তিনি বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমে শুনতে পান। তিনি সপক্ষ ত্যাগ করে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আরও ৭ জন বাঙালি সাবমেরীনার সহ ভারতে পৌছেন। ৮ জন নাবিকের মাঝে সিনিয়র ছিলেন চীফ পেটি অফিসার গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ বীর প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী ও ভারতের নৌ-রণবিশারদগণ তাঁদের উপস্থিতিতে নৌকমান্ডো বাহিনী গঠনে অনুপ্রাণিত হন। অতঃপর মুক্তিযুদ্ধে নৌকমান্ডো বাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। অক্টোবর মাস থেকে তিনি চাঁদপুর নৌ-বন্দরে কমান্ডো অপারেশনে দলীয় কমাণ্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চাঁদপুর নদী বন্দরে তাঁর নেতৃত্বে অনেকগুলি জাহাজ ডোবানো হয়। মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগ ও বীরত্বের জন্য সরকার তাকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করেন। স্বাধীনতা উত্তর তিনি বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীতে পুণঃ যোগ দেন এবং কমিশন লাভ করেন। লেঃ পদমর্যাদায় কর্মরত অবস্থায় আশির দশকে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং পেনশন ভাতা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। অতঃপর বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে একজন ইলেকট্রিক্যাল অফিসার হিসেবে চুক্তিভিত্তিক চাকরিতে যোগ দেন। তিনি বেশি দিন চাকরি করতে পারেননি। হতাশা ও দুশ্চিন্তায় তিনি দ্রুত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে দীর্ঘদিন নানা জটিল রোগে আক্রান্ত থাকার পর ৬৫ বছর বয়সে ১৫ জুলাই ১৯৯৯ রোজ বৃহস্পতিবার চট্রগ্রামে নিজস্ব বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

(তথ্যঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডো এসোসিয়েশন স্মরনিকা ১৯৯৯)



শেখ আব্দুস সেলিম (কোকিল), পিতা-মৃত শেখ আব্দুল ওয়াহাব। গ্রাম- সুলতানপুর, ডাকঘর-সাতক্ষীরা, জেলা-সাতক্ষীরা।

১৯৭১ সালে যুবক আঃ সেলিম সাতক্ষীরা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি সাতক্ষীরা শহরে আন্দোলনকামী ছাত্র জনতার ঢল দেখেছেন। বড় ভাই শেখ আব্দুল নাসির ময়না ছিলেন ছাত্রলীগ এবং পরবর্তীর্তে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা। সেই সময় যুবক আঃ সেলিম (কোকিল) বড় ভাইয়ের সাথে প্রতিটি মিটিং মিছিলে যোগ দিতেন।

১৮ এপ্রিল, পাকবাহিনী শতাধিক সাজোয়া বহর নিয়ে শহরে প্রবেশ করে। এর আগে ছাত্র, পুলিশ, ইপিআর সাতক্ষীরায় ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে প্রায় দু'কোটি টাকা নিয়ে প্রবাসী সরকারের নামে জমা করে। সাতক্ষীরার অবাঙালি এসডিওকে গ্রেফতার করে ভারতে নিয়ে যায়। যে কারণে জনতা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পূর্বাহ্নেই শহর ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করে। শেখ আঃ সেলিম (কোকিল) ও জনতার ঢলে মিশে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বড়ভাই এর সাথে আর কোন যোগাযোগ থাকলনা। সেলিম বন্ধুদের সাথে একত্রিত হয়ে তকিপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন।

১২ মে, ভারতীয় নৌবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের টিম সাথে কর্ণেল এম.এ.জি. ওসমানী, ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, সাবমেরীনার গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ তকীপুর আসেন। নৌকমান্ডো গঠন করতে প্রশিক্ষনার্থী মনোনয়নের জন্য। ১০/১২ হাজার যুবকের মধ্য থেকে শেখ আঃ সেলিম সহ ৮৫ জন যুবক মনোনীত হন।

১৩ মে, তারা সামরিক ট্রাকযোগে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে এসে উপস্থিত হন। ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা থেকে ৭ই আগষ্ট পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ''অপারেশন জ্যাকপট'' এর অধীন সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ বীর প্রতীকের নেতৃত্বে ৬০ জন কমান্ডো গ্রুপের সাথে মংলা সমুদ্র বন্দর অভিযানে অংশ নেন। মংলা বন্দরের পাশ্ববর্তী পশুর নদী অতি ভয়াল, এখানে কেহ কোনদিন সাঁতরিয়ে নদী অতিক্রম করেন। প্রবল স্রোতের বেগ, নদীতে অসংখ্য হাঙ্গর এবং কুমীর। এরমাঝে নদী অতিক্রম করে বিপরীত তীরে অবস্থিত ৬ খানা বিদেশী জাহাজ ধ্বংস করেন এই কমান্ডো দল। এরপরও তিনি অনেকগুলি অভিযানে অংশ নিয়েছেন।

স্বাধীনতার পর তিনি ছাত্র জীবনে ফিরে যান। শিক্ষা সমাপ্তির পর ভাগ্যান্বেষনে বিদেশ গমন করেন। বর্তমানে নিজ বাড়িতে জীবন যাপন করছেন।



ক্যাপ্টেন মোঃ ইসহাক, পিতা-নচীর আহম্মেদ মজুমদার, গ্রাম-পূর্ব অলকা, ডাক+তার-পরশুরাম, জেলা-ফেনী। জন্ম-৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৭। ১৯৫৮ সালে নিজ গ্রাম অলকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬৪ সালে পরশুরাম মডেল হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে করাচী শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এইচ.এস.সি উত্তীর্ণ হন। তাঁর পিতা জনাব নচির আহম্মেদ মজুমদার এলাকার বিশিষ্ট সমাজ সেবক এবং গন্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত।

১৯৬৪ সালের ২৮ নভেম্বর পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ডিই, ইউসি, ঢাকা এন.আর.ও. হিসেবে ভর্ত্তি হন। নিয়োগ প্রাপ্তির পর করাচীতে পিএনএস বাহাদুরে ৬ মাস প্রাথমিক প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ৯ মাস নৌবাহিনীর বেসিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৭১ এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তদানিন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ পিএনএস টিপু সুলতান, পিএনএস হিমালয়, পিএনএস মোবারক এবং পিএনএস পেশাওয়ার এ কর্মরত ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ তিনি কর্মস্থল থেকে দুই মাসের ছুটি নিয়ে নিজ গ্রামে চলে আসেন। ২৫ মার্চ ঢাকায় ক্রাক ডাউন হলে এই সংবাদ সাথে সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ২৭ মার্চ মোঃ ইসহাক থানা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা নিয়ে এলাকার ছাত্র এবং যুবকদের সমন্বিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। একাজে আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম খোকা মিয়া তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন। আত্মরক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল।

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে এক সেকশন পরিমান অবাংগালী ইপিআর সদস্য বিলোনিয়া ষ্টেশনের অতি নিকটে সীমান্ত পীলার হতে ৫০০/৭০০ মিটার দূরে মুহুরী নদীর দক্ষিণ পাড়ে স্থায়ীভাবে নির্মিত ৩টি বাঙ্কারে অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের এই অবস্থান থেকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল ছাত্র যুবক, ইপিআর সদস্যসহ মোঃ ইসহাক অবাংগালী ইপিআরদের উপর দুঃসাহসীক ভাবে আক্রমন পরিচালনা করে তাদেরকে পরাস্ত করে এলাকা শত্রুমুক্ত করেন।

১৩ জুন, লেঃ কর্ণেল জাফর ইমাম বীর বিক্রম (অব:) এর নেতৃত্বে মুন্সীর হাটে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু শত্রুবাহিনীর ভারী মর্টার শেলিং এর ফলে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে

বাধ্য হয়। মোঃ ইসহাক এই যুদ্ধে অংশ নেন। এবং অধিনায়কের নির্দেশে পিছিয়ে যেয়ে ভারতের চোত্তাখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অবস্থান গ্রহণ করেন।

আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে চোত্তাখোলা ক্যাম্প থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে অংশগ্রহণের জন্য তিনি সামরিক বিমানে চেপে কলকাতা পৌঁছেন। অত:পর হুগলী নৌ ঘাটিতে পৌঁছে তিনি এখানে পূর্বে সমবেত বাঙালি নাবিকদের সাথে মিলিত হন। নৌবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা পরিচালনার জন্য কলকাতা বন্দরের দু'টি পুরাতন টাগবোটকে গার্ডেন রীচ ওয়ার্কসপে দ্রুত গতিতে পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়। কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান প্রফুল্ল কুমার সেন গানবোর্ট দু'টিকে 'পদ্মা' ও 'পলাশ' নামে কমিশন করেন। মোঃ ইসহাক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রথম যুদ্ধ জাহাজ পলাশ এর একজন ক্রু হিসেবে যোগদান করেন।

নভেম্বর মাসে দু'টি গানবোট মংলা বন্দরের প্রবেশ মুখে আটটি গ্রাউন্ড মাইন স্থাপন করে। যার আওতায় ৩টি বিদেশী বানিজ্যিক জাহাজ ও একটি পাকিস্তানী গানবোট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গ্রাউন্ড মাইন স্থাপন করে হলদিয়া বন্দরে প্রত্যাবর্তনকালে একটি পাকিস্তানী পতাকাবাহী বৃটিশ জাহাজকে তারা ধাওয়া করে এবং গানবোটে স্থাপিত ৪০/৬০ মিঃ মিঃ কামানের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করে। ফলে বৃটিশ জাহাজ সেন্ট-আল-ভেনাস পালিয়ে কলকাতা বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

২১ নভেম্বর, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত যুদ্ধ আরম্ভ হলে গানবোট 'পদ্মা' ও 'পলাশ' হলদিয়া বন্দর হতে যাত্রা শুরু করে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ হয়ে ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখ মংলা বন্দর পৌঁছে। এই সময় ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ 'পানভেল' এবং 'চিত্রাঙ্গদা' তাদের মাঝে যোগ দেয়। ১০ই ডিসেম্বর নৌবহরগুলি খুলনা শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলে ভারতীয় বেমারু বিমান ভূলবশতঃ 'পদ্মা' ও 'পলাশ' এর উপর বোম্বিং করে। ফলে জাহাজ দুটিতে আগুন ধরে যায়। ফলে অনেক কর্মকর্তা এবং নাবিক শহীদ হন। অনেকে আহত অবস্থায় সাঁতরিয়ে তীরে উঠেন।

মোঃ ইসহাক একজন আহত সহযোদ্ধা সহ সাঁতরিয়ে তীরে পৌঁছলে দুইজন রাজাকার দ্বারা আক্রান্ত হন। তিনি একজন রাজাকারের ৩০৩ রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে আহত সহযোদ্ধাসহ আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। ঐদিন বিকালে নৌকাযোগে ৫ জন আহত যোদ্ধাকে নিয়ে তিনি মংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পবন চোরার সন্নিকটে পৌঁছলে ভারতীয়. গানবোট পানভেল তাদেরকে উদ্ধার করে। ১৬ ডিসেম্বর তাঁরা কালিগঞ্জ পৌঁছেন।

১০ জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন দিবসে তিনি ঢাকাতে

নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। অতঃপর আপার ইয়ার্ড ম্যান স্কীম এর আওতায় অফিসার হিসেবে নির্বাচিত হয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ ঘাঁটি ভেন্ডুরুথীতে গমন করেন। ১৯৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সাব লেঃ পদে কমিশন লাভ করেন। ২৯ নভেম্বর ১৯৭৫ লেঃ এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে অস্থায়ী লেঃ কমান্ডার, ১২ অক্টোবর ১৯৮৭ সালে লেঃ কমান্ডার, ১ জানুয়ারি ১৯৯০ সালে অস্থায়ী কমান্ডার এবং ১ জানুয়ারি ১৯৯১ কমান্ডার পদ লাভ করেন।

১৯৯৭ সালের ১ জুলাই তিনি অস্থায়ী ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে সি.এস.ও. টু কমডোর কমান্ডিং চট্টগ্রাম, হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন একই থানার সলিয়া গ্রামের জনাব নূরুল হুদা মজুমদার এর কন্যা কাওসার জাহান (নাছরীন) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

(সূত্র ঃ প্রাপ্ত বর্ণনা, তারিখ ঃ ২৯শে ফেব্রুয়ারি ২০০০)

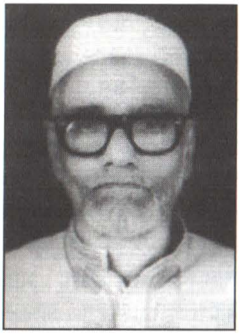


মোঃ আব্দুল গফুর, পিতা-আঃ গনি মণ্ডল, গ্রাম-পাচকায়বা, থানা- শার্শা, জেলা- যশোর। ১৯৫১ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। '৬৭ সালে ঝিকরগাছা এম,এল হাই স্কুল থেকে এস,এস,সি পাশ করেন। ১৯৭১ সালে এম এম কলেজে বিএ শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। পূর্ব থেকে ছাত্র রাজনীতি করতেন। '৬৮ সালে জেলা ছাত্রলীগের সাহিত্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১লা মার্চ থেকে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে জনমত সৃষ্টি এবং পাকিস্তানীদের প্রতিরোধ করার জন্য যশোর পুলিশ লাইন থেকে অস্ত্র লুট করে ই,পি,আর, হাবিলদার নুরুল হকের নেতৃত্বে এলাকায় ছাত্র যুবকদের গোপনে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ৪ এপ্রিল ঝিকরগাছাতে আনসার এডজুটেন্ট সামছুর রহমান এর নেতৃত্বে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের বসিরহাটস্থ তকীপুর ক্যাম্পে উপস্থিত হন। এখানে একমাস অবস্থানের পর ১৩ মে, নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য পলাশী উপস্থিত হন। এখানে তিনমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট, চাঁদপুর নদী বন্দর অভিযানে অংশ নেন। সাবমেরীনার বদিউল আলম ছিলেন ২০ জন কমান্ডো দলের অধিনায়ক। কমান্ডো আঃ গফুর এই অভিযানে উপদলনেতা হিসেবে একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন। ১৫ আগষ্ট, তাঁরা চাঁদপুর বন্দরে ৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেন।

এরপর অক্টোবর মাসে পুনরায় বদিউল আলমের নেতৃত্বে মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। নভেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি অত্র এলাকায় থেকে প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অংশগ্রহণে যুদ্ধের সংখ্যা ১২টি। স্বাধীনতা পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব সূচক খেতাব নিয়ে তাঁর মাঝে প্রশ্ন যে, কমান্ডোরা জীবনের ঝুকি নিয়ে পশুর নদীর মতো ভয়াবহ নদীতে বার বার জাহাজ ডুবিয়েও খেতাব থেকে বঞ্চিত হলো। অথচ কমান্ডোদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পানির উপর থেকে একটি গুলিও না চালিয়ে বীর বিক্রম, বীর প্রতীক এমনকি বীর উত্তম খেতাব লাভ করলেন। এই বৈষম্য দেখে, সক্রিয় যোদ্ধা হিসেবে স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্ব সূচক খেতাব প্রহসন বলে মনে করেন। এছাড়া নয় নম্বর সেক্টরে যে সকল কমান্ডো যুদ্ধ করেছেন তাদের একজনকেও বীরত্বপূর্ণ খেতাব দেয়া হয়নি। অথচ অন্যান্য সেক্টরের চেয়ে এই সেক্টরের অধীনে শত্রু বাহিনীর বেশি সংখ্যক জাহাজ এবং অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ কমান্ডোদের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। এই বৈষম্য দূরীকরনের জন্য তিনি ন্যায্য অধিকার বঞ্চিতদের মাঝে খেতাব প্রদানের পক্ষপাতি। বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত। তার সমর্থিত দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ২ ছেলে এবং ৩ কন্যার জনক। স্ত্রী রেবেকা পারভীন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত।

(সুত্রঃ প্রদত্ত বর্ননা ও অডিও রেকর্ড, তারিখঃ ২০.৬.২০০০)



সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, পিতা- মরহুম সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন। মাতা- মরহুম আশরাফুন্নেছা। গ্রাম- সিড্যা, থানা- ডামুড্ডা, জেলা- শরীয়তপুর। বর্তমান- ৭/১৮০ রূপনগর কলোনী, মীরপুর, ঢাকা। ১৯৩১ সালের ৬ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে দারুল আনাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন।

১৯৫০ সালের ১৬ আগষ্ট পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে সাবমেরীন বিভাগে বদলি হন। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সে পাকিস্তান নৌবাহিনী কর্তৃক খরিদকৃত সাবমেরীন ম্যানগ্রোতে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য ফ্রান্স যান। ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ, প্রশিক্ষণ শেষে ১ মে তাদের পাকিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করার কথা। ইতিমধ্যে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু একইদিন মধ্যরাতের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ তাঁরা বিবিসি প্রচার মাধ্যমে সকল সংবাদ অবগত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রতিকুলতার মাঝে তাঁরা ১০ মে দিল্লী পৌঁছেন।

এরপর ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে নৌকমান্ডো বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী প্রান্তরে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্প নির্মিত হলে সৈয়দ মোশাররফ হোসেন ভারতীয় প্রশিক্ষকদের সাথে তিনিও প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অক্টোবর মাসে একটি কমান্ডো গ্রুপ নিয়ে ফরিদপুর এলাকায় অভিযানে আসেন। ৫ অক্টোবর গোসাইর হাটে পাকবাহিনীর ৮টি লঞ্চের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ হয়। স্থলবাহিনীর বাচ্চু ও শাহাদৎ এর নেতৃত্বাধীন দল এ যুদ্ধে অংশ নেয়। এখানে রাজাকাররা জয় বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে পিছন দিক থেকে এসে মুক্তিবাহিনীকে ঘিরে ফেলে। ফলে বহু মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

এদিন সৈয়দ মোশাররফ হোসেন বীর বিক্রমে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁর অভিযোগ, ভারতীয় নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তার যোগসাজসে তাঁকে প্রস্তাবিত খেতাব না দিয়ে অন্যকে দুটি খেতাব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

(তথ্য সূত্র ঃ লিখিত বর্ণনা. তারিখঃ ১৮ সেপ্টেম্বর ৯৯)



মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী, বীর প্রতীক, পিতা- মরহুম মোঃ মেহেরউল্লাহ পাটোয়ারী। গ্রাম- মইশদী, ডাকঘর- মইশদী, থানা- চাঁদপুর, জেলা- চাঁদপুর। জন্ম- ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬৫ সালে সফরমালী হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি এবং চাঁদপুর কলেজ থেকে এইচ.এস.সি এবং ১৯৭০ সালে বিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি অধ্যয়নকালে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

ছাত্র জীবনে তিনি বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন ছাত্রলীগের সমর্থন এবং সক্রিয় সদস্য ছিলেন। `৭১ সালের মার্চ মাস যখন সমগ্র বাংলাদেশ ছাত্র জনতার পদভারে কম্পিত সেইসময় জনাব মমিনউল্লাহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলেন। দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে মার্চের শেষ সপ্তাহে তিনি নিজ গ্রামে চলে যান। এর মাঝে চলে আসে ২৫ মার্চ। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও চরম পৈশাচিকতার মধ্যে দিয়ে শুরু করে অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন, গণহত্যা এবং নারী নির্যাতন।

২৬ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা দেয়া হলে শক্তিশালী পাকিস্তানী শত্রুর বিরুদ্ধে বাংলার আপামর জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যুদ্ধ ক্রমে রাজধানী শহর অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতার জন্য দেশের ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক এবং সশস্ত্র বাহিনীর অকুতোভয় বীর যোদ্ধারা প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। সেই সময়ে যুবক ছাত্র মোঃ মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন। স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির সাথে মিশে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং ভারত গমনকারী পাকবাহিনী কর্তৃক অত্যাচারিত মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন। কিন্তু এভাবে বেশিদিন কাজ করা সম্ভব হলোনা। শত্রু সৈন্যরা এক সময় তাঁর গ্রামে চলে আসে। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের অদম্য স্পৃহা এবং নিরাপত্তার জন্য তিনি এপ্রিল মাসে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব সহ গ্রাম ত্যাগ করে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সাতদিন যাবত পায়ে হেঁটে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের হাতীমারা ক্যাম্পে যোগদান করেন।

জুন মাসের মাঝামাঝি ভারতীয় নৌবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা হাতীমারা ক্যাম্পে উপস্থিত হন। তারা নৌযুদ্ধে প্রশিক্ষণের জন্য কিছু শিক্ষিত সুঠাম দেহী যুবক যারা ভাল সাঁতার জানে তাদের এই প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে নিয়ে যায়। মোঃ মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী এই কমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জনা মনোনীত হয়ে পলাশী চলে আসেন।

১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় ট্রেনিং সমাপ্ত হলে তিনি সাবমেরীনার বদিউল আলম এর নেতৃত্বে ২০ জন কমাণ্ডো দলের সাথে চাঁদপুর নদী বন্দর অপারেশনে চলে আসেন। দু'টি সাংকেতিক গানের মাধ্যমে সেদিন বাংলাদেশের দু'টি সমুদ্র বন্দর এবং কয়েকটি নদী বন্দরে অভিযান পরিচালিত হয়। জনাব মমিনউল্লাহ পাটোয়ারী চাঁদপুর নদী বন্দরের জন্য প্রেরিত দলের উপ-দলনেতা ছিলেন।

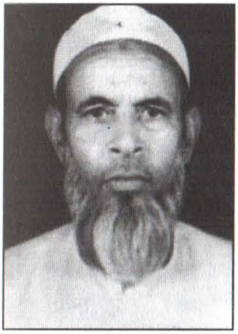
১৫ আগষ্ট চাঁদপুর বন্দরে এই কমাণ্ডো গ্রুপ ৬টি পণ্যবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। এই অভিযান ছিল যেমন রোমাঞ্চকর তেমনই ভয়াবহ। যুদ্ধে নৌযোদ্ধাদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে ১৮ আগষ্ট শত্রু সৈন্যরা দাশাদী গ্রামের জনাব ইব্রাহিম বিটি সাহেবকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি নৌকমাণ্ডোদের আশ্রয় এবং খাবার দিয়েছিলেন।

১৯-২২ আগষ্ট তারিখে এই দলের কমাণ্ডোগণ বিভিন্ন পথে ভারতে ফিরে যান। অক্টোবর মাসে পুণরায় ২০ জন কমাণ্ডোর অপর একটি দল সাবমেরীনার আমানউল্লাহ শেখ এর নেতৃত্বে চাঁদপুর পৌঁছেন। এবারও মোঃ মমিনউল্লাহ উপ দলনেতা ছিলেন। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তাঁরা এখানে অবস্থান করে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন এবং সবগুলি অভিযান সফল হয়। কয়েকটি অপারেশনে অত্যন্ত সাহসীকতার সহিত অংশগ্রহণ ও সফলতার কারণে সরকার তাঁকে 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে তিনি বিসিএস ক্যাডারভূক্ত হয়ে পুলিশ বিভাগে ভর্তি হন এবং বিভিন্ন পদে অত্যন্ত সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯২ সালে তিনি সেনেগালের বাংলাদেশ দূতাবাসে কাউন্সিলর হিসেবে এবং ১৯৯৫ সালে অষ্ট্রেলিয়ান দূতাবাসে কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালের মে মাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মহাপরিচালক পদে দায়িত্বরত আছেন।

(সুত্রঃ প্রদত্ত বর্ননা, তারিখঃ ১৫.৮.২০০০)



সাবমেরীনার মোঃ আহসানউল্লাহ, বীর প্রতীক, পিতা- মৃত মোঃ আমিনউল্যাহ, গ্রাম- আহমদপুর, ডাকঘর- আহমদপুর, থানা- সোনাগাজী, জেলা- ফেনী। জন্ম- ২ ডিসেম্বর ১৯৪২ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এ পাশ।

১৯৬১ সালের ১৩ ডিসেম্বর তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। এরপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাকে করাচীতে পাঠানো হয়। এখানে পিএনএস বাহাদুর, পিএনএস কারসাজে ১৮ মাস বেসিক এবং প্রফেশনাল ট্রেনিং সমাপ্ত করেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানী সাবমেরীন ম্যানগ্রোতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ফ্রান্স গমন করেন। ফ্রান্সের তুলন পোতাশ্রয়ে ২ বছর প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ১ এপ্রিল '৭১ পাকিস্তানের পথে রওনা হওয়ার কথা। ৩১ মার্চ, তাঁদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়।

ইতিমধ্যে জাহাজে অবস্থানরত বাঙালি নাবিকরা ২৫ মার্চ ঢাকাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা এবং ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক দেশের স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জানতে পারেন। ৮ জন নাবিকের মাঝে একমাত্র চীফ পেটি অফিসার ছিলেন গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ। অন্য ৭ জন ক্রু ৩১শে মার্চ, সন্ধ্যায় তারা তুলনঘাঁটি থেকে পলায়ন করেন। উদ্দেশ্য ভারতে পৌছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। দীর্ঘপথে অনেক ঝুঁকির মধ্য দিয়ে ১০ এপ্রিল তাঁরা নয়াদিল্লী এসে পৌছেন।

এখানে ভারতীয় নৌবাহিনী তাঁদের সাহায্যে বাঙালি যুবকদের নিয়ে ৫০০ সদস্যের একটি কমাণ্ডো গ্রুপ তৈরীর পরিকল্পনা করেন। ১৩ মে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে এই নৌকমাণ্ডো ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ ছিলেন এই ক্যাম্পের একজন দক্ষ প্রশিক্ষক। ৩ মাস প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পর দলনেতা হিসেবে ৭ আগষ্ট তাকে মংলা বন্দর অভিযানে পাঠানো হয়। এই দু:সাহসিক অভিযানে তাঁর নেতৃত্বে ৬০জন কমান্ডোকে ৫টি দলে বিভক্ত করে ৫জন উপ দল নেতার অধীনে যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ৫জন উপ দলনেতা হলেন মোঃ মুজিবুর রহমান, শেখ মহসীন আলি, আঃ সেলিম, খলিলুর রহমান ও গাজী আঃ গাফফার।

১৫ আগষ্ট, অপারেশন জ্যাকপটে তিনি মংলা বন্দরে সফলভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এদিন ভয়াবহ মংলা বন্দরে ৬টি সমুদ্রগামী জাহাজ ধ্বংস হয়। এরপর অক্টোবর মাস থেকে লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস জনাব আহসানউল্লাহ এবং কয়েকজন নৌ কমান্ডোকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ অপারেশনের জন্য পাঠান। কিন্তু ব্রিজের পীলারগুলি ইট সিমেন্টের তৈরি, তাছাড়া নদীতে প্রবল স্রোতের মুখে

কোন নৌকা বা কমাণ্ডো পীলারের গায়ে অবস্থান করতে পারেনি। ফলে কয়েকবার প্রচেষ্টা চালিয়েও তিনি এবং তাঁর সাথী যোদ্ধারা ব্যর্থ হন। ব্রিজ রক্ষার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাহারাও ছিল জোরদার। একবার কয়েকজন কমাণ্ডো পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার হাত থেকে কৌশলে বেঁচে চান। আর একবার কমাণ্ডোদের বহনকারী নৌকা পাকবাহিনী গুলি করে ডুবিয়ে দেয়। কমাণ্ডোরা স্রোতের অনুকুলে সাঁতরিয়ে বহু দূরে যেয়ে একত্রিত হন।

অকুতোভয় যোদ্ধা সাবমেরীনার আহসানউল্লাহকে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সরকার বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন। অথচ প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি পলাশীতে ক্যাম্প উদ্বোধনের পর প্রথম পরিদর্শন কালে ঘোষনা দিয়েছিলেন যেসব কমাণ্ডো একবার যুদ্ধে অংশ নিবেন তাঁকে সর্বোচ্চ (জীবিত) খেতাব প্রদান করা হবে। কিন্তু সে ওয়াদা রক্ষা হয়নি। এমনকি নৌযুদ্ধে শহীন হয়েছেন তাঁদেরকেও খেতাব দেয়া হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না এমন নৌকমাণ্ডো আজও আছেন। তিনি মনে করেন, যে জাতি বীরের মর্যাদা দিতে জানে না সে দেশে বীর সন্তানের পুন: উদ্ভব ঘটেনা।

স্বাধীনতার পর তিনি নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি নিজ বাড়ীতে অবসর জীবনযাপন করছেন।

(তথ্য সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা তারিখঃ ২১ জুলাই ২০০০)



মোঃ মুজিবুর রহমান, ১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কাহিনীতে ভরপুর। শুধু তাই নয়, বীর মুক্তিযোদ্ধার ত্যাগ ও মহিমার আদর্শে প্রত্যেকটি বাঙালি পেলো বীরের মর্যাদা। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন জাতির স্বাধীনতা লাভের জন্য এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের ত্যাগ স্বীকার নজির বিহীন। মুক্তিবাহিনী এই গৌরবান্বিত জাতিরই একটি অংশ।

তাঁদের দেশপ্রেম, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের কাহিনী বাংলাদেশের মাঠে ঘাটে প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। ইতিহাসের পাতায় এদের নাম সোনার হরফে লেখা থাকবে। এমন অসমসাহসী আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধার মাঝে একজন মোঃ মুজিবুর রহমান। জন্ম ৪ জুলাই ১৯৫৩। পিতা-মরহুম আলহাজ্ব অহেদ আলী মোড়ল, গ্রাম- কাশিয়াডাঙ্গা, থানা- শার্শা, জেলা- যশোর। তাঁর পিতা ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজ সেবক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি। মোঃ মুজিবুর রহমান বর্তমান- সহকারী ম্যানেজার, বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহীতে কর্মরত এবং নির্বাহী সদস্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমাণ্ডো এসোশিয়েশন, কেন্দ্রীয় কমিটিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি ১৯৬৯ সালে রাজগঞ্জ হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৭২ সালে ঝিকরগাছা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। ১৯৮৪ সালে দৌলতপুর কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন।

১৯৬৯ এর ছাত্র ও গণআন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। ২৯ মার্চ, জণগন, পুলিশ, ইপিআর কর্তৃক যশোর সেনানিবাস ঘেরাও করে এবং ৪৮ ঘন্টা যুদ্ধের পর পশ্চাদপসারন করতে বাধ্য হয়। এপ্রিল মাসে বাঙালি, ইপিআর, পুলিশ ও সেনা সদস্যরা যখন পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যশোর-বেনাপোল সড়ক পথে ভারত গমণ করতে থাকেন সে সময় মুজিবর রহমান এবং তার সাথীরা তাদের খাদ্য ও যানবাহন দিয়ে ভারত সীমান্তে পৌছে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সকল রকম সহযোগিতা করেন। এই সময় কোন যান বাহন না থাকায় তিনি যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত একজন সেনা সদস্যকে নিজের বাই সাইকেলে বসিয়ে ভারত সীমান্তে পৌছে দিয়ে আসেন। এপ্রিল মাস ব্যাপী ভারতগামী সশস্ত্র সৈনিক ও সরণার্থীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান, খাদ্য, আশ্রয়, পথ প্রদর্শক, চিকিৎসা, সেবা দিয়ে স্বেচ্ছা সেবকের ভুমিকা পালন করেন। এর পাশাপাশি এলাকার যুবকদের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করতে থাকেন।

৫ মে, তার ভাতীজা আফতাবউদ্দিন সহ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের বনগাঁয়, ৫নং টালিখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এখানে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে ১২ মে, কর্ণেল ওসমানী, নৌবাহিনীর গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ, ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ সমীর কুমার দাস টালিখোলা ক্যাম্পে আগমন করেন। নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ দানের জন্য রিক্রুটিং কমিটি কর্তৃক ৪০০ যুবকের মাঝে ৪৫ জন মনোনীত হয়। মুজিবুর রহমান এবং শহীদ আফতাবউদ্দিন (সম্পর্কে ভাই এর ছেলে) উভয়ে এই রিক্রুটিং কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন লাভ করেন। একই দিনে ৪টি সামরিক ট্রাক যোগে রওয়ানা দিয়ে তারা রাতে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার অর্ন্তগত একটি সামরিক ঘাঁটিতে পৌঁছে রাত্রি যাপন করেন। অত:পর ১৩ মে, মুর্শিদাবাদ থেকে পলাশী আগমন করেন। স্থানটি ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌল্লা এবং ইংরেজ ক্যাপ্টেন ক্লাইভের মাঝে যুদ্ধ ক্ষেত্র।

স্থানটিতে যুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে মনুমেন্ট, পাশে দর্শনার্থীদের জন্য সুন্দর ডাক বাংলো, চারিপাশে সুন্দর সারিবদ্ধ বিভিন্ন প্রকৃতির গাছের সমারোহ। যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্বপাশে ভাগিরথী নদী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রের চারিপাশ ঘিরে ভাগিরথীর তীরে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প তৈরী হয়। ৩ মাস বিশেষ পদ্ধতির সাঁতার জুডো কারাত এবং বিস্ফোরকের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ৪ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানের লক্ষ্যে ৬০ জন সদস্যসহ মুজিবুর রহমান ক্যাম্প পরিত্যাগ করেন। এদিন ব্যারাকপুর সেনানিবাসে রাত্রি যাপন করেন। দলনেতা ছিলেন সাবমেরীনার আহসান উল্লাহ বীর প্রতীক। ৬ আগষ্ট ক্যানিং থেকে মংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। বিশাল-বিশাল নদী পাড়ি দিয়ে সুন্দরবনের অভ্যন্তর দিয়ে নৌকাযোগে দূর্গম নদীপথ ধরে সুন্দরবনের সন্নিকটে সুতারখালী গ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শক্তিশালী যুবক মুজিবুর রহমান তাঁর নৌকার পরিচালক ছিলেন। ১০ দিনের এই যাত্রাপথের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা এতটা ভয়াবহ এবং লোমহর্ষক যে, এই বর্ণনায় একটি গ্রন্থ ও রচনা করা যায়। অপারেশন পরিচালনার জন্য ৬০ জন কমাণ্ডোকে ৫টি দলে ভাগ করা হয়। মুজিবুর রহমান একটি দলের লীডার ছিলেন।

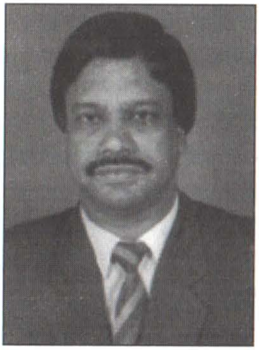
১৫ আগষ্ট, '৭১ মধ্যরাতের পর বিশেষ দু'টি সাংকেতিক গানের মাধ্যমে মংলা বন্দরে সমন্বিত আক্রমণ পরিচালিত হয়। এদিন তাঁরা ৬টি বিদেশী জাহাজ ধ্বংস করতে সমর্থ হন। যারমাঝে পাকিস্তানী পতাকাবাহী সোমালিয়ান জাহাজ এস এস লাইটনিং অর্ন্তভূক্ত ছিল। ১৫ আগষ্টের এই অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে অভিহিত। ৬টি বৃহৎকায় জাহাজ ডুবির ফলে বন্দরে বিদেশী জাহাজ প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

১৫ আগষ্ট, সফল অভিযান শেষে ভারত প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ৭ জন সহযোদ্ধাসহ সাতক্ষীরা জেলার, বুধহাটাতে পাকিস্তানী সৈন্যের এ্যাম্বুশে পতিত

হন। শত্রুবাহিনীর সাথে মরণপণ সম্মুখ যুদ্ধে আফতাবউদ্দিন এবং সিরাজুল ইসলাম শহীদ হন। ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শত্রুর হাতে বন্দি হন। কেবল একজন পালিয়ে আত্মরক্ষায় সমর্থ হন। বন্দি চারজনের উপর শত্রুবাহিনী নির্মমভাবে অত্যাচার চালানোর পর ইন্টারোগেশন এর জন্য যশোর সেনানিবাসে প্রেরণ করে। এই অত্যাচার এর ঘটনা অতি নির্দয় এবং মর্মস্পর্ষী। সাতক্ষীরা ডাক বাংলোর সম্মুখে তাঁদের ৪ জনকে দিয়ে কবর খুঁড়িয়ে বুকে রাইফেল ধরে সত্য প্রকাশের শেষ সুযোগ বলে ঘোষণা দিলেও তাঁরা নৌ অভিযান সম্বন্ধে কোন তথ্য দেননি। ১ মাস বন্দি থাকার পর যশোর সেনানিবাস থেকে মুজিবুর রহমানসহ চারজন কমান্ডো জীবনের ঝুকি নিয়ে পলায়ন করে আত্মরক্ষায় সমর্থ হন এবং তাঁরা পুণরায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

কমান্ডো মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে প্রবেশ করেন এবং ১৯৮৬ সালে অফিসার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহীতে সহকারী ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্বরত আছেন। তিন সন্তান সন্ততির মাঝে বড় মেয়ে ফারহানা আফরোজ (মিলকী) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। অপর কন্যা সুমাইয়া আফরোজ (চুমকী) এবং পুত্র শোভন এর একই সময়ে জন্ম। উভয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। স্ত্রী মিসেস মরিয়ম বেগম একজন সু-গৃহিণী। মুজিবুর রহমান কর্মনিষ্ঠ, দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন একনিষ্ঠ সমাজসেবক এবং দক্ষ সংগঠক। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ। বন্ধু বৎসল এবং ধর্মানুরাগী। মুক্তিযুদ্ধে সহযোদ্ধা ও ভ্রাতুষপুত্র শহীদ আফতাবউদ্দিন এর মর্মান্তিক শহীদ হওয়ার স্মৃতির সাথে অপর সহযোদ্ধাদের নিসত্ত্ব আত্মত্যাগ তাঁকে সার্বক্ষণিক পীড়া দেয়। বর্তমান বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক অবক্ষয়কে রাজনৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে মূল্যায়ন করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রাজনীতি এবং সকল রকম প্রহসনমূলক কর্মকাণ্ডের বিরোধী। মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে পরস্পর বিরোধ এর অবসান হওয়া উচিত। ঐক্য ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং দেশের প্রগতি সম্ভব নয় বলে তার একান্ত ভাবনা। তার এলাকায় স্বাধীনতা বিরোধীদের মাঝে জিনাত মিয়া, তবিবর খাঁ কুখ্যাত হিসেবে চিহ্নিত।

(সূত্র ঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখ ঃ ২৮ অক্টোবর ১৯৯৯)



ড: আলাউদ্দিন আহ্‌মেদ, পিতা-মরহুম ওসমান গণি সর্দার। জন্ম-১ অক্টোবর ১৯৪৭। গ্রাম-বুরুদিয়া, থানা-পাকুন্দিয়া, জেলা-কিশোরগঞ্জ। বর্তমান বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদ সদস্য। (কিশোরগঞ্জ-১।) রাজনৈতিক সমর্থিত দল-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। তিনি ১৯৬৪ সালে কটিয়াদি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৬৬ সালে তিনি কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ থেকে আই.এস.সি পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী এবং ফজলুল হক হলে থাকতেন। ১৯৭১ সালে রসায়নে সম্মানসহ এমএসসি পাশ করেন। মেধা তালিকায় তাঁর স্থান ছিল দ্বিতীয়। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রাজনীতি সচেতন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্যসেনা নামে একটি গ্রুপ গঠিত হয়। গ্রুপের প্রধান ছিলেন (ডঃ) মোঃ আনোয়ার হোসেন, মার্শাল মনি প্রমুখ। এ গ্রুপের উদ্যোগে ইকবাল হলে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়। আলাউদ্দিন আহমেদ এই দলের সদস্য হয়ে ট্রেনিং এ অংশ নেন। এই সময় ডঃ আনোয়ার (কর্ণেল তাহের এর ভাই) এর নেতৃত্বে একবার রসায়ন বিভাগ হতে কেমিকেল নিয়ে মলোটভ ককটেল বানান। ডঃ আলাউদ্দিন একাজে সক্রিয় অংশ নেন। তাঁরা ঢাকার কাজী আলাউদ্দিন রোডের বিভিন্ন দোকান থেকে কেমিক্যাল ও বোমা তৈরীর উপকরণ সংগ্রহ করে শক্তিশালী বোমা তৈরীতে সাহায্য করেন। '৭১ এর আন্দোলনের সময় এই বোমা ঢাকার রাজপথে ফাটানো হয়।

একাত্তরের ২৩ মার্চ তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য গ্রামের বাড়ীতে যান। রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন এবং যান বাহনের অভাবে তাঁকে পায়ে হেটে বাড়ি পৌছতে হয়। ২৬ মার্চ তিনি আকাশবাণীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ জানতে পারেন এবং ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গণহত্যার খবর শুনে ঢাকা ফেরার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে। এলাকাতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। ঢাকা থেকে তখন হাজার হাজার মানুষ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য গ্রামে চলে আসতে থাকে। ডঃ আলাউদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

কিছুদিন গ্রামে থাকার পর ক্যাপ্টেন মতির সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি ক্যাপ্টেন মতি, আব্দুর রহিম, সিদ্দিকসহ এলাকাতে যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। তিনি অস্ত্র এবং প্রতিকূল অবস্থার কথা চিন্তা করে ভারত যাওয়ার চিন্তা করতে লাগলেন। এজন্য মনোহরদির আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের কাছ থেকে একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন। প্রথমবার ভারত যাওয়ার

পথে অষ্টগ্রাম পৌঁছলে পাকিস্তান সমর্থিত চেয়ারম্যান লালমিয়ার বিরোধিতার কারণে তাদেরকে গ্রামে ফিরে আসতে হয়।

মে মাসে পুনরায় ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। আড়াইসিধা গ্রাম হতে নবীনগর থানার কাইতলা গ্রামে পৌঁছে সেখানে তার বন্ধু মিজানুর রহমান এর বাড়িতে রাত্রি যাপন করে পরদিন কসবা পৌঁছেন। ওখান হতে ভারতের আগরতলা পৌঁছলে ছাত্রনেতা আসম আঃ রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, শাহজাহান সিরাজ এর সাক্ষাৎ পান। এখানে কয়দিন অপেক্ষার পর তাঁকে একটি দলের সাথে উচ্চতর নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে পাঠানো হয়।

পলাশীতে তিনমাস কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ বিস্ফোরকের ব্যবহার এবং বিশেষ ধরনের চিৎসাঁতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। তিনমাস প্রশিক্ষণ শেষে ডঃ আলাউদ্দিনকে অপারেশন জ্যাকপটের অধীন মংলা বন্দর অভিযানে পাঠানো হয়। ১৫ আগস্টের সারাদেশব্যাপী সেই বিখ্যাত নৌ-কমাণ্ডো অপারেশনে মংলা বন্দরেই ১১টি জাহাজ ধ্বংস করা হয়েছিল। মোট ৬০ জনের একটি গ্রুপ ৬টি সাব গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অপারেশন করা হয়। তিনি একটি সাব গ্রুপের দলনেতা ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান ছিল মেঘনা ব্রীজ। নৌবাহিনীর এস এ ভুঁইয়ার নেতৃত্বে ডঃ আলাউদ্দিনকে উপ দলনেতা মনোনীত করে মেঘনা ব্রিজ ধ্বংসের জন্য পাঠানো হয়। ভারতের হেজামারা ক্যাম্প হতে তাঁরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। দলের গাইড ছিলেন কুমিল্লার জহির। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে দলটি আশুগঞ্জে এসে পৌঁছে এখানে একটি বাড়িতে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

মেঘনা ব্রিজ অপারেশনের পূর্বে তারা তালশহর ও আশুগঞ্জের মাঝে রেলওয়ে ব্রিজটি উড়িয়ে দেন। এছাড়া আড়াইসিধা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মেঘনা নদী। আড়াইসিধা গ্রাম হতে দলটি নদীতে নেমে স্রোতের প্রতিকূলে ব্রিজকে লক্ষ্য করে সাঁতরাতে থাকেন। কিন্তু প্রবল স্রোতের তোড়ে কমাণ্ডোরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ব্রিজের পীলার ছিল কংক্রিট নির্মিত এবং বিশাল ব্যাসযুক্ত। কোথাও এক্সপ্লোসিভ রেখে কর্টেক্স পেঁচিয়ে ডিলে সুইচ অন করে তিনি ফিরে আসতে শুরু করেন। এক্সপ্লোসিভের বিস্ফোরণ ঘটলে তাতে ৩য় পিলারটি ভেঙ্গে গেলেও ব্রীজের উপরাংশ ধ্বংস হয়নি। ডঃ আলাউদ্দিন ফেরার পথে নদীতে জেলেদের পেতে রাখা মাছধরা জালের মধ্যে ঢুকে বিপদাপন্ন হন। এই সময় তড়িৎ সাথের ড্যাগার এর সাহায্যে জাল কেটে বের হয়ে আসেন। কিন্তু বিপদ পিছু ছাড়েনি, পুণরায় তার পায়ের আঙ্গুলে জেলেদের মাছ ধরার বঁড়শি বিধে যায়। তিনি বহুকষ্টে বঁড়শি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে সাঁতরাতে শুরু করেন। মাঝনদীতে একটি জেলে নৌকা দেখে তিনি সেই জেলের সাহায্যে তার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে মূল দলের সাথে মিলিত হন। বিজয় অর্জন পর্যন্ত দলটি এলাকাতে আত্মগোপন করে থাকে। এখানে অবস্থানকালে এলাকার নিরীহ জনগণের আন্তরিকতা ডঃ আলাউদ্দিনকে বিমোহিত

করে। তিনি মনে করেন দেশের আপামর জনগণ ত্যাগ স্বীকার করেছিল বলেই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন। বিসিএস কাডারে নির্বাচিত হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে প্রথমে রংপুর ও পরে খুলনায় কর্মরত ছিলেন। '৭৫-পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিরোধী প্রশাসনের অংশ হিসাবে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না, তাই স্বেচ্ছায় চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন ১৯৭৭ সালের ১৭ অক্টোবরে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ শিক্ষা জীবনের সকল পর্যায়ে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৯ সালের ৮ এপ্রিল রসায়ন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে 'মনবুশো' বৃত্তি নিয়ে জাপান গমন করেন। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা শিক্ষা সমাপ্ত করার পর 'এ্যানা যাওয়া' বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এস, ও গেনদাই-এ 'তোহোকু' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি,এস,সি ডিগ্রী লাভ করেন। ডক্টরেট করার পর একই বিশ্বাবদ্যালয়ে পোষ্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। দেশে ফিরে এসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে পর্যায়ক্রমে সহকারী অধ্যাপক সহযোগী অধ্যাপক এবং '৯১ সালে পূর্ণ অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ইতি মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমীক কাউন্সিল সদস্য, সিন্ডিকেট সদস্য, শিক্ষক সমিতির দুই বার সাধারণ সম্পদক নির্বাচিত হন। তাছাড়াও শহীদ সালাম বরকত হলের প্রাধ্যক্ষ, ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক প্রভৃতিসহ অনেক গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালের ১ জুলাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং ১৯৯৮ সালের ১৮ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট কর্তৃক উপাচার্য প্যানেলে সর্বোচ্চ ভোটে নির্বাচিত হয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। কিশোরগঞ্জ-১ আসনের (হোসেনপুর-পাকুন্দিয়া) সাবেক সংসদ সদস্য এ,কে,এম সামসুল হক (গোলাপ মিঞা)-এর আকস্মিক মৃত্যুতে সংসদীয় আসন শূন্য হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে উপাচার্যের পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বীর মুক্তি যোদ্ধা ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ একজন সংসদ সদস্য ও শিক্ষাবিদ হিসাবে জাতীয় জীবনে গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রাখার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ দুই মেয়ে এবং এক ছেলের জনক এবং তাঁর সহধর্মিনী মিসেস নূরজাহান আহমেদ সাভার ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের উপাধ্যক্ষ।

(সূত্র ঃ মুক্তিযুদ্ধ ও নৌকমান্ডো অভিযান, পৃষ্ঠা ২১৬-২১৮ এবং বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ-২, পৃষ্ঠা ১৯-২৪)



মোঃ আলফাজ উদ্দিন, পিতা-অজিহার রহমান, গ্রাম- নেবাখালী, থানা- সাতক্ষীরা, জেলা- সাতক্ষীরা। বর্তমান সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন অফিস খুলনায় চাকরিরত। কলেজে অধ্যয়ন কালে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। তিনি তৎকালীন সময়ে আয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মি হিসাবে ছাত্র আন্দোলনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। '৭১ সালে তিনি সাতক্ষীরা কলেজের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। ১৯৭০ এর নির্বাচনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৮ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাতক্ষীরা শহরে প্রবেশ করে। মোঃ আলফাজউদ্দিন এর আগে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বন্ধু বান্ধবসহ ভারত গমন করেন। প্রথমে তিনি পশ্চিম বঙ্গের তকীপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ আয়ত্ত করেন। ১ মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১২ মে '৭১, ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কতিপয় সদস্যসহ একটি দল তকীপুর ক্যাম্পে উপস্থিত হন। নৌবাহিনীতে লোক ভর্তির জন্য। ক্যাম্পে অবস্থানরত প্রায় ৪০০০ যুবককে লাইনে দাঁড় করিয়ে একে একে সাক্ষাতকার নিয়ে মাত্র ৮৫ জন যুবককে মনোনীত করেন। আলফাজউদ্দিন এই ৮৫ জনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন।

এখানে একজন ভাল সাঁতারু হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনমাস কঠোর পরিশ্রম করে বিস্ফোরক ও মাইনের ব্যবহার রপ্ত করে শত্রুর জাহাজ ধ্বংস করার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে সাবমেরীনার আহসানউল্লাহর নেতৃত্বে ৬০ জন নৌ কমান্ডোকে মংলা বন্দর এবং হিরন পয়েন্ট অভিযানে পাঠানো হয়। মোঃ আলফাজউদ্দিন এই দলের একজন উপদল নেতা হিসেবে মংলা বন্দর অভিযানে সাহসীকতার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর ১৮ সেপ্টেম্বর তিনিসহ ২০ জন নৌ কমান্ডো হরিনগর নামক স্থানে পাকিস্তানী গান বোটের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

অক্টোবর মাসে পুণরায় তিনি গাজী মোঃ রহমতউল্লাহর অধীনে ৪০ সদস্যের নৌকমান্ডো দলসহ খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে আশাশুনি, পাইকগাছা,

দাকোপ থানাসহ মংলা এবং চালনা সমুদ্র বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কমপক্ষে ১০/১২টি দু:সাহসিক যুদ্ধে অংশ নেন। অনেক যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য সার্বক্ষণিক চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। দীর্ঘদিন সাতক্ষীরা জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জেলা কমাণ্ডার ছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি আহত হন এবং স্বাধীনতাউত্তর যুদ্ধাহত হিসেবে কল্যান টাষ্ট তাঁর নামে মাসিক ভাতা বরাদ্দ করে কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠায় স্বপ্রনোদিতভাবে ভাতা গ্রহণ বন্ধ করেন। একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিবেদিত প্রাণ। বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমাণ্ডো এসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তিনি দুই কন্যার জনক।

(সূত্র ঃ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার অবলম্বনে)



ইঞ্জিনিয়ার মোঃ ফজলুল হক, পিতা- মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- দেওয়ান পাড়া, পোষ্ট- শ্যামপুর, থানা- মতিহার (সাবেক চারঘাটা), জেলা- রাজশাহী। বর্তমানে প্রিন্সিপাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞান কারিগরী কারখানা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

তিনি ১৯৫২ সালে নিজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে 'নওদাপাড়া মডেল প্রাইমারী স্কুল' হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। 'মাসকাটাদীঘি বহুমুখী কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয়' রাজশাহী হতে ১৯৬৭ সালে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি পাশ করেন। ১৯৬৯ সালে এইচ.এস.সি, পাশ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ১ম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি হন। ২য় বর্ষ (সম্মান) অধ্যয়নকালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে বি.এস.সি (সম্মান) এবং ১৯৭৪ সালে এম.এস.সি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯৭১ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান এর ২য় বর্ষ (সম্মান) এবং সাবসিডিয়ারী পরক্ষার্থী ছিলেন। ঐ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কর্ম বিভাগের অধ্যাপক জনাব নূরুল ইসলামের কোয়ার্টারে থাকতেন। সারাদেশের ন্যায় উত্তর জনপদের রাজশাহী শহরও তখন আন্দোলনকারী জনতার পদভারে প্রকম্পিত। ব্যায়াম করার জন্য প্রতিদিনের মতো ২৬ মার্চ ভোরে নামাজ শেষে তিনি অতিথি ভবনের সম্মুখস্থ মাঠের দিকে যাচ্ছিলেন। অতিথি ভবনের সম্মুখে আসতেই কর্কশ ভাষায় উর্দু ভাষা তাঁর কানে ভেষে এলো 'রুখ যাও' সাথে সাথে হ্যান্ডস আপ করার নির্দেশ আসতেই মোঃ ফজলুল হক অতিথি ভবনের দিকে তাকিয়ে দেখেন দু'জন শাস্ত্রী তার দিকে অস্ত্র তাক করে আছে। হঠাৎ আওয়াজ শুনতে পেলেন, 'ভাগ যাও শালে লোগ'।

তিনি তৎক্ষনাৎ রাস্তার ডানদিকে একলাফ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার শুনতে পেলেন অপর শাস্ত্রীর গলা 'আরে ছোড় নাই দেও-গুলি করো'। তিনি একথা শোনামাত্র লাফিয়ে পাশের গর্তের মধ্যে পড়লেন। শাস্ত্রীদের ছোড়াগুলি তার মাথার উপর দিয়ে শো শো করে চলে গেলো।

গর্তে অবস্থান নিরাপদ নয় ভেবে তিনি বার হয়ে জিগজাগ ভাবে দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান। বাসায় পৌঁছে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গার্ডকে ধরে নিয়ে ফাঁকা মাঠে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করতে প্রত্যক্ষ করলেন। একই দিন দুপুরের পরই তিনি

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে আসেন। এবং সেই মুহুর্তেই ভাবতে থাকেন মুক্তিযুদ্ধ হওয়া উচিত এবং যুদ্ধ সংগঠিত হলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার কথা ভাবতে থাকেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইউওটিসি (বর্তমান বি এন সি সি) ক্যাডেট ছিলেন। শত্রু সৈন্যরা সেদিন কয়েকজন ইউওটিসি ক্যাডেটকে ধরে নিয়ে হত্যা করে।

এরপর ২০ এপ্রিল জনাব ফজলুল হক কয়েকজন বন্ধুসহ পদ্মা নদী নৌকাযোগে পাড়ি দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার 'নন্দির ভিটা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে' ভর্তি হন। এখানে ১২ দিন থাকার পর একদিন সমবেত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে ফল ইন করায়ে কে-কে সাঁতার জানে হাত উঠাতে বললেন। ক্যাম্প কমাণ্ডার ২০ জন যুবককে মনোনীত করেন। তারা বহরমপুর সেনানিবাস হয়ে পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে এসে পৌছেন।

এখানে তিনমাস বিশেষ সাঁতার এবং বিস্ফোরক এর উপর প্রশিক্ষণ লাভ করে সুসাইডাল স্কোয়াডের সদস্য হিসেবে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় ৬০ জন কমাণ্ডো দলের সাথে চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শহরে সবুজবাগ নামের একটি বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখান থেকে শ্রমিকের বেশ ধারন করে তিনি এবং সহযোদ্ধারা কর্ণফুলি নদীর অপর পার খামার বাড়িতে পৌছেন। মাইন এবং অস্ত্রশস্ত্র ভিন্ন পথে গাইডের মাধ্যমে এখানে আনা হয়। ১৫ আগষ্ট 'অপারেশন জ্যাকপটে' অংশগ্রহণ করে তিনি 'হরমুজ' নামের একটি জাহাজে মাইন স্থাপন করেন। সফল অভিযান শেষে ১৬ আগষ্ট দুপুরে কর্ণফুলী পার হয়ে পুণরায় শহরে ফিরে তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শের মহম্মদ সাহেবের বাসায় ফিরে আসেন। জনাব শের মহম্মদ কমাণ্ডো ফজলুল হক এর চাচা।

অতঃপর কমাণ্ডোরা পূর্ব নির্ধারিত আশ্রয় স্থলে ফিরে অতি গোপণীয়তা রক্ষা করে গাইডের সাহায্যে চট্টগ্রাম ছেড়ে ভারতে ফিরে আসেন। নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় বার চট্টগ্রাম অভিযানে যান কিন্তু এবার তাঁদের অভিযান ব্যর্থ হয়।

তিনি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। ২ পুত্র এবং ২ কন্যার জনক। বড় ছেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষ সম্মান লোক প্রশাসন বিষয়ে অধ্যয়নরত। অন্যরা স্কুলগামী। স্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর জন্য গর্বিত এবং একজন সুগৃহিণী। পিতামাতা উভয়ে জীবিত আছেন। জনাব ফজলুল হক কর্মজীবনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও কল্যানমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমাণ্ডো এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২০ সেপ্টেম্বর ৯৯)



মোঃ আজিজুল আলম, পিতা- মরহুম সমিরউদ্দিন মিস্ত্রি। গ্রাম-কলিগ্রাম, ডাকঘর-বাঘা, জেলা-রাজশাহী। বর্তমান ঠিকানা- ৭/১৭২ রূপনগর টিনশেড কলোনী, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬। জন্ম- ২০ জুন ১৯৫১। তিনি ১৯৬৭ সালে কালিদাসখালি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি এবং রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম বিভাগে এইচ.এস.সি এবং ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান ও এম.এস.সি ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষা জীবনের শুরুতে ১৯৬২ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের প্রতিবাদে স্কুলে ধর্মঘট করায় আজিজুল আলম সহ ৭ জন ছাত্রকে স্কুল থেকে কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেন কিন্তু ৭ জন ছাত্রই মেধাবী থাকায় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়। ১৯৬৬ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৮ সাল থেকে রাজশাহী কলেজে ছাত্রলীগের ক্রীড়া সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে 'রাকসু' নির্বাচনে সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ, ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষনা করলে, ছাত্রলীগের ছেলেরা রাজশাহী শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। আজিজুল আলমও এই সভার একজন সক্রিয় ছাত্রনেতা ছিলেন। পাকিস্তানী গুন্ডাবাহিনী সভার উপর অতর্কিত গুলিবর্ষন শুরু করলে সভা ভঙ্গ হয়ে যায়। কোন ছাত্র আর হলে ফিরে যেতে পারেনি। পাকিস্তানী সৈন্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি দখল করে নেয়। তিনি নদীর পাড় ধরে ১৮ মাইল পথ পায়ে হেঁটে সারদা ক্যাডেট কলেজে এসে আশ্রয় নেন। তিনি ক্যাডেট কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের নিকট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা দেন। ফলে ছাত্রদের মাঝে এক ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা জাগ্রত হয়। অধ্যাপক ক্যাপ্টেন আব্দুর রশিদ (জিয়া হত্যা মামলায় ফাঁসি দেয়া হয়) এর সঙ্গে গোপনে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। এরপর তিনি নিজ গ্রামে এসে ছাত্র জনতাকে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে লিপ্ত হন। ৭ মার্চের পর থেকে এলাকায় বন্দুক ও লাঠি নিয়ে ছাত্র যুবকদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র নিরীহ জনগণের উপর অতর্কিত হামলা ও নির্বিচারে হত্যা শুরু করলে সাথে সাথে সেই সংবাদ আজিজুল আলমের গ্রামেও পৌছে যায়। তিনি স্থানীয় ছাত্র নেতা শফিউর রহমান ও আলাউদ্দিন (প্রকৌশলী) সহ পুনরায় ক্যাডেট কলেজে এসে

ক্যাপ্টেন রশীদ এর সাথে মিলিত হন। ২৮ মার্চ হতে ক্যাপ্টেন রশীদ এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার এবং ছাত্র জনতার একটি বিশাল বাহিনী গড়ে উঠে। আজিজুল আলম এই বাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে ১১ এপ্রিল রাজাপুর হাটে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন কিন্তু পাকিস্তানী বিমান হামলার মুখে টিকতে না পেরে সদলবলে পিছু হটে আসেন। পরদিন ১২ এপ্রিল ঝলমলিয়া ব্রিজের সম্মুখে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে পুনরায় সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে বিপুল সংখ্যক হতাহত হয়। ১৩ এপ্রিল রাজশাহী শহর পাকবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এরপর থেকে তারা অবাঙালি এবং বিহারীদের সাহায্য নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বাঙালি হত্যা লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করতে শুরু করে। বিহারী দীন মোহাম্মদ বোরখা পরে বাঙালীদের জবাই করে হত্যা করতে থাকে।

২৭ এপ্রিল, ছাত্র আজিজুল আলম পুরোদস্তুর একজন মুক্তিযোদ্ধা। শত্রুবাহিনী তাকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষনা করে। ফলে ২৮ এপ্রিল তিনি আত্মগোপন করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ২৯ এপ্রিল ভারতের মুর্শিদাবাদের নন্দীর ভিটা প্রাইমারী স্কুলে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। এখানে ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন রশীদ তাকে ছাত্র যুবকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেন। সাথে সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে দুটি অপারেশনেও অংশ নেন। প্রথম অপারেশন ছিল দুটি করে গ্রেনেড নিয়ে ক্যাডেট কলেজের অভ্যন্তরে অবস্থানরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাসায় হামলা। দ্বিতীয় অপারেশন ছিল চারঘাট থানার অবস্থানরত শত্রুর উপর গ্রেনেড বিস্ফোরন ঘটানো।

২৯ মে, নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ক্যাম্প হতে কয়েকশত যুবকের মাঝে মাত্র ৭ জন মনোনীত হয়ে পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে এসে যোগ দেন। এখানে তিনমাস কঠোর ঝুকিপূর্ণ বিস্ফোরক এবং মাইন এর ব্যবহার এবং বিশেষ ধরনের সাঁতার কাটার প্রশিক্ষণ রপ্ত করেন। প্রশিক্ষণ শেষে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় অপারেশন জ্যাকপটের অধীন খুলনায় হিরণ পয়েন্ট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে হিরন পয়েন্ট অভিযান ব্যর্থ হয়। মাসাধিককাল সুন্দরবনের অভ্যন্তরে মেজর জিয়াউদ্দিনের ক্যাম্পে অবস্থান করে ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে সাতক্ষীরা জেলার হরিনগর নামক স্থানে পাকিস্তান নৌবাহিনীর গানবোটের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। অতঃপর ১০ সেপ্টেম্বর পলাশী নৌ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ফিরে আসেন।

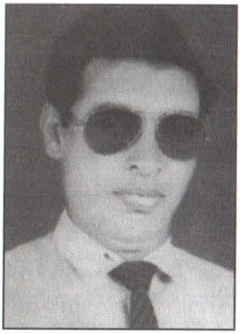
দ্বিতীয় দফায় তিনি ৪ জন নৌকমান্ডো ও ৪০ জন স্থলবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধাসহ আড়ানি ব্রিজ অপারেশনে অংশ নেন। নভেম্বর মাসে পুনরায় ১২ জন নৌকমান্ডোর একটি দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে যাত্রা শুরু

করেন। কিন্তু এখানে পথ প্রদর্শকের ভুলের কারণে তারা অল্পের জন্য মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে মিরশ্বরাই থানার ডোমখালী গ্রামের শফিউল আলম ও বদিউল আলমের সঙ্গে সমিতির হাটে জামালউদ্দিন ও আফছারউদ্দিনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৩রা ডিসেম্বর থেকে তাঁরা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধার সাথে মিলিত হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন।

স্বাধীনতা উত্তর তিনি পুনরায় ছাত্র জীবনে ফিরে যান। শিক্ষা সমাপ্ত করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর নাটোরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের উপ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব রত আছেন।

স্ত্রী আমিরুল আলম একজন সুগৃহিনী। তিন কন্যা ও ১ পুত্রের জনক জনাব আজিজুল আলম কর্মস্থলে একজন দক্ষ ও কর্মনিষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে সুপরিচিত। সমাজ সেবক এবং দক্ষ সংগঠক এবং বর্তমানে নৌ কমান্ডোবৃন্দের সংগঠন এর ভাইস চেয়ারম্যান। বঙ্গবন্ধু পরিষদ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড শাখার সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

(সূত্র ঃ প্রদত্ত তথ্য, তারিখ ৭ মে, ২০০০)



মোঃ রফিকুল ইসলাম বাবলা, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অনিবার্য প্রতিশ্রুতি। সম্পূর্ণ জনযুদ্ধ।

২৫ মার্চ '৭১ সালের দিবাগত রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর অতর্কিত হামলা শুরু করলে প্রাণ হারায় অগনিত বাঙালি। সেদিন শত্রু সৈনিকদের এই গণহত্যা বাঙালি মুখবুজে মেনে নেয়নি। দখলদার বাহিনীর নির্বিচারে হত্যাযঞ্জের বিরুদ্ধে ইপিআর, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পাকিস্তানী সৈনিকদের বর্বরোচিত আচরনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজও রুখে দাঁড়ায়। বাঙালি যোদ্ধার জাতি না হয়েও পাকিস্তানী আগ্রাসনের সমুচিত জবাব দেয়। এর অগ্রণী ভূমিকায় ছিল এদেশের ছাত্রসমাজ।

এই ছাত্রসমাজের এক সাহসী তরুণ রফিকুল ইসলাম বাবলা, পিতা-আবুল হোসেন মোল্লা। সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা থানার প্রত্যন্ত গ্রাম ঘলঘলিয়াতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে সাতক্ষীরা কলেজের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পড়াশুনা বন্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদেন। মার্চ মাস থেকেই তিনি দেবহাটা থানার পার্শ্ববর্তী মাঠে ২০০ ছাত্র-যুবক ক্যাপ্টেন শাহজাহান আলী ও খলিলুর রহমান এর নেতৃত্বে ইপিআর এবং পুলিশ দ্বারা সংগঠিত সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করেন।

১৮ এপ্রিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যশোর সেনানিবাস থেকে কয়েকশত সামরিক যান মাধ্যমে প্রথমে সাতক্ষীরা এবং সেখান থেকে ২১ এপ্রিল দেবহাটা এবং কালিগঞ্জ অভিমুখে অগ্রাভিযান শুরু করে। বাবলা ক্যাপ্টেন শাহজাহানের নেতৃত্বে ২১ এপ্রিল পারুলিয়া ব্রিজের সম্মুখে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু এদিনের অসম যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি।

ক্যাপ্টেন শাহজাহান তার দলবল নিয়ে ভারতের টাকীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে খলিলুর রহমান এবং অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ পরিচালনা এবং টাকীতে ক্যাম্প গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

রফিকুল ইসলাম যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর টাকীতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। ১৩ মে তিনি উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য অন্যান্যের সাথে পলাশী চলে যান। তিনমাস কঠিন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট, মংলা

বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। অভিযান শেষে তিনি ভারতে ফিরে না যেয়ে খিজির আলী বীর বিক্রমের সাথে সুতারখালীতে একদল মুক্তিযোদ্ধা সহ অবস্থান করতে থাকেন। এই সময় মংলা বন্দরের পতিতাদের খিজির আলী সুতারখালী তার ক্যাম্পে এনে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

রফিকুল ইসলাম বাবলা আগষ্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মংলা বন্দর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনেকগুলি যুদ্ধে দু:সাহসীকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রবেশ করেন। অত:পর পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অধীন যমুনা ওয়েল কোম্পানীতে চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এই কোম্পানী তাকে চাকরীচ্যুত করে। বর্তমানে পরিবার পরিজনসহ মানববেতর ভাবে চট্টগ্রামে অবসর জীবন যাপন করছেন। স্ত্রী নূরজাহান বেগম বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে (এলইএ) হিসেবে চাকরি করেন।

(সূত্র ঃ প্রদত্ত বর্ণনা থেকে)



এম.এ. ছাত্তার, পিতা- মোঃ শামছুদ্দিন বিশ্বাস, গ্রাম-কনেশপুর, ডাক-এন.এস. টাউন, কোতয়ালী, যশোর। বর্তমান-ওয়েলফেয়ার কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট, ২৫৫ শিল্প এলাকা, তেজগাঁও, ঢাকা। ১৯৭১ সালে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী ছিলেন। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু হলে সারা দেশের ন্যায় যশোর শহরও আন্দোলন কারী জনতার পদভারে প্রকম্পিত হতে থাকে। এর পাশাপাশি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জলপাই রঙের গাড়ীগুলি যুদ্ধের সাজে শহরের চারিদিকে টহল অব্যাহত রাখে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শোনার পর যুবক সাত্তারের ভিতর ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিনি বন্ধুদের সাথে নিয়ে প্রতিদিন মিটিং-মিছিলে অংশ নিতে থাকেন। এইভাবে দিনে দিনে ২৫ মার্চ চলে আসে। এদিন সকাল থেকেই সেনাবাহিনীকে বেশি তৎপর হতে পরিলক্ষিত হয়। জনগণের চোখে মুখেও ভিন্ন চেহারা ধরা পড়ে। সবাই যেন অজানা কোন আশংখায় উৎকন্ঠিত। মিছিলে মিছিলে সারা শহর প্রকম্পিত হয়ে উঠে। কিন্তু এদিন সন্ধ্যার পরেই শহরের চেহারা বদল হতে লাগল। জনগণ উৎকন্ঠা নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। সেনাবাহিনীর গাড়ীগুলি সারা শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

২৬ মার্চ শহরে কার্ফু জারি করা হয়। জনগণ যার যার ঘরে বন্দি হয়ে পড়ে। ২৯ মার্চ, ইপিআর, পুলিশ, সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য সহ কয়েক হাজার জনতা যশোর সেনানিবাস ঘেরাও করে আক্রমন পরিচালনা করে। এখানে পাকবাহিনীর ভারী মেশিনগানের গোলাবর্ষন আর মর্টার শেলের আঘাতে কয়েকশত বাঙালি প্রাণ হারায়। পাকবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমনের মুখে বাঙালির প্রতিরোধ ভেঙে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যুবক ছাত্তার ২৫ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত বিদ্রোহী জনতার কাতারে থেকে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সমানে যুদ্ধ করেন।

৩০ মার্চ তিনি পিছু হটে যাওয়া বাঙালি সৈনিকদের সাথে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের টালিখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। এই ক্যাম্পে মাসাধিক কাল অবস্থান কালে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। এসময় যুবক ছাত্তার মূলত সহযোগী যোদ্ধার ভুমিকা পালন করেন।

মে মাসে তিনি নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী চলে যান। এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অক্টোবর মাসে গাজী রহমতউল্লাহর অধীনে ৪০ জন কমান্ডো দলভূক্ত হয়ে খুলনা জেলার দক্ষিণ এলাকা এবং মংলা ও চালনা বন্দর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ, খিজির আলী বীর বিক্রম এবং বদিউল আলম বীর উত্তমের নেতৃত্বে আশাশুনি থানায় শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান কালে শত্রুর রাইফেলের একটি গুলি তার দুই পায়ের উরু ভেদ করে চলে যায়। তিনি সাথে সাথে পড়ে যান। সহযোদ্ধারা তাকে ধরে পিছনে সরিয়ে নিয়ে যান। এখান থেকে চিকিৎসার জন্য তাকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পর সুস্থ হন। স্বাধীনতার পর তিনি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টে চাকরিতে যোগদান করেন। চিরকুমার আব্দুস সাত্তার অতি বন্ধুবৎসল এবং প্রানোচ্ছল পুরুষ।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০)



কমাণ্ডার মোঃ মতিউর রহমান (এল) পিএসসি বিএন (অব:), গ্রাম-বোয়ালিয়া, থানা-বাকেরগঞ্জ, জেলা-বরিশাল। বর্তমান ঠিকানা-বাড়ি ৫২৩, লেইন নং ১০, ডিওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬। জন্ম-২৩ মে ১৯৪৭। গ্রামের ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মেট্রিক এবং পরে পাকিস্তান নৌবাহিনী হতে এইচইটি ১৯৬২ সালে পাশ করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে মীরপুর ডিফেন্স সার্ভিসেস কমাণ্ড এবং ষ্টাফ কলেজ হতে পিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬৩ সালের ২০ জুন শিক্ষাণবীশ হিসেবে তদানীন্তন পাকিস্তান নৌ বাহিনীতে প্রবেশ করেন। ৪ বৎসর শিক্ষানবীশ সময়ে তিনি পিএনএস কারছাজ, বাবর ও শাহজাহান করাচীতে আরইএ ৪র্থ (পেটি অফিসার) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১২ মার্চ, ২০ দিনের বাৎসরিক ছুটি নিয়ে নিজ বাড়িতে আসেন। ১৮ এপ্রিল বরিশাল শহরে পাকিস্তানী বিমান হামলা হলে তিনি শহর ছেড়ে নিজ বাড়িতে চলে যান। এসময় তিনি পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হন কিন্তু কৌশলে মুক্ত হয়ে পরে জুন মাসে ৯নং সেক্টরের অধীন সাবসেক্টর কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের অধীনে স্থানীয় কমাণ্ডার হাবিলদার মোঃ আব্দুল মান্নান এর নেতৃত্বে তিনি দাওকাটির যুদ্ধ, বাকেরগঞ্জ থানা দখল এবং মানপাশার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতার পর তিনি যথারীতি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং আই এন এস ভেনধুরথী, ভালসুরা (ভারত), লণ্ডন এবং চীনে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ সালের ১৭ মে কমাণ্ডার হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে 'দৈনিক জনকন্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'লায়ালপুর জেল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে' শীর্ষক প্রবন্ধে রিয়ার এডমিরাল আবু .তাহের এন.ডি.ইউ, পিএসসি, বিএন এর লেখাটিকে দুঃসাহসীক এবং অজানা কাহিনী হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন এমন রোমাঞ্চকর তথ্য তিনি ত্রিশ বছর কিভাবে গোপন রাখলেন? এই দুঃসাহসিক অভিযানে আর কোন কোন অফিসার সম্পৃক্ত ছিলেন? তারা কেন এমন কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনার অংশীদার হিসেবে সম্পৃক্ততার কথা বলছেন না? জনাব মতিউর রহমান তাঁর স্মৃতিচারনে বলেন রিয়ার এডমিরাল আবু তাহের এর বর্ণনার সাথে ইংরেজী ছায়াছবি 'দি গ্রেট স্কেপ' এর হুবহু মিল আছে। দীর্ঘ টানেল কেটে পাকিস্তানের সুরক্ষিত

লায়ালপুর জেল থেকে পালানোর কৌশল বোধ হয় ঐ ইংরেজী ছায়াছবি 'দি গ্রেট স্কেপ' হতেই বের করেছিলেন।

কমাণ্ডার মতিউর রহমান প্রশ্ন তোলেন এই দুঃসাহসিক বীরত্বের কাহিনী বিগত ২৭ বৎসর কোন কাগজে প্রকাশ করা হয় নাই কেন? হঠাৎ স্বাধীনতার পক্ষের সরকারের আমলে এই ঘটনা ফলাও করে প্রকাশ করার গুরু রহস্য কি? কিসের এবং কার ভয়ে এতদিন গোপন রাখা হয়েছিল এই কাহিনী? ১৫ আগষ্টের নির্মম ঘটনার পর গঠিত সামরিক সরকারের ভয়ে জেল থেকে পালানো অকুতোভয় বীর যোদ্ধারাও কি ভয়ে মুখে তালা দিয়েছিলেন?

তিনি দুঃখের সাথে বলেন, '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর অনেক অফিসার মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু নৌবাহিনীর একজন অফিসারকেও সে সময় খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি জানান 'জাতির দূর্ভাগ্য মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে অনেক অফিসার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হতে নিরাপদ স্হান পশ্চিম পাকিস্তান বদলী নিয়ে চলে যান। আবার কোন কোন অফিসার পশ্চিম পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে এসে ছুটি কাটিয়ে করাচী ফিরে গেছেন। ঐ সময়ে পালালে বাঙালি অফিসারদের পাকিস্তানের সুরক্ষিত জেল খানা হতে জীবনের ঝুকি নিয়ে আর পালাতে হতনা'।

তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠনের প্রারম্ভে নৌবাহিনীতে কোন অফিসার না থাকায় সেনাবাহিনীর অফিসারকে নৌবাহিনীতে ডেপুটেশন দেয়া হয়। সেই সময়ে বেতন, ভাতা ও রসদ বিলে দস্তখত করার জন্য কোন বাঙালি নৌ অফিসার পাওয়া যায়নি। এখন অনেকে ভুলে গেছেন যে কিভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

তখন চীফ আরইএ গাজী মোঃ রহমতউল্লা বীর প্রতীক, চীফ রাইটার আতাউল হক ও চীফ রাইটার আব্দুস সালাম এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল আজকের বাংলাদেশ নৌবাহিনী। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে এবং অনেক প্রতিকুলতার মাঝে ঐ সময় হয়ত অনেক কাজে ভুল এুটি হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ঐ সকল নাবিকদের অবদান কোন ক্রমেই খাটো করে দেখা উচিত হবে না। পরবর্তী সময়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধা নাবিক এবং পদোন্নতি প্রাপ্ত অফিসারকে পান থেকে চুন খসার অপরাধে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে। বর্তমানে তারা অবর্ননীয় দুঃখ-কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। ইতিমধ্যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের (মুক্তিযোদ্ধা নাবিক এবং অফিসার) অসহায় পরিবারবর্গের খোঁজ কেউ রাখেননি। মুক্তিযুদ্ধে যে সকল নাবিক শাহাদাৎ বরণ করেছেন তাঁদের পরিবারবর্গ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। আত্মত্যাগী নৌকমাণ্ডোদের দেয়া অঙ্গীকার সরকার রাখেনি।

আজকে নৌবাহিনীর অনেকেই দম্ভোক্তি করে থাকেন। সবাই বাহবা সংগ্রহে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। কেহ একবারও পিছন ফিরে তাকান না। অনুভব করেননা কিভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সূচনা হয়েছিল? কাদের আত্মত্যাগে আজকে দশ সহস্রাধিক অফিসার ও নাবিকদের একটি সুবিশাল নৌ বাহিনী তৈরি হয়েছে।

তিনি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত ভাবে বর্ণনা করেন, 'জেল পালানোর কৃতিত্ব নেয়ার জন্য ব্যস্ত হলেই দায়িত্ব সম্পুর্ণ হবেনা, সাথে ঐ ৩২৬ জন মুক্তিযোদ্ধা নাবিক এবং মৃত্যুঞ্জয়ী ৫০০ নৌকমাণ্ডোদের সুখ-দুঃখের খোঁজ খবর নিতে হবে। সমাজে তাঁদের সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। এই দায়িত্বটুকু সম্পন্ন করতে সক্ষম হলে কারো একক নয় সমগ্র জাতির সম্মান গৌরবোজ্জ্বল হবে'।

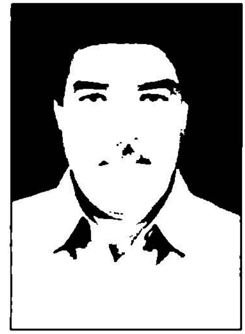
তিনি বলেন, 'আমরা নৌবাহিনীতে ছিলাম। শত চেষ্টা করেও সকল সদিচ্ছার বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু আজকের মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিগত ২৭ বছরে যা করা সম্ভব হয়নি আজকে তা করা সম্ভব। না হলে ত্রিশ বছরে যে কথা বলা হয়নি আজ তা প্রকাশ করা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে'?

কমাণ্ডার মতিউর রহমান '৭১ সালে যাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছেন তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতে দেখে তীব্র বেদনা অনুভব করেন। তাদের স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে মর্মাহত হয়েছেন কিন্তু নৌবাহিনীর কঠোর শৃঙ্খলার মাঝে থেকে সবকিছু মুখবুজে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

১৯৭১ সালে তিনি মূলত স্থল বাহিনীর সাথে মিশে বরিশাল এলাকায় যুদ্ধ করেছেন। '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের মাঝে তাঁর এলাকায় উল্লেখযোগ্যদের নাম বলেন (১) মোঃ আব্দুর রহমান বিশ্বাস (২) ফজলে রাব্বী চৌধুরী (শাহজাহান চৌধুরী) (৩) মজিবর রহমান মোল্লা (৪) আব্দুর রব উকিল (৫) দলিল উদ্দিন হাওলাদার (চেয়ারম্যান) ও (৬) সাইদ মোল্লা।

স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত রমনীদের নাম উল্লেখ করা উচিত হবেনা কারণ হিসেবে বলেন, 'তাদের অনেকেই বহু নির্যাতন সয্য করে কোনভাবে বেঁচে থাকার অবলম্বন করে নিয়েছেন। পুরনো কথা উঠলে আবার হয়তো তাদের পথে পথে ভাসতে হবে'।

(তথ্যঃ কমাণ্ডার (অবঃ) মতিউর রহমান, তারিখঃ ১২ ডিসেম্বর ৯৯)



মোঃ আলী আশরাফ শিকদার, পিতা-মোঃ ওয়াজেদ আলী সিকদার, গ্রাম-সোমাদ্দারখালী, থানা-মোরলগঞ্জ, জেলা-বাগেরহাট। শৈশবে নিজ গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে সোনাখালী বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৬৭ সালে খুলনা আজম খান কমার্স কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। ১৯৭১ সালে বি.এ. শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এই সময় দেশব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র জাতির চোখে মুখে স্বাধীনতার স্বপ্ন। ৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর ভাষন শোনার পর তিনি ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। সাথী বন্ধুদের নিয়ে নিয়মিত আন্দোলন ও মিছিলে অংশ নিতে থাকেন। একই সাথে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে এলাকাতে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন।

২৫ মার্চ, দেশব্যাপী পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা ও লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষন শুরু করলে ছাত্র আলী আশরাফ বাগেরহাট শহর ত্যাগ করে নিজ গ্রামে চলে যান। কিন্তু শত্রুবাহিনী এক সময় শহর থেকে গ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে তিনি ৩০ এপ্রিল সাথী কয়েকজন বন্ধুসহ পায়ে হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের তকীপুর ক্যাম্পে পৌঁছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নাম লেখান।

১২ মে তিনি ভারতীয় নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কর্ণেল ওসমানী এবং সাবমেরীনার দল কর্তৃক নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হন। তকীপুর ক্যাম্পে প্রায় ৪০০০ যুবকের মধ্য থেকে মাত্র ৮৫ জন যুবককে মনোনীত করা হয়। আলী আশরাফ পরদিন ১৩ মে সামরিক ট্রাক যোগে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে এসে পৌঁছেন। এখানে তিনমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট, অপারেশন জ্যাকপটের অধীন ২০ জন কমান্ডোর উপদলনেতা হিসেবে চাঁদপুর নদীবন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

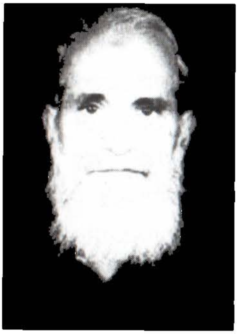
তিনি খুলনার অধিবাসী হলেও চাঁদপুর বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণের কারণ ছিল চাঁদপুর অঞ্চলের কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ কাল ছিল দেড় মাস। অথচ তিনি ৩ মাস পুর্ণ প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে সফলভাবে প্রস্তুত করতে সময় পেয়েছিলেন। শুধুমাত্র এই কারণে তাকে এবং আব্দুল গফুরকে চাঁদপুর অভিযানে উপদলনেতা করে পাঠানো হয়। লেঃ কমান্ডার জি.এম.মার্টিস তাঁদের সাথে আলোচনা করে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই অপারেশনের দলনেতা ছিলেন সাবমেরীনার বদিউল আলম বীর উত্তম। চাঁদপুর বন্দরে সফল অভিযান শেষে তিনি ভারত ফিরে যান।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে সাবমেরীনার বদিউল আলমের নেতৃত্বে তিনি দ্বিতীয়বার মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় মংলা, চালনা, আশাশুনি, পাইকগাছা, দাকোপ থানা দখলসহ ১২টি বৃহৎ অভিযানে অংশ নেন। এর মাঝে জাহাজ ধ্বংস করার জন্য আটবার সাঁতরিয়ে জাহাজের নিকট পৌঁছেন। কিন্তু তিনি বীরত্ব সূচক খেতাব পাননি। স্মৃতিচারন করতে যেয়ে তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন শারিরীক ভাবে অসুস্থতার জন্য পানিতে সাঁতরাতে অসমর্থ ছিলেন এমন নৌ কমান্ডোকে বীরত্বসূচক পদক প্রদান করা হ.য়েছে, অথচ তিনি বারবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অপারেশনে অংশ নিলেও ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

তাঁর অভিমত হলো বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় একবার মাত্র এই খেতাব প্রদান করেছিলেন, কিন্তু এই খেতাব প্রদানতো বন্ধ ঘোষনা করেননি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একাধিকবার এমন বীরত্বসূচক খেতাব দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং আমাদের দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও একাধিকবার বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করতে বাধা থাকতে পারেনা।

কমান্ডো আলী আশরাফ স্বাধীনতার পর ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে পুলিশ বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে নিজ বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করছেন। মুক্তিযুদ্ধে তার স্মরনীয় ঘটনা হলো ২৫-১০-৭১ তারিখ আশাশুনি থানা যুদ্ধে ভোর ৫টায় অধিনায়ক সকল মুক্তিযোদ্ধা আহত কমান্ডো আঃ ছাত্তারসহ ৪/৫ জনকে নিয়ে প্রত্যাহার করেন কিন্তু পরবর্তী একঘন্টা আলি আশরাফ ও আঃ গফুর যুদ্ধ চালিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরতে থাকেন, পথিমধ্যে বদিউল আলম বীর উত্তম এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইয়াকুব আলীর সাথে তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা আলী আশরাফ এবং আব্দুল গফুর এর লাশ আনতে যাচ্ছিলেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ৬ সেপ্টেম্বর ৯৯)



লে: কমাণ্ডার এম. সোলেমান মিয়া (অব:)
পিতা-মোঃ ফজলুর রহমান গাজী। গ্রাম- কাঁশার, ডাক-পাইকপাড়া, থানা-চাঁদপুর, জেলা- চাঁদপুর। জন্ম- ১৭ জুলাই ১৯৩৬।

১৯৫২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি চট্রগ্রাম টাইগার পাসে বয়েজ নেভীতে ভর্তি হন। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পিএনএস বাহাদুর করাচীতে গমন করেন। ২ বৎসর প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ৬ মাস যাবত পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সিগন্যাল হিসেবে মনোনীত হন।

১৯৫৪ সাল থেকে তিনি পি.এন.এস সিন্দা, ইকবাল, জাহাঙ্গীর, বখতিয়ার, হিমালয়, জুলফিকার, বাহাদুর এবং ১৯৭০ সালে পিএনএস হিমালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় ৬০ দিনের বাৎসরিক ছুটি নিয়ে ১২ জানুয়ারি জ্ঞ৭১ গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। ছুটি শেষ হলেও দেশের বিরাজমান অবস্থা পর্যবেক্ষন করে তিনি আর কর্মস্থলে ফিরে যাননি।

১৯৭১ সালের মে মাসে জনাব সোলায়মান মিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ৪২ জন বাঙালি ইপিআর, পুলিশ ও ছাত্রসহ শাহতলী রেলওয়ে ষ্টেশন হতে ১৪ দিন ১৫ রাত পায়ে হেঁটে ভারতের আগরতলা দূর্গা চৌধুরীপাড়া মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌছেন। এখানে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অতঃপর তিনি এই ক্যাম্পের প্রশাসনিক অফিসে নিয়োগ লাভ করেন। সেখানে কয়েকমাস কাজ করার পর শালবন হেড কোয়ার্টারে অস্থায়ী প্রশাসনিক অফিসে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনিসহ আরও ৪ জন নৌবাহিনীর সদস্যকে ট্রেন যোগে কলকাতা আনা হয়। সেখান থেকে তাঁদের কল্যানী সদর দপ্তরে পাঠানো হয়।

কলকাতায় পৌছানোর পর ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে ২ দিন যাবত নানাবিধ চেক করা হয়। কল্যানী হেড কোয়ার্টারের দায়িত্বে ছিলেন মেজর মঞ্জুর এবং সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড ছিলেন ক্যাপ্টেন সামছুদ্দিন আহমদ। কল্যানীতে তখন ৩৫ জন নাবিককে সমবেত করা হয়েছিল। ৩৫ জন সদস্যের ইনচার্জ ছিলেন চীফ পেটি অফিসার এম.এ. বাসেত (ইআরএ-১)।

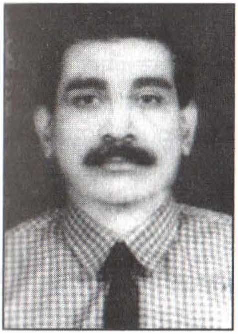
এই ৩৫ জন নাবিক গানবোট ‘বিএনএস পারুল’ এর ক্রু হিসেবে

মনোনীত ছিলেন। ১০ ডিসেম্বর 'পদ্মা' এবং 'পলাশ' বিমান আক্রমনের শিকার হলে 'পারুল' কে আর ম্যাণ্ডেড করা হয়নি।

এম সোলায়মান স্বাধীনতার পর ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, বাসযোগে যশোর পৌঁছেন। ২৭ জানুয়ারি তিনি ঢাকা নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে যোগ দেন। লেঃ কমাণ্ডার নূরুল হক পাকিস্তান থেকে ফেরত এলে পদোন্নতি দিয়ে তাঁকে নৌবাহিনীর প্রধান করা হয়। তিনি নাবিকদের মধ্য থেকে অফিসার বানানোর জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন মাত্র ৭ জন আপার ইয়ার্ডম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। কি নির্মম পরিহাস। মুক্তিযোদ্ধারা উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত তার নিয়ন্ত্রক বনে গেলেন পাকিস্তান প্রত্যাগত একজন অফিসার।

তিনি ৯ মাস ভারতের মাদ্রাজে এবং আই এন এস ভেনদোরতীতে দেড় বছরের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে সাব লেঃ পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৮০ সালে লেঃ কমাণ্ডার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৮৬ সনের ১৭ জুন একই পদে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। লে: কমাণ্ডার সোলায়মান মিয়ার পুত্র লোকমানউর রহমান লেঃ কমাণ্ডার পদে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত আছেন এবং শান্তি মিশনের সাথে বিদেশে অবস্থান করছেন।

(তথ্যঃ লেঃ কমাণ্ডার (অবঃ) এম সোলায়মান মিয়া, তারিখঃ ২৬/১২/৯৯)



মোঃ বজলুর রহমান, পিতা- মৃত মোঃ কাশেম আলী, গ্রাম-গোদাঘাটা, পোষ্ট জগন্নাথপুর, থানা+জেলা-সাতক্ষীরা। বর্তমান-হিন্দোল-'গ', ৫০৮ তালতলা সরকারী কলোনী, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। জন্ম-২৭ জানুয়ারি ১৯৪৯। ১৯৭১ সালে সাতক্ষীরা কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং ১৯৭২ সালে একই কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন।

কলেজ জীবনে তিনি ছাত্র ও গণআন্দোলনের সাথে সরাসরি জড়িত হয়ে পড়েন। ২৫ মার্চ ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে একই দিন সেই সংবাদ সাতক্ষীরা শহরে পৌঁছে যায়। সাথে সাথে ছাত্র জনতা পুলিশের অস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করে। ছাত্র বজলুর রহমান সাথী-বন্ধুদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। ১৮ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশের পূর্বে তিনিসহ সকল পুলিশ, ইপিআর, জনতা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বজলুর রহমান ভারতের টাকী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। পরে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে চলে যান। প্রশিক্ষণ শেষে অক্টোবর মাসে তিনি সাবমেরীনার গাজী মোঃ রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে মংলা বন্দর সহ খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এখানে বিভিন্ন যুদ্ধে বন্দি এবং আত্মসমর্পনকৃত ৬০ জন রাজাকারকে গাজী মোঃ রহমতউল্লাহর নির্দেশে হাতীরডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাশ্ববর্তী পুকুরে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন। গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ সাবমেরীনার এর নেতৃত্বে এই সকল যুদ্ধে অংশ নেন খিজির আলি বীর বিক্রম, বদিউল আলম বীর উত্তম, কামরুজ্জামান টুকু, শেখ আঃ কাইউম, আলি আশরাফ, আঃ গফুর, ডা: মাহফুজুল হক, আলফাজউদ্দিন, শেখ আঃ সেলিম, জি.এম.এ. রহিম।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগের চাকরি গ্রহণ করেন। বর্তমানে একই সংস্থায় উপসহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯)



লেঃ কমাণ্ডার (অব:) সালেহ আহমেদ ভূঁইয়া, ১৯৬৬ সালের জুন মাসে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তিনি দুই মাসের বাৎসরিক ছুটিতে গ্রামের বাড়ি আসেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত নিরস্ত্র বাঙালি নিধন শুরু করলে তিনি এলাকার প্রাক্তন সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তায় আশুগঞ্জের উত্তর পার্শ্বে আজবপুরে মেঘনার পূর্বতীরে লেঃ জেনারেল নাসিম এবং ব্রিগেডিয়ার সুবেদ আলী ভুঁইয়ার নেতৃত্বে প্রথম ডিফেন্স তৈরি করেন। উদ্দেশ্য ছিল পাকবাহিনী নদীপথে আশুগঞ্জ আসার চেষ্টা করলে তাদের প্রতিহত করা। ১৫ এপ্রিল পাকবাহিনীর হেলিকপ্টার ও বিমান থেকে তাদের অবস্থানের উপর বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষন করতে থাকে। এখানে বাঙালি অনেক সৈনিক নিহত হন। ফলে তাঁরা ডিফেন্স উইথড্র করে মেজর খালেদ মোশাররফ এর নির্দেশে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে একত্রিত হন।

জুন মাসে তিনি নৌকমাণ্ডো ক্যাম্প পলাশীতে যোগদান করেন। অক্টোবর মাসে তাঁর নেতৃত্বে নয়জন নৌ কমাণ্ডোকে ভৈরব এলাকায় পাঠানো হয়। দলের উপনেতা ছিলেন নাবিক কফিলউদ্দিন আহমদ। ভৈরব ব্রিজটি পাকা ইটের হওয়াতে তাঁরা এটি ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তাদের দলের গাইড ছিলেন চারতলা গ্রামের শাহ আলম এবং জহির মাষ্টার। কমাণ্ডোরা অবস্থান করতেন লাওয়াইসার গ্রামের জনাব কাদের মোল্লা এবং জহির মাষ্টারের বাড়ীতে। তারাই কমাণ্ডোদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

অপারেশনে যাওয়ার পথে তাদের দলটিকে গাইড করেছিলেন এলাকার অপর তরুণ আল মামুন। তিনি বর্তমানে ব্রাক্ষনবাড়িয়ার বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা। যুদ্ধের সময় তাঁর দলটিকে বহন করার জন্য স্থায়ী মাঝি ছিল চারতলা গ্রামের মনসুর। বর্তমানে সে পাগল হিসেবে বেঁচে আছে।

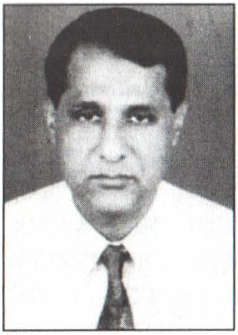
১৮ অক্টোবর পাকবাহিনীর একটি মালবাহী জাহাজ লালপুর বাজারের সন্নিকটে মেঘনা নদীতে এসে নোঙ্গর করে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে তিনি দু'জন কমাণ্ডোকে সাথে নিয়ে তিন মাইল দূর থেকে যাত্রা শুরু করেন। জাহাজের আধামাইল দূর থেকে নদীতে নেমে স্রোতের অনুকূলে সাঁতরিয়ে তিনি কমাণ্ডো দু'জন সহ জাহাজের নিকট পৌছে মাইন স্থাপন করেন। নদীতে ছিল প্রচণ্ড স্রোত। তাই জাহাজের নিকট স্থির হয়ে থাকা ছিল দুঃসাধ্য। কঠিন পরিশ্রমের পর তিনটি মাইন লাগিয়ে ভালভাবে চেক করে তিনি কমাণ্ডো শাহ আলম এবং

নৌবাহিনীর কফিলউদ্দিন স্রোতের অনুকুলে সাঁতরিয়ে দূরে চলে যান। পরদিন ধ্বংস প্রাপ্ত জাহাজ থেকে এলাকার লোকজন দ্বারা অনেক মালামাল উদ্ধার করে লালপুর গোডাউনে রাখেন। পরবতীর্তে এখান থেকে বড় ৮ নৌকা বোঝাই করে সমস্ত মালামাল আগরতলা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা অফিসে জমা করেন।

এছাড়া তিনি এখানে থেকে গ্যাস লাইন এবং ছোট কালভাট এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেন। ডঃ আলাউদ্দিন আহমদ, শাহ আলম, এনামুল হক, কফিলউদ্দিন সহ তাঁরা ছিলেন ৯ জন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অপরাধে শত্রুবাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের প্ররোচনায় ২৯ মে তাঁর বড়ভাই সহ পরিবারের ৯ জনকে একসাথে গুলি করে হত্যা করে। কারণ তার পরিবারের ৬ জন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৯ ডিসেম্বর আশুগঞ্জ মুক্ত হওয়ার পর, ১০ ডিসেম্বর তিনি সাথীদেরকে শত্রুর অস্ত্র জমা নিতে নির্দেশ দিয়ে নিজ বাড়িতে যান। আশুগঞ্জ থেকে তার বাড়ি মাত্র ৯ কিলোমিটার দূরে। তিনি বাড়িতে যেয়ে দেখেন তার বাড়ীর কোন চিহ্ন নেই। শত্রুরা সমগ্র পরিবারটির বাড়িঘর জ্বালিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। এই সময় তিনি ক্রোধে পাগল হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁর বাবা এবং চাচার অনুরোধে কারো প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

স্বাধীনতার পর পুণরায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ২০০০ সালের জানুয়ারীতে লে: কমান্ডার হিসেবে নৌবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

(সাক্ষাতকারঃ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



ডাঃ শেখ মাহফুজুল হক, পিতা -মৃত আলহাজ শেখ নূরু আলী মাষ্টার, গ্রাম- নকিপুর, থানা -শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা। বর্তমানে আর.এম.ও. খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত আছেন। জন্ম ৯-২-১৯৫৩। নিজ গ্রামে - প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬৯ সালে ১ম বিভাগে এসএসসি এবং ১৯৭২ সালে সাতক্ষীরা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকায় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন।

১৯৭১ সালে মার্চ মাসে ছাত্রবস্থায় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর ঢাকার অবস্থা অশান্ত হয়ে উঠলে তিনি তখন সাতক্ষীরার ছাত্রদের নিয়ে মিটিং করেন । ৮ মার্চ মিছিল করার সময় মুসলিম লীগের আতিয়ার রহমান নিজ বাস ভবন থেকে মিছিলের উপর গুলি ছুঁড়ে। ডাঃ মাহফুজুল হকের পাশের লোক পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে সাতক্ষীরা হাসপাতালে মারা যান এবং তার হাতের ঘড়িতে ছাররা লেগে ঘড়ির কাচ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যায়। তারপর আতিয়ার রহমানের বাড়িতে প্রেট্রোল দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী খুলনা জেলার কালিগঞ্জ থানায় আগমন করলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ২৮ মার্চ এডঃ আ. ব. ম. নূরুল আলমের সাথে কোলকাতায় যান এবং প্রিন্সেপ স্ট্রীটে আঃ স. ম. আব্দুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুছ মাখন, কামরুজ্জামান টুকু, শাহজাহান সিরাজ সহ মোট ১৩ জন অবস্থান করেন। তখন মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প খোলার তোড়জোড় চলছে।

৬ এপ্রিল আবার নিজ গ্রামে ফিরে এসে সমবয়সী যুবক ও বন্ধু সরদার মজিবর রহমান, নূরুল ইসলাম, আব্দুর রহিম, হাইবার, আব্দুল কাদেরসহ ১২জনকে সঙ্গে নিয়ে রশিরহাট হোটেলে যেয়ে শ্যামনগর এলাকার এম.পি ফজলুল হকের সাথে দেখা করে তকীপুর ক্যাম্পে এসে যোগদান করেন। সেখানে আব্দুর রহমান সাহেব ও দেবহাটার শাহজাহান মাষ্টার ক্যাম্পের যাবতীয় ব্যবস্থা করেন।

১৬ মে তকিপুর ক্যাম্প থেকে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌকমাণ্ডো ক্যাম্পে ওয়াটার সুইমিং প্রশিক্ষণ লাভ করে ১৫ আগষ্ট ত্রিকোণী মংলা বন্দরের দক্ষিণে হিরণ পয়েন্ট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এরপর ১৯ সেপ্টেম্বর শ্যামনগর থানার হরিনগর গ্রামে নবাবদির বাড়ীর সামনে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর গান বোটের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। অক্টোবর মাসে তিনি লেঃ গাজী মোঃ রহমত উল্লাহর অধীনে ৪০ জন নৌ-কমান্ডোর একটি দলের সাথে খুলনা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এখানে মংলা ও চালনা

বন্দরে দুঃসাহসিক জাহাজ ডোবানোর অপারেশনে অংশগ্রহণ সহ আশাশুনি, দাকোপ, পাইকগাছা থানায় শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। নভেম্বর মাসের শেষদিকে নৌ-কমান্ডোর একটি দল ভারত প্রত্যাবর্তন করলে তিনি ঐদলের সাথে ভারতে ফিরে যান এবং স্বাধীনতা অর্জনের পর খুলনা বিভাগের সমস্ত নৌ-কমাণ্ডো সাথে বি.এন.এস তিতুমীর খুলনাতে ২ মাস অবস্থান করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ডাক্তারী পেশায় নিয়োজিত হন।

১৯৭৯ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথমে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে মেডিকেল অফিসার ডুমুরিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলনায় চাকুরীতে যোগদেন। তিনি দুই সন্তানের জনক। স্ত্রী মিসেস আইরুন নাহার গৃহিনী।

অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ শেখ মাহফুজুল হকের স্মরণীয় ঘটনা হলো নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে মংলা পোটে শেষ অপারেশনের সময় জাহাজে মাইন লাগানোর পর গানবোট তাকে ও দুই সাথীকে ঘিরে ফেলে জাহাজ থেকে এস.ও.এস.কল ও বেরিলাইট মারতে থাকে। গানবোটের সার্চলাইটে রাত্র একটায় নদী দিনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এর মধ্য থেকে ডুবদিয়ে নদীর কিনারে এসে জীবন বাঁচাতে পেরেছেন এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা এবং চাপড়ায় ব্রীজ মাইন দিয়ে উড়ানোর পর রাজাকার কর্তৃক অজস্র গুলির মধ্য থেকে মাত্র ৪ জন নৌ-কমাণ্ডো বেঁচে আসা ছিল এক দুঃসাহসিক অভিযান। আশাশুনি থানা ক্যাপচার করার সময় ছাদের উপর থেকে মেজ দারোগা গুলি ছুঁড়লে খিজির আলি'র কানে গুলি লাগে এবং তাঁকে বামহাত দিয়ে খিজির আলী না ফেলে দিলে তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যেত। এই স্মৃতি বহন করে এখন ডাঃ শেখ মাহফুজুল হক স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করছেন।

বর্তমানে তিনি মুক্তিযোদ্ধা নৌ-কমাণ্ডো এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এবং খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কনভেনার এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমাণ্ড কাউন্সিলের খুলনা জেলা ইউনিটের ক্রীড়া বিভাগের ডেপুটি কমাণ্ডার। তিনি খুলনাস্থ সাতক্ষীরা সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

(সূত্র লিখিত বর্ণনা, তারিখ ১৮ ডিসেম্বর ২০০০)



লেঃ কমাণ্ডার এম. এ. মোতালেব, পিতা-মৃত মোঃ আব্দুর রশিদ, গ্রাম-উত্তর লক্ষ্মীপুর, ডাক- কৃষ্ণনগর, থানা- নবীনগর, জেলা- ব্রাহ্মনবাড়ীয়া। ১৯৪৮ সালের ৭ জুন নিজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে উত্তর লক্ষ্মীপুর প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ১৯৬৩ সালে তালশহর হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৬৫ সালে বি-বাড়ীয়া কলেজ থেকে এইচ.এস.সি.পাস করার পর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৬৫ সালের ২২ জুন তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে একজন নাবিক হিসেবে প্রবেশ করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত ২ বছর পি.এন.এস. বাহাদুর করাচীতে বেসিক ও প্রফেশনাল ট্রেনিং সমাপ্ত করেন।

এই সময় ছয় দফার আন্দোলন চরম আকার ধারন করে। বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভূতপূর্ব আন্দোলন গড়ে তোলে। বাঙালির আন্দোলনের পরোক্ষ চাপ সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের উপর প্রতিফলিত হয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে বাঙালি কর্মকর্তাকে দেয়া হতোনা। অবাঙালি কর্মকর্তা ও নাবিকদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরন দিনে দিনে প্রকট হতে থাকে। এর মধ্য দিয়ে নাবিক মোতালেব তাঁর কর্মজীবন অব্যাহত রাখেন। তিনি বুঝতে পারতেন বাঙালিদের সৈনিক জীবন থেকে দূরে রাখা এবং নিরুৎসাহিত করার জন্যই তাঁদের উপর এরূপ রূঢ় আচরন। তিনি সৈনিক জীবন থেকেই পশ্চিমাদের অনুরূপ আচরণের জবাব দেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ বাহাদুর, তুগরিল, শাহজাহান এবং মোজাহিদ-এ কর্মরত ছিলেন। '৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাৎসরিক ৬০ দিনের ছুটি ভোগ করার জন্য তিনি নিজ বাড়িতে চলে আসেন। ছুটি শেষ হলেও তিনি আর পাকিস্তান নৌবাহিনীর চাকরিতে ফেরৎ না যেয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে থেকে গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে থাকেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি নিধন শুরু করলে তিনি স্থানীয় ছাত্র যুবক এবং প্রাক্তন সৈনিকদের নিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু করেন। জুন মাসে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের আগরতলা দূর্গা চৌধুরীপাড়া মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। এমাসেই আরও কয়েকজন স্বপক্ষ ত্যাগী নাবিক সহ আগরতলা ক্যাম্প ত্যাগ করে ২৪ পরগণা জেলার হাসনাবাদ নৌবাহিনীর ডেটাচ্‌মেন্ট ক্যাম্পে যোগদান করেন। এই ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বি.এম. আলম।

অক্টোবর মাসে তিনি সহ ৪৪ জন বাঙালি নাবিক ভারতের নৌবাহিনীর সহায়তায় খিদিরপুর ডকে মেরামতাধীন বাংলাদেশের প্রথম রণতরী বা নৌ জান 'পলাশ' এ যোগদান করেন।

১০ নভেম্বর ১৯৭১ গানবোট 'পদ্মা' ও 'পলাশ' অপারেশনের নিমিত্তে প্রথম হলদিয়া বন্দর ত্যাগ করে ১১ নভেম্বর মংলা বন্দরের প্রবেশ পথে ১নং বয়া থেকে ৮নং বয়া পর্যন্ত ৫০০ পাউন্ড ওজনের ৮টি ব্রিটিশ মার্ক-১১ গ্রাউন্ড মাইন স্থাপন করেন। ১৩ই নভেম্বর মংলা বন্দরের প্রবেশ মুখে স্থাপিত মাইনের আঘাতে ৩টি বিদেশী বাণিজ্যিক জাহাজ এবং ১টি পাকিস্তানী নৌবাহিনীর গানবোট বিধ্বস্ত হয়।

পদ্মা ও পলাশ জাহাজের দ্বিতীয় অভিযান শুরু হয় ৭ ডিসেম্বর '৭১। জনাব মোতালেব এই অপারেশনে একজন সৈনিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল পিএনএস তিতুমীর দখল করা। অভিযানে ভারতের নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ 'আইএনএস পানভেল' এবং 'চিত্রাংগদা'ও অংশ নেয়। তাঁরা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান রুট ধরে ৯ ডিসেম্বর হিরন পয়েন্ট পৌঁছেন। ১০ ডিসেম্বর সকাল ৭টায় মংলা বন্দর এবং দুপুর বারটায় কোন বাধা ছাড়া খুলনা শিপ ইয়ার্ডের নিকট পৌঁছেন।

ভূলবশত: ভারতের তিনটি জঙ্গী বিমান অকস্মাৎ গানবোটগুলির উপর বোমাবর্ষণ শুরু করলে পদ্মা এবং পলাশে আগুন ধরে যায়। ফলে অনেকে শহীদ হন। অনেকে আহত অবস্থায় আত্মরক্ষা করেন। বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন এখানে রাজাকারদের হাতে শহীন হন। জনাব মোতালেব আহত অবস্থায় আত্মরক্ষায় সমর্থ হন।

স্বাধীনতা উত্তর তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৭৪ সালে কমিশন প্রাপ্ত হন। ১৯৮৪ সালে লেঃ কমান্ডার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজে অধিনায়ক/ নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ছয় বৎসর নেভাল প্রভোষ্ট মার্শাল চট্টগ্রামের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন। তিনি দুই মেয়ে এবং এক পুত্রের জনক।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



সৈয়দ আবুল বাশার, জন্ম- ৯ অক্টোবর ১৯৪৯। পিতা-মৃত সৈয়দ মোহাম্মদ আলী। গ্রাম-গালুয়া, থানা-রাজাপুর, জেলা-ঝালকাঠি। বর্তমান ঠিকানা- হরকুসুম কুঞ্জ, উত্তর আলেকান্দা, বটতলা, বরিশাল। তিনি বরিশাল জেলা আওয়ামীলীগ এর কার্যকরী পরিষদ এর সদস্য।

১৯৭১ সালে ছাত্রাবস্থায় বরিশাল শহরে ছাত্র ও গণআন্দোলনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এবং নেতৃত্ব দান করেন। ২৫ মার্চ এর পর তৎকালীন বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মালেক খান, মহিউদ্দিন আহমদ এমপি, মেজর এমএ জলিল এর নেতৃত্বে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক পুলিশ সুপারের সহযোগিতায় পুলিশ লাইন থেকে সকল অস্ত্র সংগ্রহ করে স্থানীয় পুলিশ, ইপিআর, সেনাবাহিনীর সদস্য, জনগণের সহযোগিতায় তৎকালীন সদর গার্লস স্কুলে মিনি সচিবালয় স্থাপন করেন। এখান থেকে চাঁদপুর, পটুয়াখালী, বরিশাল, খুলনা এলাকার প্রতিরোধ কার্যক্রমের প্রচেষ্টা চালাতেন। সংগৃহীত অস্ত্র নিয়ে প্রথম ওবায়েদুর রহমান মোস্তফা, সুলতান আলম মজনু, মর্তুজা মানিক, শেখ কুতুবউদ্দিন আহমদ, শহীদ শুকুর, সৈয়দ আবুল বাশার, নেছারউদ্দিন খোকা, গোলাম নবী, এ.এম.জি কবির ভুলু, আব্দুস ছাত্তার কালু, রেজায়ে ছত্তার ফারুক সহ সতেরো জনের মাঝে অস্ত্র বিতরনের পর শপথ বাক্য পাঠ এবং শহরের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৮ এপ্রিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর জঙ্গী বিমান থেকে বোমা বর্ষন করে এবং ২৫ এপ্রিল শত্রু বাহিনী বরিশাল শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এ সময় সৈয়দ আবুল বাশার সহ ৩০ জন নেতা কর্মী একসাথে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর এক সপ্তাহ পূর্বে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য মেজর জলিল ভারত পৌঁছেছিলেন। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অস্ত্র প্রদানের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাড়া এবং প্রতিশ্রুতি আদায়ে ব্যর্থ হন। ভারতের হাসনাবাদে বি.এস.এফ. কর্তৃক সমবেত বাঙালি যুবকদের সাতদিনের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করে। আবুল বাশার এই স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মেজর জলিল সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়ায় ইপিআর, পুলিশদের নিকট থেকে সংগৃহীত অস্ত্র থেকে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী কর্তৃক ৬০০ শত ৩০৩ রাইফেল, ২০টি এল.এম.জি, ১টি তিন ইঞ্চি মর্টার, বিস্ফোরক, গোলাবারুদ, দু'টি লঞ্চ, চারটি স্পীড বোট হস্তান্তর করেন।

৮ মে মেজর জলিল অস্ত্রশস্ত্র, দু'টি লঞ্চ, ৪টি স্পীডবোট সহ ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ বরিশালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মুক্তিযোদ্ধার মাঝে ছিলেন ওবায়দুর রহমান, মোস্তফা, কাক্কা, কামরুল তসলিম, মর্তুজা মালিক, সৈয়দ আবুল বাশার, আমিনুল ইসলাম সুরুজ, এম.পি. ফিরোজ সিদ্দিক কমাণ্ডার

ভোলা, মহিউদ্দিন আহমদ এম.পি, এডভোকেট জালাল সরদার, মেজর মইনূল, ক্যাপ্টেন নাসির (ভোলা), কামালউদ্দিন ফিরু, ডাঃ আসাব উদ্দিন। লঞ্চ দুটি সাতক্ষীরা জেলার গাবুরা গ্রামের সন্নিকটে পৌঁছলে পূর্ব থেকে ওৎপেতে থাকা গানবোট দ্বারা আক্রান্ত এবং উভয় পক্ষের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দু'টি লঞ্চ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পাকিস্তান নৌবাহিনীর একটি গানবোট মুক্তিবাহিনীরি শেলের আঘাতে ধ্বংস হয়। উভয় পক্ষ বিপুল ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হয়। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা স্থানীয় শান্তি কমিটির হাতে বন্দি হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করে। মেজর জলিল, সৈয়দ আবুল বাশার সহ কিছু মুক্তিযোদ্ধা প্রাণে রক্ষা পান এবং স্থানীয় জনগণের সাহায্যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে সমর্থ হন।

তিনি মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তায় নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হন। প্রথম ব্যাচে ১৭০ জন কমাণ্ডোর মাঝে বরিশাল জেলার একমাত্র সদস্য ছিলেন সৈয়দ আবুল বাশার। ১২ সেপ্টেম্বর তাঁর নেতৃত্বে ৪৫ জন কমাণ্ডোকে বাগেরহাট, মাদারীপুর ও বরিশাল অভিযানে পাঠানো হয়। এরমাঝে ১২ জন কমাণ্ডো সৈয়দ আবুল বাশার এর নেতৃত্বে বরিশাল অভিযানের জন্য প্রেরিত হন। বানরীপাড়ায় অবস্থিত ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের ক্যাম্পে দলটিকে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য সেনাবাহিনীর সুবেদার আবুল হোসেনকে নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সুবেদার আবুল হোসেনের দলে ২৭ জন স্থল বাহিনীর গেরিলা অর্ন্তভূক্ত ছিল। এছাড়া পথ চিনিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর জন্য দু'জন গাইড প্রদান করা হয়। যাত্রাপথে দলটি ডাকাত দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তারা ১১ জন ডাকাত আটক এবং হত্যা করেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝে ১৬ সেপ্টেম্বর বগিতে অবস্থানরত মেজর জিয়াউদ্দিনের ক্যাম্পে কমাণ্ডো দল উপস্থিত হয়। দু'দিন বিশ্রামের পর মেজর জিয়াউদ্দিন কর্তৃক প্রদত্ত ৫টি নৌকা পারের হাটের সন্নিকটে কচা নদীতে পৌঁছলে শত্রু বাহিনীর গুলির শব্দ শুনতে পান। শত্রুবাহিনী গোয়েন্দা মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীর আগমনের সংবাদ জানতে পারে। সৈয়দ আবুল বাশার সতর্কতা অবলম্বনের জন্য চাঁদপুরগামী বৃহতকায় চাউল বহনকারী অনেকগুলি নৌকার সাহায্য গ্রহণ করেন। প্রতি চাউলের নৌকায় ২/৩ জন মুক্তিযোদ্ধা আহরন করেন। দলনেতা সৈয়দ আবুল বাশার, দু'জন পথ প্রদর্শক নিয়ে জেলে নৌকায় যুদ্ধাস্ত্রসহ চাউলের নৌকাগুলিকে অনুসরন করতে থাকেন। তিনি শিয়ালকাঠি গ্রামে জেলে পাড়ায় পৌঁছে অস্ত্রশস্ত্র সহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। সৈয়দ আবুল বাশার রাত ৮ টায় ছোট একটি নৌকা যোগে ভাণ্ডারিয়া ও রাজাপুর হয়ে গাবখান নদী পাড়ি দিয়ে কিত্তিপাশা হয়ে বরাকোটায় ক্যাপ্টেন ওমরের ক্যাম্পে উপস্থিত হন।

তখনও পর্যন্ত এই ক্যাম্পে কোন কমাণ্ডো এবং সুবেদার আবুল হোসেন পৌঁছতে পারেননি। ভাণ্ডারিয়া, হুলারহাট ও কাউখালীতে মুক্তিযোদ্ধার আগমনের সংবাদে রাজাকার ও শত্রুবাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ফলে

এখানে কমান্ডোদল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। চাঁদপুরের কয়েকজন কমান্ডো চাউলের নৌকা যোগে চাঁদপুর চলে যান।

২২ সেপ্টেম্বর কমান্ডো আব্দুল কুদ্দুস, আতাহার উদ্দিন তালুকদার, শাহ আলম ও মোক্তার হোসেন ক্যাম্পে আগমন করেন। ইতিমধ্যে বড়াকোটা থেকে স্বরুপকাঠীর বিন্যাতে ক্যাপ্টেন ওমরের ক্যাম্প স্থানান্তর করা হয়। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তায় সৈয়দ আবুল বাশার সাথী ৩ জন কমান্ডোসহ বরিশাল শহরের পূর্ব পারে কর্ণকাঠি গ্রামে উপস্থিত হন। তারা কর্ণকাঠিতে শাহ আলম খান ও আব্দুর রশিদ খানের বাড়িতে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কর্ণকাঠি আশার পূর্বে কমান্ডার বেনু বাবুর অনুরোধে স্বরুপকাঠি থানা দখলে কমান্ডো দল সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কর্ণকাঠি পৌছে সৈয়দ আবুল বাশার কর্ণকাঠি ও দপদপিয়া গ্রামের জনসাধারনের সমর্থন আদায়ের গোপন প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি হানাদার বাহিনী শহরতলীর রুপাতলীতে গনহত্যা, লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় ভীত সন্ত্রস্ত জনগণ শহরতলী ছেড়ে দপদপিয়া গ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। জনগণ পাকবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। নৌ কমান্ডোদের আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তত করতে তাঁরা জনগণের সাথে মিশে চলতে চেষ্টা করে আসছিলেন। ১২ নভেম্বর, চারজন কমান্ডো জনগণের সাহায্য নিয়ে প্রথম অপারেশন পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

পরিকল্পনা মাফিক দলনেতা সৈয়দ আবুল বাশার দুটি মাইনের সাহায্যে রুপাতলীর একটি ব্রিজ ধ্বংস করেন, আতাহার উদ্দিন তালুকদার ও শাহ আলম দুটি করে মাইন নিয়ে জাহাজে স্থাপনের পরিকল্পনা নেন। ব্রিজ ধ্বংসের শব্দ শোনার পর আতাহার উদ্দিন এবং শাহ আলম দুটি খাদ্যবাহী জাহাজ ও ১টি ফ্লাট ধ্বংস করার জন্য যাত্রা করেন।

২৯ নভেম্বর সৈয়দ আবুল বাশার দ্বিতীয়বার অভিযান পরিচালনা করে বরিশাল ত্রিশ গোডাউনের সম্মুখে একটি খাদ্যবাহী (ছাতুর) জাহাজ, ১টি অয়েল ট্যাংকার আক্রমণ করলে একটি তেল বহনকারী জাহাজ নিমজ্জিত হয়। কমান্ডো সৈয়দ আবুল বাশার একাধিক সফল অভিযানে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বীরত্ব সূচক খেতাব প্রদানের দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য নৌ-কমান্ডোদের মাঝে যাঁরা বীরত্ব সূচক খেতাব পেয়েছেন তাঁদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং দুসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এছাড়া ও সৈয়দ আবুল বাশার ক্যাপ্টেন ওমরের নেতৃত্বে বাবুগঞ্জ থানা দখল, শামন্তকাঠি মিলিশিয়া ক্যাম্প অপারেশন, ঝালকাঠী গাবখান নদীতে শত্রু সৈন্য বহনকারী ষ্টীমার আক্রমন করেন। তার এলাকায় শাহজাহান চৌধুরী, বকা মিয়া কুখ্যাত দালাল এবং হানাদার বাহিনীর সহযোগী ছিল।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০)



মোঃ ইমাম বারী (৯-১০-১৯৫১), পিতা-শাহ মরহুম আতিয়ার রহমান। গ্রাম-কাটিয়া, পোষ্ট-সাতক্ষীরা সদর, জেলা-সাতক্ষীরা। শিক্ষাগত যোগ্যতা-ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাসের দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অনিবার্য প্রতিশ্রুতি। যার রূপকার ছিলেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুক্তিযুদ্ধ একদিনে শুরু হয়নি। অনেক আন্দোলন এবং সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ৬২ সাল থেকে পাকিস্তানী সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ৬৯ এর অভূতপূর্ব গণআন্দোলন সমগ্র জাতিকে উদ্বেলিত করে। আন্দোলনের পদভারে দেশ প্রকম্পিত হতে থাকে। ছাত্ররা মূলত এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সেই সময়ে যশোর পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র সংসদের জি এস মোঃ ইমাম বারী পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ২৫ মার্চ, থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত যশোর শহর ছিল মূলত রণক্ষেত্র। এরপর বিদ্রোহী বাঙালি পিছু হটতে বাধ্য হয়। ছাত্র ইমাম বারীও যশোর ছেড়ে সাতক্ষীরা চলে আসেন। তখনও সাতক্ষীরা শহর শত্রমুক্ত ছিল। এখানে স্থানীয় ছাত্র এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মিশে প্রতিদিন মিছিল-মিটিং করতে থাকেন। অস্ত্র সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ এবং প্রতিটি বিপ্লবাত্মক কাজে জড়িত হয়ে পড়েন।

২১ এপ্রিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাতক্ষীরা শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। পূর্বেই বিদ্রোহী পুলিশ, ইপিআর, সেনা সদস্য, ছাত্র-জনতা শহর ছেড়ে ভোমরা সীমান্তে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। ইমামবারী একই সময়ে ২৪ পরগনা জেলার তকীপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন।

১২ মে, নৌকমাণ্ডো ট্রেনিং গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে উপস্থিত হন। প্রায় ১০/১২ হাজার যুবকের মধ্য থেকে মাত্র ৮৫ জন যুবককে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই মনোনয়ন করা হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তারা কমাণ্ডো মনোনীত করেন। এসময় মনোনয়ন

দলের সাথে ছিলেন কর্ণেল এম.এ.জি ওসমানী, গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ, ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ।

পলাশীতে প্রতিষ্ঠিত নৌ কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ৩ মাস প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ আগষ্ট সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ বীর প্রতীক এর নেতৃত্বে ৬০ জনের কমাণ্ডো দলকে মংলা এবং হিরন পয়েন্ট অভিযানে পাঠানো হয়। মংলা বন্দরে সমরাস্ত্র বাহী জাহাজ লাইটনিং, ডার্ট, ট্যাংক-৫, ডাট ট্যাংক-৭ সহ ৬টি বিদেশী জাহাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইমামবারী, খলিলুর রহমান, শেখ মহসীন আলী ও মুজিবুর রহমান এই অভিযানে উপদলনেতা হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। হিরণ পয়েন্ট অভিযানে উপ দলনেতা ছিলেন মোঃ আঃ গাফ্ফার।

সফল অভিযান শেষে কমান্ডো দলের ভারত প্রত্যাগমন কালে সাতক্ষীরা জেলার বুধহাটাতে পাকিস্তান বাহিনীর এ্যাম্বুশে পড়ে উভয় পক্ষের মাঝে তুমুল যুদ্ধ হয়। গুলি শেষ হয়ে গেলে ৬ জন কমাণ্ডো শত্রুবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। উল্লেখ্য যে, স্থল বাহিনীর গেরিলা যোদ্ধা যারা নৌ কমান্ডোদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এসেছিলেন তাঁদের অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধাচরন করায় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে ৭ জন কমাণ্ডো পৃথকভাবে পায়ে হেঁটে ভারতে পৌছানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর ঘটে আনাকাঙ্খিত বিপত্তি, যার বর্ণনায় পৃথক একটি গ্রন্থও রচনা সম্ভব। পাকবাহিনীর হাতে ৪ জন বন্দি হন। ২ জন সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন। বন্দি ৪ জন কমান্ডোর উপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। তাঁর সাথে বন্দি হন কমান্ডো মুজিবুর রহমান, খলিলুর রহমান, ইমদাদুল হক।

১ মাস যশোর সেনানিবাসে বন্দি অবস্থায় থাকার পর সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ তারিখ সেনানিবাসের নিচ্ছিদ্র পাহারার মধ্য থেকে পালিয়ে তাঁরা পুণরায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। একই মাসে তিনি লেঃ মাহফুজ আনাম বেগের নেতৃত্বে দেবহাটা থানার পারুলিয়া ব্রিজ এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেন। এরপর কুলিয়ার যুদ্ধ, গাজী মোঃ রহমতউল্লার নেতৃত্বে কপিলমুনি এবং পাইকগাছা যুদ্ধে অংশ নেন।

স্বাধীনতার পর ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। বর্তমানে বেকার অবস্থায় নিজ বাড়িতে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন।

(তথ্যঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



মোঃ মাজহারউল্লা, বীর উত্তম, পিতা-মৌলানা আলী আযম, গ্রাম-বালুকিয়া, থানা- মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমান- ব্যবস্থাপক, সাধারণ বীমা করপোরেশন, শাখা-২, লালদিঘী, চট্টগ্রাম। ছাত্র মোঃ মাযহার উল্লা ১৯৬৬ সাল থেকে দেশব্যাপী ছাত্র ও গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

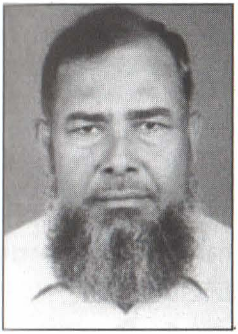
১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত নিরস্ত্র জনগণের উপর আক্রমণ শুরু করলে সারা দেশ বারুদের মত জ্বলে উঠে। সমগ্র জাতি বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। বাঙালি যোদ্ধার জাতি না হলেও তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। ছাত্র জনতা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পাশে এসে দাঁড়ায়। জনাব মাযহারউল্লাহ এসময় চট্টগ্রামে প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত মেজর রফিক এর সৈন্যবাহিনীকে সকল রকম সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। গ্রামের যুবকদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মেজর রফিক এবং তার বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে পিছু হটে যান। এসময় স্থানীয় জনগণ বিশেষ ভাবে যুবকদের নিজ বাড়িতে অবস্থান ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে। জনাব মাযহারউল্লাহর গ্রামটি ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের পাশে অবস্থিত। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এলাকার দখল গ্রহণের পর প্রায়ই বিভিন্ন গ্রামে ঢুকে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং নারী, পুরুষ, যুবকদের নির্বিচারে হত্যা শুরু করে। গ্রামের একশ্রেণীর দালাল শত্রু বাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে আসে।

তখন তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুক্তিবাহিনীতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারত গমন করেন। মে মাসে ভারতের হরিনা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন।

জুন মাসের মাঝামাঝি ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তাসহ ফ্রান্স থেকে আগত বাঙালি নাবিকবৃন্দ হরিনা ক্যাম্পে আসেন। ক্যাম্পের যুবকদের ফল ইন করিয়ে বাছাই করতে থাকেন। মনোনীতদের বুকে চক দিয়ে ক্রস চিহ্ন দেয়া হয়। জনাব মাযহারউল্লাহ নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে উপস্থিত হন। দেড়মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি সহ ৬০ জন নৌকমান্ডোকে ৩টি দলে বিভক্ত করে ৩ জন কমান্ডারের অধীনে বন্দর এলাকায় পাঠানো হয়। মাযহার উল্লাহ একটি দলের কমান্ডার ছিলেন। ১৫ আগষ্ট চট্টগ্রাম বন্দরে সফল অভিযানের জন্য জনাব মাযহারউল্লাহকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করা হয়। অপর দু'জন কমান্ডার ছিলেন ডাঃ শাহ্ আলম এবং আব্দুল রশিদ। সরকার ডাঃ শাহ্ আলমকে বীরত্ব সূচক বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করেন।

এরপর নভেম্বর মাসে তিনি ৩০ জন কমান্ডোর অপর একটি দল নিয়ে সন্দ্বীপ অভিযানে যাত্রা করেন। কিন্তু প্রবল বর্ষায় কর্দমাক্ত পথে খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে খেজুর গাছের সূঁচালো কাটা তাঁর পায়ে বিদ্ধ হলে তিনি যুদ্ধে অংশ নিতে অসমর্থ হন। ফলে পথিমধ্যে নিজ বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

(সূত্রঃ ডাঃ মাহফুজুর রহমান প্রণীত বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম অবলম্বনে)



লে: কমাণ্ডার নূর মোস্তফা (অব:), পিতা-মরহুম হাবিবুর রহমান। গ্রাম-বগাচত্তর, ডাক-কমরআলী, থানা-সীতাকুণ্ড, জেলা-চট্টগ্রাম। বর্তমান-নূর মঞ্জিল, দক্ষিণ হালিশহর হাই স্কুল রোড, পোষ্ট-সেইলার্স কলোনী, থানা-বন্দর, চট্টগ্রাম। ১৯৪৪ সালের ২০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।

বিএ ডিগ্রী লাভ করার পর ১৯৬১ সালে চট্টগ্রামে তদানীন্তন পাকিস্তান বয়েজ নেভীতে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালের ১ম সপ্তায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য জাহাজযোগে তাঁকে করাচী পাঠানো হয়। পিএনএস বাহাদুরে (প্রশিক্ষণ সেন্টার) ১৮ মাস বিভিন্ন পেশাগত এবং ৬ মাস পিএনএস বাবরে সীম্যান শীপ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই ব্যাচে মোট ২২১ জন প্রশিক্ষণ নেয়। যার মাঝে ২১ জন ছিল বাঙালি। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি পিএনএস জাহাঙ্গীর, পিএনএস টিপু সুলতান, পিএনএস আবধোজে চাকরিরত ছিলেন। পাকিস্তানীরা বাঙালিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ভাবত। এই মনোভাব নিয়ে আচরন করায় অনেক বাঙালি কর্মস্থল থেকে পালিয়ে আসে।

তিনি ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধে "Run of Kutch war" এ ভারতের 'দ্বারকা' আক্রমণ অভিযানে অংশ নেন। যুদ্ধে বোমা বর্ষনের সময় তিনি 'ঢ' টারেট ট্রেইনার এর দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁদের টারেট থেকে ১৩টি গোলা বর্ষিত হয়। ১৯৬৭ সালে তিনি পিএন ডক ইয়ার্ডে বদলি হন। ১৯৭০ সালে অক্টোবর মাসে পুনরায় ''পিএনএস আবধোজ'' এ বদলি হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর পূর্বে অতি তড়িঘড়ি করে পাকিস্তান নেভী এই বেস কমিশন করে। এটি হলো পাকিস্তান নৌবাহিনীর সাবমেরীন বেজ।

১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি দুই মাসের বাৎসরিক ছুটি নিয়ে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। ২৫ মার্চের পর নিজ এলাকায় থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে আশ্রয় ও সাহায্য সহযোগিতা করেন। অক্টোবর মাসে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের আগরতলা দূর্গা চৌধুরীপাড়া ক্যাম্পে যোগ দেন। এখানে ২০ দিন অবস্থানের পর নভেম্বর মাসে ২১ জন নাবিক বিমান যোগে কলকাতা পৌঁছেন। সেখান থেকে হুগলি 'গার্ডেন রীচ' ডক ইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম গানবোট 'পদ্মা' তে যোগদান করেন। এই গানবোর্টে বিভিন্ন ক্যাডারের ১৯ জন নাবিক ছিলেন। কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লেঃ রায় চৌধুরী। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অপর গানবোট 'পলাশ' ও একই সাথে প্রস্তুত হয়। উভয় গানবোটে ২টি করে ৪০/৬০ বাফার গান এবং ৪টি করে গ্রাউন্ড মাইন স্থাপন করা ছিল। দু'টি জাহাজ প্রাথমিক পর্যায়ে হলদিয়া বন্দরে মহড়া শুরু করে।

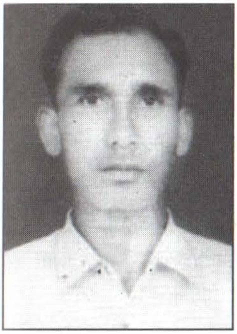
নভেম্বর মাসে দুটি গানবোট কমাণ্ডার সামন্ত এর নেতৃত্বে অজানা অপারেশন এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু হলদিয়া বন্দর ত্যাগ করার পর বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশের সাথে সাথে একটি পাকিস্তানী পর্যবেক্ষণ বিমানকে তাদের জাহাজকে অনুসরন করতে দেখা যায়। ফলে দু'টি গানবোট পুণরায় হলদিয়া ফিরে আসে। এরপর তারা মংলা বন্দরের অদূরে ফেয়ার ওয়ে বয়ার ১ থেকে ৮নং বয়া পর্যন্ত ৮টি গ্রাউন্ড মাইন স্থাপন করেন।

ডিসেম্বর মাসে গানবোট দু'টিতে একজন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার, একজন সিনিয়র কমাণ্ডো অফিসার ও একজন ড্রাইভিং অফিসারসহ বেশ কয়েকজন নৌকমাণ্ডো বিভিন্ন অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ 'পদ্মা' গানবোটে বোর্ড করেন। 'পলাশ' গানবোটটিও একইভাবে প্রস্তুত করা হয়।

অতঃপর ভারতীয় নৌবাহিনীর গানবোট পানভেল ও একখানা ল্যান্ডিং ক্রাফট চিত্রাঙ্গদা একযোগে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে। ৯ ডিসেম্বর তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের হাসনাবাদ হয়ে রাতে মংলা বন্দরের অদূরে সুন্দরবন চ্যানেলে নোঙ্গর করে থাকেন। ১০ ডিসেম্বর সকালে খুলনার উদ্দেশ্যে যাত্রা কালে তাঁরা মংলা বন্দরে অনেকগুলি জাহাজকে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁদের গানবোটগুলি Que Formation এ এগুচ্ছিল। প্রথম পানভেল এরপর পদ্মা ও পলাশ এবং পিছনে ল্যান্ডিং ক্রাফট চিত্রাংগদা ছিল।

গানবোটগুলি খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি পৌঁছলে অকষ্মাৎ বিমান হামলায় জাহাজে আগুন ধরে যায়। ফলে অনেকে শহীদ হন। অনেকে আহত অবস্থায় পানিতে ভাসতে থাকলে ভারতীয় গানবোট তাঁদের উদ্ধার করে কলকাতার ব্যারাকপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। জনাব নূর মোহাম্মদও যুদ্ধে মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং গানবোট দ্বারা তাকে পানি থেকে উদ্ধার করা হয়। ব্যারাকপুর হাসপাতালে একমাস চিকিৎসাধীন থেকে সুস্থ হয়ে তিনি দেশে ফিরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি বীরত্ব সূচক পদক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সালে লেঃ কমাণ্ডার হিসেবে নৌবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

(তথ্যঃ মোঃ নূর মোস্তফা লেঃ কমাণ্ডার (অবঃ) তারিখঃ ২৭ জানুয়ারি ২০০০)



মোঃ হুমায়ুন কবির, পিতা- শহীদ শেখ আব্দুল মজিদ। গ্রাম- নন্দীগ্রাম, পোষ্ট-পানাইল, থানা-আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর। জন্ম-৯ অক্টোবর ১৯৫৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা- নবম শ্রেণী পাশ।

১৯৬৯ সালে পুলিশ বিভাগে ভর্তি হন। ৬ মাস সারদায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ঢাকা জেলা পুলিশে যোগদান করেন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে খুলনায় ফিরে যান। তাঁর পিতা শেখ আব্দুল মজিদ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে চাকরি করতেন। এখানে পরিবারের সাথে অবস্থান করে সুস্থ হয়ে উঠেন। কিন্তু '৭০ সালে দেশের বিরাজমান অবস্থা দেখে তাঁর পিতা হুমায়ুনকে আর চাকরিতে ফিরে যেতে দেননি।

১৯৭১ সালে তাঁদের পরিবার মিলের কলোনীতে অবস্থানকালে মিলের চারিদিকে বাঙালি-অবাঙালিদের মাঝে দাঙ্গা লক্ষ্য করেন। ২৫ মার্চ, ঢাকায় গণহত্যার সংবাদ জানতে পেরে তাঁরা শংকিত হয়ে পড়েন। ২৭ মার্চ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী অবাঙালিদের সাথে নিয়ে মিলের অভ্যন্তরে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকলে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়। তিনি স্ত্রী, মা ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রাণভয়ে ভৈরব নদী পার হয়ে আত্মরক্ষা করেন। এখান থেকে নৌকা যোগে পরিবারসহ গ্রামের বাড়ি আলফাডাঙ্গায় পৌঁছেন।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে গ্রামের ১২ জন যুবক সহ পায়ে হেঁটে ভারতের বনগাঁ, ৫নং টালিখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে এসে যোগদান করেন। মে মাসের ১২ তারিখ তিনি নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হন। এদিন মোট ৩৫ জনকে মনোনীত করা হয়। মেডিকেল সম্পন্ন করার পর সামরিক ট্রাকে ৩৫ জন যুবককে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে আনা হয়।

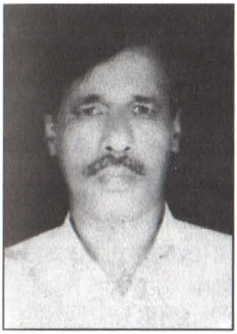
এখানে তিনমাস কঠিন নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় হিরন পয়েন্ট অভিযানে অংশ নেন। হুমায়ুন কবির ১২ জন কমাণ্ডো দলের দলনেতা মনোনীত হন। হিরন পয়েন্ট অপারেশন সম্ভব হয়নি। ফলে তাদের ১২ জন কমাণ্ডো দলটিকে মেজর জিয়াউদ্দিন তার ক্যাম্প উজিরপুর নিয়ে আসেন এবং এখানে একমাস নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন। তিনি বুঝতে পারেন মেজর জিয়াউদ্দিন পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে পরবতীর্তে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সংগ্রহে অধিক আগ্রহী। অতএব, তাঁরা এখান থেকে চলে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

১৫ সেপ্টেম্বর নৌকমান্ডো দল মেজর জিয়াউদ্দিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। ১৮ সেপ্টম্বর তাঁরা সাতক্ষীরা জেলার হরিনগর নামক স্থানে পৌঁছলে পাকিস্তানী গানবোটের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে পাকিস্তানী গানবোটের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। শত্রু পক্ষের গানার সহ কয়েকজন নিহত হয়। গুলির আঘাতে কমান্ডো শমশের আলীর একটি কান সম্পুর্ণ উড়ে যায়। অত:পর তাঁরা পুণরায় পলাশী ক্যাম্পে ফিরে আসেন।

অক্টোবর মাসে তিনি পুনরায় গাজী মোঃ রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে মংলা ও চালনা বন্দর অভিযানে যোগ দেন। এছাড়া তিনি আশাশুনি, পাইকগাছা, কপিলমুনি সহ বিভিন্ন স্থানে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন।

স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগ দেন। পরে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ১৫ অক্টোবর ১৯৯৯)



মোঃ বশির আহমদ, পিতা- তমিজ উদ্দিন আহমদ। গ্রাম- হামছাদী, থানা- সোনারগাঁও, জেলা- নারায়ণগঞ্জ। ১৯৬৬ সাল থেকে '৬৯ পর্যন্ত ৬ দফা এবং ১১ দফা আন্দোলনে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সেই সময়ে আন্দোলনের দিনগুলিতে তিনি সকল মিটিং এবং মিছিলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ৭ মার্চ সোনারগাঁও থেকে কয়েক হাজার লোক সমন্বয়ে রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জনসভায় যোগদান করেন।

২৫ মার্চ, পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করলে ২৭ মার্চ সকাল থেকে হাজার হাজার স্ত্রী, পুরুষ, সাথে বাঙালি পুলিশ, ইপিআর এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা ঢাকা ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। যুবক বশির আহমদ তখন থানা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে শহর ত্যাগী জনতাকে সকল রকম সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন। এলাকায় আশ্রয় কেন্দ্র খুলে তাদের বিশ্রাম, আহার ও চিকিৎসা সেবা দিতে থাকেন। কিন্তু এইভাবে বেশিদিন চলা সম্ভব হয়নি। গ্রাম ও একসময় বিপদ সংকুল হয়ে পড়ে। হানাদার বাহিনী শহর থেকে তখন গ্রামাভিমুখে আগ্রাসন শুরু করে। গ্রামের যুবকদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষনে তারা মেতে উঠে।

এসব প্রত্যক্ষ করে যুবক বশিরের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হন। কিন্তু উপলদ্ধি করতে পারেন শত্রুর অত্যাচারের জবাব দিতে গেলে অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তাই তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা নেন। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি গ্রামের কয়েকজন যুবকসহ ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। কিছুদিন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অবস্থানের পর মে মাসের মাঝামাঝি সময় তিনি উচ্চতর নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হন। ১৩ই মে, পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের উদ্বোধন দিন থেকে ৪ঠা আগষ্ট পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তিনমাস কঠোর পরিশ্রমের পর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ১৫ আগষ্ট অপারেশন জ্যাকপটের অধীন ৬০ জন নৌকমাণ্ডো দলের সাথে মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। দলনেতা ছিলেন সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ। সফল অভিযান শেষে পুণরায় ভারত প্রত্যাবর্তন করেন। অক্টোবর মাসে সাবমেরীনার বদিউল আলম এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় পর্যায়ে পুণরায় মংলা বন্দর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অত্র এলাকায় অবস্থান করে মংলা ও চালনা বন্দরে ১২টি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কোন কোন যুদ্ধ তার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এছাড়া তিনি,

আশাশুনি, পাইকগাছা, দাকোপ, কপিলমুনিতে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিজয় লাভের পর তিনি ছাত্রজীবনে ফিরে যান। বর্তমানে সোনারগাঁও সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে দলিল লেখক হিসেবে কর্মরত এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডো এসোসিয়েশন এর নির্বাহী সদস্য।

(সূত্রঃ প্রদত্ত লিখিত বর্ণনা এবং অডিও রেকর্ডিং অবলম্বনে)



লে: কমাণ্ডার মকবুল আহম্মদ (অব:), পিতা-হাজী নূর মিয়া। গ্রাম-বানাবাড়িয়া, পোষ্ট- হুচ্ছামিয়া, থানা-নাঙ্গলকোট, জেলা- কুমিল্লা। বর্তমান-১১৩ ইব্রাহিমপুর (স্কুল রোড), ৪র্থ তলা, থানা- কাফরুল ঢাকা-১২০৬, জন্ম-২ জানুয়ারি ১৯৪৫।

১৯৬৪ সালের ১৫ জুন তিনি কুমিল্লাতে তদানিন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ডিই, পিএম হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৬৪ সালের জুলাই মাস হতে ১৯৬৫ সালের জুন পর্যন্ত করাচীতে পিএনএস বাহাদুর এবং পিএনএস দেলোয়ারে, প্রাথমিক এবং বেসিক ট্রেনিং গ্রহণ করেন।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের নৌ সদর দপ্তর করাচীতে প্লাটুন কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম সাহেবের অধীনে চাকরি করেছেন। মোয়াজ্জেম সাহেব পরবর্তীতে লেঃ কমাণ্ডার পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং পাকিস্তান সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উত্থাপন করলে শহীদ লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে অন্যতম আসামী করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মোয়াজ্জেম হোসেনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে।

মকবুল আহমদ '৭১ এর ১৩ মার্চ, ৬০ দিনের বাৎসরিক ছুটি নিয়ে কুমিল্লার নিজ বাড়িতে চলে আসেন। ২৫ মার্চ রাতে তিনি বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনে ময়মনসিংহ চলে আসেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় শ্বশুরের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। জনাব মকবুল আহম্মদ এর শ্বশুর রেলওয়েতে চাকরি করতেন এবং ময়মনসিংহ তার কর্মস্থল ছিল। ২৬ মার্চ ময়মনসিংহ শহরে বাঙালি এবং বিহারীদের মাঝে দ্বন্দ্ব এবং গুলি বিনিময় হলে মকবুল আহমদ এর শ্বশুর বাঙালিদের সংগঠিত করে বিহারীদের আক্রমন প্রতিহত করেন। এদিন বহু অবাঙালি এবং বিহারী মারা পড়ে। এরপর মানুষ ভয়ে শহর ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে থাকে। শহর প্রায় মানব শুন্য

হয়ে পড়ে। চারিদিকে লাশের পচা গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। শহরে থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ময়মনসিংহ অভিমুখে অগ্রাভিযান শুরু করেছে জানতে পেরে মকবুল আহমদ,তাঁর শ্বশুর পরিবার পরিজনসহ ট্রেনের হস্তচালিত ট্রলিতে গৌরীপুর পৌঁছেন। এখান থেকে বহু কষ্টে জীবনের ঝুকি নিয়ে এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ কুমিল্লায় তাঁর নিজ বাড়িতে পৌঁছেন। এখানে স্ত্রী এবং অন্যান্যদের রেখে ১১ এপ্রিল তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশে বাড়ি ত্যাগ করে ভারতের চোত্তাখোলা ক্যাম্পে পৌঁছেন । ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এমপি জনাব খাজা আহম্মদ। তার নির্দেশে মকবুল আহম্মদ চিঠিসহ আগরতলায় বাংলাদেশ ফোর্সেস হেড কোয়াটারে এসে রিপোর্ট করেন।

আগরতলা থেকে আরও ১৮ জন নৌ সদস্যকে একত্র করে ৩নং সেক্টর ঞ্চসিঞ্চ কোম্পানীতে ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান এর অধীনে ২য় বেংগল রেজিমেন্টর সৈনিকদের সাথে মিশে বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন। নভেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি ৩নং সেক্টরে যুদ্ধরত ছিলেন। নভেম্বর মাসের ২৯ তারিখ হেড কোয়াটারের নির্দেশে সকল নৌ সদস্যকে নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কলকাতায় পাঠায়। জনাব মকবুল আহম্মদও দলের সাথে কলকাতা চলে যান।

কলকাতা শিপ ইয়ার্ডে 'পারুল' নামে একটি গানবোট প্রস্তুত হচ্ছিল। এই জাহাজের ক্রু হিসেবে তাঁদের প্রস্তুত রাখা হয়। 'পদ্মা' ও 'পলাশ' তখন যুদ্ধে লিপ্ত। ১০ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের এ ২টি যুদ্ধ জাহাজ বিধ্বস্ত হলে অসংখ্য আহত নাবিককে চিকিৎসার জন্য কলকাতা আনা হয়। তখন এই নাবিক দলকে আহত নাবিকদের সেবা শুশ্রুষার দায়িত্ব দেয়া হয়।

এর মাঝে ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। 'পারুল' যুদ্ধজাহাজকে আর কমিশন করা হয়নি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা পৌঁছে তিনি নিউ ইসকাটনে নৌবাহিনীর ট্রানজিট ক্যাম্পে যোগদেন। সে সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কোন অফিসার ছিলেন না। জনাব মকবুল আহমদ ক্ষোভের সাথে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেনা বলে যে সকল অফিসার কর্তব্যরত ছিল অথবা ছুটি ভোগ করছিল তারা নিরাপত্তার কথা বলে তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি নিয়ে চলে যায়। পরে তারাই পাকিস্তান থেকে ফিরে সর্বময় কর্তা বনে যায়। এ সব সরকারী সিদ্ধান্তে ঘটে। তারা মুক্তিযোদ্ধা নাবিকদের সাথে খারাপ আচরন শুরু করে। ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধা নাবিক চাকরি ছেড়ে চলে যান। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়।

তিনি ১৯৯৩ সালে লেঃ কমাণ্ডার হিসাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে নিজ বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করছেন।

(তথ্যঃ লেঃ কমাণ্ডার (অবঃ) মকবুল আহম্মদ, তারিখঃ ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০০)



মোঃ হাসান নূর, পিতা-মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, গ্রাম-পাথরতলা, পাবনা সদর, পাবনা। বর্তমানে প্রিন্সিপাল অফিসার, সোনালী ব্যাংক, পাবনা। জন্ম তারিখ ১৮-১২-১৯৪৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুরাগি হাসান নুর ছাত্রাবস্থায় ৬৬ সাল থেকে ৬৯ এর গণআন্দোলন এবং ৭০ এর নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মহল্লায় ছেলেদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অতঃপর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত গমন করেন। এবং ১৩ মে, ১৯৭১ পলাশীর ভাগীরথী নদীর তীরে নৌকমাণ্ডো ঘাঁটিতে যোগদান করেন।

নৌকমাণ্ডো হিসেবে ট্রেনিং শেষ করে ১৯৭১ সালের ১৫ আগষ্ট, গ্রুপ লিডার হিসেবে তিনি ৯ জন সহযোদ্ধা সহ দাউদ কান্দি ফেরিঘাট (কুমিল্লা) অপারেশনে যান। ১৩ আগষ্ট দাউদকান্দিতে তাঁরা পৌছিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন এবং ১৫ আগষ্ট রাত্রি ১.৩০ মিঃ অপারেশন শুরু করেন। ঐ অপারেশনে তারা প্রভূত সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হন। দাউদকান্দি ফেরীঘাট এবং পল্টুন সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করে অচল করে দেন। যার ফলে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার তিনি গ্রুপ কমাণ্ডার হয়ে নগরবাড়ি ফেরী ঘাট অপারেশনে অংশ নেন। উক্ত অপারেশনে তাঁর সংগে সহযোদ্ধা ছিল ৬ জন। এই অপারেশনটি অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে সংঘটিত হয়। সেখানে তখন বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য মোতায়েন ছিল তা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা দুঃসাহসিকতার সাথে অপারেশন পরিচালনা করেন। শত্রুদের তুলনায় নগণ্য অস্ত্রের সাহায্যে তাঁরা অপারেশন পরিচালনা করে প্রচুর সফলতা অর্জন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০)



মো: হাবিবুর রহমান, পিতা- মোঃ লুৎফুল কবির, গ্রাম- চান্দ্রা, থানা- দাউদকান্দী, জেলা- কুমিল্লা। বর্তমান- ৪৯ উত্তর বাসাবো, ঢাকা। শৈশবে নিজ গ্রামের স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকে সমগ্র দেশের ছাত্র ও জনতা পাকিস্তান সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ফেটে পড়েন। জনতার পদভারে সরাদেশ প্রকম্পিত হতে থাকে। এই আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। হাবিবুর রহমান এসময় সিলেট পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র। তিনি এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। '৬৬ সাল থেকে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

২৫ মার্চ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকাসহ দেশের প্রায় সকল স্থানে নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ এবং হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে তিনি পাকিস্তানী সেনাদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে আক্রোশে ফেটে পড়েন। দখলদার বাহিনীর নির্মমতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প নিয়ে তিনি বন্ধু বান্ধবসহ মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পরিকল্পনা করতে থাকেন।

মে মাসের শেষ নাগাদ দেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখলে চলে আসে। এসময় কিছু বাঙালি-পাকিস্তানীদের খুশি করার জন্য তাদের তাবেদারী শুরু করে। যুব সম্প্রদায়কে মুক্তিবাহিনী আখ্যায়িত করে পাকিস্তানীদের হাতে তুলে দিতে থাকলে হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালি যুবকদের নির্মমভাবে হত্যা শুরু করে। হাবিবুর রহমান এর মাঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন।

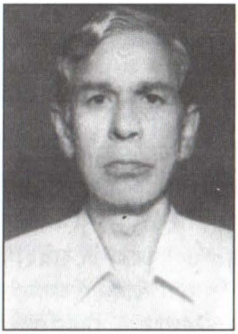
এখান থেকে নৌকমান্ডো (আত্মঘাতী) ট্রেনিং গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে চলে আসেন। পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ৩ মাস ট্রেনিং গ্রহণের পর অক্টোবর মাসে ১২ জন কমান্ডো দলের দলনেতা মনোনীত করে হাবিবুর রহমানকে সিলেট ও সুনামগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে অপারেশনে পাঠানো হয়। প্রতিকুল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এখানে প্রথম অপারেশন সফল হয়নি। নদীর নীচে দীর্ঘ এক প্রকারের লতা পায়ে জড়িয়ে কমান্ডোদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে। এসব লতা পানির নীচে লুকানো অবস্থায় ছিল কমান্ডোরা তা বুঝতে পারেনি। আন্ডার ওয়াটার সুইমিং করার সময় দীর্ঘ চিকন

লতায় পা আটকিয়ে যায়, ফলে পানির নীচে তাঁদের জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। এরপর সুনামগঞ্জ তাহেরপুরে অবস্থিত আর্মি জেটি বানিয়াচং এলাকায় নদীতে একটি গানবোট ধ্বংস এবং কয়েকটি রাজাকার ঘাঁটি দখল করেন। বাইলাবাড়িতে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অসমসাহসীকতার সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের পরাস্ত করে বাইলাবাড়ি ব্রিজ উড়িয়ে দেন। এ সকল যুদ্ধে উপদলনেতা হিসেবে তার সহযোদ্ধা ছিলেন জয়নাল আবেদীন।

স্বাধীনতার পর তিনি ছাত্র জীবনে ফিরে যায়। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন। ১৯৭৪ সালে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন। তিনি মস্তিষ্কে/ ব্রেনে টিউমার অপারেশন করে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসেন।

বর্তমানে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তিনি হজব্রত পালন করেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত। নৌ কমান্ডোদের সংগঠিত করে তাঁদের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অবলম্বন গড়ে তোলার জন্য ১৯৭২ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ নৌকমান্ডো এসোসিয়েশনের একজন নির্বাহী সদস্য।

(সূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধ ও নৌকমান্ডো অভিযান গ্রন্থ এবং প্রদত্ত বর্ণনা ১৯৯৬)



মো: আব্দুর রহিম, পিতা-মৃত মোঃ মফিজউদ্দিন, মাতা- শহর বানু। গ্রাম-লাউখাই, ডাক-গোবিন্দপুর, থানা-পূর্বধলা, নেত্রকোনা। বর্তমান- ১২/৩৪, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ। জন্ম- ১৯৩৯ সালের ১৯ এপ্রিল।

১৯৪৯ সালে গ্রামের স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৫৫ সালে শ্যামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করার পর ১৯৫৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালের ১ জুলাই কমিশন লাভ করেন। ১৯৮৯ সালের ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশ নৌ বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ৫২ এর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে প্রচেষ্টা চালান। '৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। আগষ্ট মাস অবধি তিনি নিজ এলাকায় আত্মগোপন করে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, সাহায্য অব্যাহত রাখেন।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে তিনি ভারতে চলে যান এবং শিববাড়ি এবং পরে ঢালু মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করে প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত থাকেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৮৯ সালে লেঃ হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

(সূত্রঃ তথ্য প্রদান করেন, তারিখঃ ২৫ মার্চ ২০০০)



বোরহান উদ্দিন আহমেদ, স্বাধীনতা সম্পর্কে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার অভিমত এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, স্বাধীনতা চাওয়া যদি অপরাধ হয়, তবে বিশ্বের প্রতিটি মানুষই অপরাধী। স্বাধীনতা চাওয়া অপরাধ যা মানুষ জেনে শুনেই করে। কারন স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়- দাসত্ব শৃংখল কে পরিবে পায়? কেহই শৃংখলাবদ্ধ হয়ে বাঁচতে চায় না। ছাত্র ও যুবক বোরহান উদ্দিনও চাননি, তাই তিনি শিক্ষা জীবন অসমাপ্ত রেখেই পাকিস্তানীনের হাত থেকে বাঙালিকে দাসত্বমুক্ত করতে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন। বুকে শক্তিশালী একটি তাজা মাইন নিয়ে দখলদার বাহিনীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে তাদের অহংকার গুড়িয়ে ছিলেন।

বোরহান উদ্দিন আহমেদ ১৯৫১ সালের ২১ জানুয়ারি চাঁদপুর জেলার মতলব থানার কলাকান্দা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা- মরহুম ইঞ্জিনিয়ার এরফান উদ্দিন আহমদ, মাতা- মিসেস আফিয়া বেগম। তিনি মিন রাশির জাতক। ছোটকাল থেকে সরল প্রকৃতির এবং অত্যন্ত উদার স্বভাবের। ট্রেনে ভ্রমন কালে প্রায় সময়ে বিনা টিকেটে গরীব আরোহীকে টিকেটের পয়সা দিয়ে টিটির হাত থেকে রক্ষা করতেন। কোন গরীব বন্ধুর ঘরে খাওয়া না থাকলে নিজের বাসা থেকে গোপনে চাউল নিয়ে পৌছে দিতেন। ছাত্র জীবনে বহু রিকশাওয়ালাকে নিজের শার্ট বা লুঙ্গি দিয়ে দিয়েছেন। এর পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনের জন্য অথবা দুস্থদের কল্যাণের জন্য রেড ক্রসের ১০ পয়সা মূল্যের সিল বিক্রি করতে সাধারণ মানুষের নিকট যেতেন। এই সিল বিক্রীর জন্য তারা পতিতালয়েও গিয়েছেন। পতিতারা ১০ পয়সা মূল্যের সিল ৫০ পয়সা বা ১ টাকায় খরিদ করতো। মানুষের কল্যাণে তারা অংশ নিতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করত। এতে ছাত্রদের ও ভাল লাগত। ১০ টাকা মূল্যের সিল বিক্রি করে তারা ২০/৩০ টাকা সংগ্রহ করতে পারতেন। এক সময়ে এভাবেই সমাজ সেবা এবং উপনিবেশকিতার বিরুদ্ধে লড়তো এদেশের ছাত্র সমাজ।

বোরহান উদ্দিন আহমেদ যখন স্কুলে লেখা পড়ায় লিপ্ত সে সময় চলছে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন। তাঁর ছাত্র জীবনের পুরোটা সময় আন্দোলনের ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে পার হয়। ১৯৬৬ সালে ছেঙ্গারচর হাই স্কুল থেকে এস এস সি, ১৯৬৮ সালে চাঁদপুর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৭১ সালে একই কলেজ থেকে বিএ এবং ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুগোলে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে ফটোগ্রাফীতে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেন।

১৯৭১ সালে তিনি চাঁদপুর কলেজে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। এর আগে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যয়ন কালে পাকিস্তানীদের দুঃশাসন থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য যখন সাড়ে সাতকোটি বাঙালি বঙ্গবন্ধুর আহবানে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিল ছাত্র এবং যুবক বোরহান উদ্দিনও এ আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯৬৬ সালে তিনি ছাত্রলীগের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে ছাত্রলীগের মহকুমা কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র রাজনীতির কারণে ১৯৬৮ সালে একবার এবং ১৯৬৯ সালে এবং ১৯৭৬ সালে কারাবরন করেন। ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সংগে সংগে রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি একটি সুস্পষ্ট মতাদর্শ গ্রহণের পথে এগিয়ে যান। তিনি পুরোপুরি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক। ১৯৬৯ সালে তিনি চাঁদপুর মহকুমা ছাত্রলীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯৭১ সালে বোরহানউদ্দিন আহমেদ যখন চাঁদপুর কলেজে অধ্যয়নরত পিতা- এরফানউদ্দিন আহমেদ সরকারী দায়িত্বে দিনাজপুর নিজ কর্মস্থলে ছিলেন। ২৫ মার্চ গনহত্যা শুরু হলে তিনি কর্মস্থল ত্যাগ করে পায়ে হেটে নিজ গ্রামে চলে আসেন। বোরহান উদ্দিনের পিতাই তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরিত করেন।

এপ্রিল মাসের শেষদিকে তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহনের জন্য যাত্রা করেন। এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বক্সনগর ক্যাম্পে মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখান। এখানে কিছুদিন থাকার পর অন্যান্যের সাথে নৌ- যুদ্ধের জন্য সুসাইডাল স্কোয়াডে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে প্রতিষ্ঠিত নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগ দেন। এই প্রশিক্ষণ ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং ঝুকিপূর্ণ। সাধারনত উন্নত দেশগুলি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এই ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তারপরও এই কৌশল আয়ত্ত করতে একজন দক্ষ, শিক্ষিত এবং মেধাবী নাবিকের কমপক্ষে দু'বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। সেখানে মাত্র দুই থেকে তিন মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারতীয় প্রশিক্ষকরা বাঙালি যুবকদের একজন দক্ষ কমান্ডো হিসেবে গড়ে তোলেন। এজন্য তাঁদের নিয়মিত আঠারো ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়েছে।

৩১ জুলাই, প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। আগষ্ট মাসের ২ তারিখ থেকে ৭ তারিখের মাঝে ৪টি দলকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের চারটি নদী এবং সমুদ্র বন্দরে অভিযানে পাঠানো হয়। বন্দরের গুরুত্ব এবং এলাকা বিবেচনা করে কমান্ডো গ্রুপ নির্বাচিত হয়। পরিকল্পনা করা হয় ১৫ আগষ্ট মধ্যরাতের পর সমন্বিত ভাবে চট্রগ্রাম, মংলা সমুদ্র বন্দর এবং চাঁদপুর, নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরে অভিযান পরিচালিত হবে।

বোরহানউদ্দিন আহমেদ, সাবমেরীনার বদিউল আলমের নেতৃত্বে চাঁদপুর অভিযানে অংশ নেন। এই দুঃসাহসিক অভিযানে তাঁরা ডাকাতিয়া নদীতে ৬টি জাহাজ, বার্জ, পল্টুন ডুবিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

এরপর অক্টোবর মাসে সাবমেরীনার আমিনউল্লা শেখ এর নেতৃত্বে পুনরায় চাঁদপুর আসেন এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত অনেকগুলি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। কখনও কখনও তিনি একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়ে আক্রমনের সফলতা আনতে সক্ষম হন।

স্বাধীনতার পর পুনরায় ছাত্র জীবনে ফিরে যান। ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষা সমাপ্ত করে FAO (UN) এ Team Leader হিসেবে যাগদান করেন। ১৯৭৭ সালের ১৫ আগষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংক রিক্রুটমেন্ট কমিটি কর্তৃক মনোনিত হয়ে অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯৭৮ সালের ১৬ এপ্রিল জেঠাতো বোন খোদেজা বেগম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী খোদেজা বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ তে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে ইউকের বার্থ ইউনিভার্সিটি থেকে এম এস করেন। বর্তমানে পরিচালক, আই এসই ডিভিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এ দায়িত্বরত। তিনি বর্তমানে সহকারী জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে ওই ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। দুই পুত্রের জনক বোরহান উদ্দিন আহমেদ। প্রথম পুত্র আরমান আহমেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং কনিষ্ঠ পুত্র আদনান আহমেদ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। বন্ধু বৎসল এবং সদা হাস্বোজ্জ্বল ব্যক্তি হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত। তিনি চাকরি জীবনের পাশাপাশি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌ-কমাণ্ডো এসোসিয়েশন এর অর্থ সচিব হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন দেখে তিনি ব্যথিত। এজন্য তিনি জাতির হীনমন্যতা বলে মনে করেন। এখনও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা গলায় মুক্তিযুদ্ধের সনদপত্র ঝুলিয়ে রাজপথে ভিক্ষা করে, পাশাপাশি তাঁদের কল্যাণে নিয়োজিত ব্যক্তিরা পাজেরো গাড়ী চেপে ভিক্ষুক মুক্তিযোদ্ধার মুখে ধুলো ছিটিয়ে যায় এই ব্যবস্থা অবসানের পথ খোজার পরামর্শ দেন।

সকল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের সপরিবারে আমন্ত্রণ জানানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কোন সম্মানী দেয়া হয় না। অথচ তাঁদের রক্তে ভেজা দেশে একজন রাজাকার একবার এমপি হলে আজীবন ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন? দেশের অনেক প্রচলিত নিয়ম পালটালেই কেবল এদেশ আত্মমর্জাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

(তথ্যঃ মুক্তিযুদ্ধ ও নৌকমাণ্ডো অভিযান)



হাবিবুল হক, পিতা- আলী আহমেদ চৌধুরী, গ্রাম-নতুন শহর মাদারীপুর, মাদারীপুর। বর্তমান- ব্যাবস্থাপক, বিতরণ বিভাগ, তাবানী বেভারেজ, মীরপুর, ঢাকা। ১৯৭১ সালে মাদারীপুর কলেজের ছাত্রাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৬৬ সাল থেকেই তিনি ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকে দেশব্যাপী পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে মাদারীপুর শহরের বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের ছাত্ররা আওয়ামী লীগ/ সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের অধীনে আন্দোলন শুরু করে। ৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পর এই আন্দোলন সর্বোচ্চ আকার ধারন করে। ছাত্র এবং যুবকরা মাদারীপুর কলেজের মাঠে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিব এর নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করেন। এসময় তার সাথে ছিলেন, মাহবুব আহমেদ, সাজেদুল হক, শাহাবউদ্দিন ভুঁইয়া, সাইদুর রহমান প্রমুখ।

২৫ মার্চ, দেশব্যাপী পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে ষ্টুয়ার্ড মুজিব এবং আগরতলা মামলার অপর আসামী কর্ণেল শওকত আলী সহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধে লঞ্চ যোগে ২৬০ জন ছাত্র ও যুবককে সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য লঞ্চযোগে ভারতের উদ্দেশ্যে মাদারীপুর ত্যাগ করেন। মাদারীপুর থেকে তারা নোয়াখালী জেলার নীলকমল নামক স্থানে পৌঁছে ফেনী ও ছাগলনাইয়া হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সীমান্তে পৌঁছে হরিনা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন।

এখানে কিছুদিন থাকার পর নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সকল যুবককে লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ৪০ জন যুবককে মনোনীত করা হয়। হাবিবুল হক এ প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী নৌ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন। উচ্চতর বিশেষ ধরনের সাঁতার এবং স্পর্শকাতর বিস্ফোরক ও লিমপেট মাইনের ব্যবহার রপ্ত করে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় ৬০ জন কমাণ্ডোর দলভূক্ত হয়ে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে সফল অভিযান শেষে তিনি ভারতের মেঘালয় (আগরতলা) ক্যাম্পে ফিরে আসেন। এখানে মেজর হায়দার নৌ কমাণ্ডোদের অবস্থান করার জন্য একটি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাম্পটি নিউ ক্যাম্প হিসেবে পরিচিত ছিল। সেখান থেকে পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সমুহে নৌ কমাণ্ডোদের যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান করা হতো।

অক্টোবর মাসে সাবমেরীনার আবেদুর রহমান নারায়ণগঞ্জ বন্দর দ্বিতীয়বার অভিযানে যাওয়ার জন্য ভলেনটিয়ার নৌকমান্ডো খুঁজতে থাকেন। হাবিবুল হক এই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জ চলে আসেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে তিনি কয়েকটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর হাবিবুল হক শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী বীর নৌ-যোদ্ধা হাবিবুল হক জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের প্রতি জাতি এবং রাষ্ট্রের অবহেলা প্রদর্শনকে দৃষ্টান্তহীন এবং ন্যাক্করজনক মনে করেন। বর্তমানে তিনি দূরারোগ্য বোন টিবিতে আক্রান্ত।

(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২ মার্চ ২০০০)



মফিজ উদ্দিন, ১৭৫৭ থেকে ১৯৭১ দু'শ চৌদ্দ বছর বাংলাদেশ পরাধীন ছিল ইংরেজ ও পাকিস্তানীদের কাছে। বাঙালি এই দীর্ঘ সময়ের পরাধীনতা যে মুখ বুজে মেনে নিয়েছে তা নয়। অনেক প্রতিবাদ বিদ্রোহ আর আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আপন স্বকীয়তায় আবির্ভূত হবার জন্য '৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী বাহিনীর অতর্কিত অঘোষিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণও প্রতিরোধে নেমে পড়ে। সেদিন আক্রমন কেবল জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতাদের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিলনা। সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করার প্রচেষ্টা করলে নিরাপত্তার জন্য হলেও তারা পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর অনুগত বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে দাঁড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করেন। রাজনৈতিক কর্মী এবং জনগণও স্থানীয়ভাবে নিজ নিজ মতো করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ছাত্র সমাজ পাকিস্তানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিকতার সাথে রুখে দাড়ায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সাতক্ষীরা জেলার পাটকেল ঘাটার জুসখোলা গ্রামের মোঃ মফিজউদ্দিন এমনই একজন দুঃসাহসী তরুণ যিনি সাহসিকতার সাথে পাকিস্তানী আগ্রাসন প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। পিতা-মোঃ আমজাদ আলি মোড়ল গ্রামের সাধারন কৃষক। মাতা জেবুন্নেছা বেগম।

১৯৭১ সালে মফিজউদ্দিন তরুণ স্কুল ছাত্র। ডানপিটে এবং দূর্দান্ত স্বভাবের ছিলেন। ১৮ মার্চ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যশোর সেনা ছাউনি থেকে জ্বালাও পোড়াও নীতি নিয়ে সাতক্ষীরা পৌঁছে নির্মম গনহত্যা চালায়। আশ্রয়ের জন্য

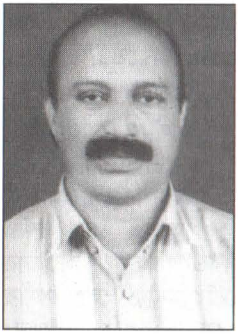
ভারত গমনকারী শত শত মহিলা পুরুষ, যুবক-যুবতী পাকবাহিনীর হাতে বন্দি এবং নির্মমতার সাথে নিহত হয়। যুবক মফিজউদ্দিন সেদিন শত্রুবাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে এই হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে তাঁর ভিতর প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে। কিন্তু খালিহাতে তো একটি সুসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্ভব নয়। তিনি বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান।

১০ মে, বনগাঁস্থ ৫নং টালিখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লেখান। এরমাত্র একসপ্তাহ বাদে ১২ মে, ভারতীয় নৌবাহিনীর রিক্রুটিং টিম কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলে যান। তিনমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। সফল অভিযান শেষে ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করেন। অক্টোবর মাসে ১৬ জন কমান্ডোর একটি দল নিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ সমীর কুমার দাস হাওড়া রেল ষ্টেশন থেকে বিহারের কটিহার হয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছেন। ১৬ জনের কমান্ডো দলকে শিলিগুড়ির এক সামরিক ঘাটিতে রেখে তিনি পরদিন আসবেন জানিয়ে যান। সেই দিনই মটর দূর্ঘটনায় দাসবাবু নিহত হন।

পরে পলাশী থেকে জুনিয়র অফিসার ইয়াদব (যাদব) সিং এসে ১৬ জনের মধ্য থেকে ৪জনকে পৃথক করে বাহাদুরাবাদ ঘাট অপারেশনের জন্য পাঠান। এই দলে ছিলেন আঃ কাদের, মফিজউদ্দিন, শাহজাহান আলম এবং আঃ মালেক। তারা গাইবান্ধা জেলার রৌমারী ভুরুঙ্গামারী থেকে বাহাদুরাবাদ আসেন। দলনেতা ছিলেন আঃ কাদের। মহেন্দ্রগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌছলে কর্ণেল নুরুন্নবী খাঁন বীর বিক্রম, আঃ কাদের সহ তার গেরিলা যোদ্ধাদের দিয়ে রেকী করান। স্থানটি ছিল কমান্ডোদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। পাকবাহিনী কিছুক্ষণ পরপর ট্রেসিং গোলা ছুড়তে থাকে। যার আলোতে নদীর উপর দিনে পরিনত হয়। এর মাঝে ৪জন কমান্ডো বহুদূর থেকে সাঁতরিয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাটে অবস্থানরত একটি ফেরী মাইন লাগিয়ে সরে পড়েন। এগুলি ছিল অতীব দুঃসাহসীকতা পূর্ণ ঘটনা। ব্রহ্মপুত্র নদীতে মাইলের পর মাইল সাঁতরানো সহজ কথা ছিলনা। তাঁর উপর চারিদিক শত্রুর টহল এবং পাহারা চৌকি ছিল। তারা বাহাদুরাবাদ ঘাটে ফেরীতে মাইন লাগিয়ে সাঁতরিয়ে মাইনকার চর যেয়ে উঠেন। এর মাঝে কমান্ডো শাহজাহান আলম প্রবল স্রোতে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

মাইন বিস্ফোরণের পর পাকবাহিনীর মেশিনগান থেকে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষন হতে থাকে কিন্তু ততক্ষণে কমান্ডোরা নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের অভিযান সফল হয়। শাহজাহান আলম তিনদিন পর ক্যাম্পে ফিরে আসেন। এরপর দেশ স্বাধীন হয়।

স্বাধীনতা উত্তর তিনি ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে দুই পুত্রের জনক।



এ. এইচ. এম. জিলানী চৌধুরী, পিতা-মৃত বুজরুচ আলম চৌধুরী। গ্রাম-মোবারক ঘোনা, ডাকঘর-মোবারক ঘোনা, থানা-মিরসরাই, চট্টগ্রাম। বর্তমান-ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, চালপট্টি শাখা, চাকতাই, চট্টগ্রাম। ১ জানুয়ারি ১৯৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএ পাশ। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন এবং ৬৯ এর ছাত্র ও গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত গমন করেন এবং মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। সেখান থেকে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে উচ্চতর কমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান। প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ আগষ্ট অপারেশন জ্যাকপটের আওতায় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তার সাথে ছিলেন ডাঃ শাহ আলম বীর উত্তম, বিধান বিশ্বাস, ফজলুল হক, জয়নাল আবেদীন কাজল, আবু বক্কর সিদ্দিক, বদিউল আলম, আবুল বশর, খোরশেদ আলম, এমদাদ হোসেন মতিন, সেলিম বাঙালি, মহিবউল্লা, কামাল প্রমুখ।

১৫ আগষ্ট তাঁরা চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি জাহাজ, গানবোট, পল্টুন, ধ্বংস করতে সমর্থ হন। অপারেশন শেষে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে যোগদান করেন। এখনও একজন দক্ষ, সৎ এবং নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসেবে উক্ত ব্যাংকে দায়িত্ব রত আছেন। বীরত্ব সূচক খেতাব প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত যারা এমন বৈষম্যমূলক সীদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন হাসরের ময়দান সৃষ্টিকর্তা সুবিচার করে এর যথাযোগ্য শাস্তি দিবেন।

(তথ্যঃ এএইচএম জিলানী চৌধুরী। তারিখ ৯ মার্চ ২০০০ এবং ভিডিও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত)



শহীদ আব্দুর রহমান, পিতা-মৃত কুদরত আলী পন্ডিত, গ্রাম-দোপল্লা, ডাক-ওয়ারুক, থানা-শাহরাস্তি, চাঁদপুর। জন্ম- ১ মার্চ ১৯২৯। হাজিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৮ সালের ২২ মার্চ তদানিন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে রাইটার পদে, ১৯৬১ সালে লিডিং রাইটার, ১৯৬২ সালে পেটি অফিসার রাইটার এবং ১৯৬৩ সালে চীফ পেটি অফিসার রাইটার পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

পাকিস্তান নৌবাহিনীতে সাপ্লাই এণ্ড সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টে দীর্ঘ ২১ বছর সুনাম ও দক্ষতার সাথে চাকরি জীবন অতিবাহিত করেন। সহকারী ডিভিশনাল অফিসার হিসেবে প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরে (প্রকিওরমেন্ট) নেভী, করাচীতে দুই বছর কর্তব্য পালন করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রতিক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন এবং ইউকে, মালটা এবং শ্রীলংকা ভ্রমন করেন।

দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি রিপাবলিক মেডেল, তামঘায়-ই-জাং, সিতারা-ই-হার্ব, এবং ১৯৬৫ সালে তামঘায় ই-দীফা পদক লাভ করেন। চীপ পেটী অফিসার হিসেবে ১৯৬৯ সালের ২৫ জুন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষনার পর তিনি স্থানীয় ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধের জন্য জনগণকে সংগঠিত করতে থাকেন। অতঃপর স্থানীয় পুলিশ আনছার, ইপিআর, ছাত্র-যুবকদের নিয়ে মুক্তিবাহিনীর দল গঠন করেন। ১৮ জুন '৭১ ওয়ারুক বাজারে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সম্মুখ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। বর্তমানে শহীদের চার পুত্র এবং দুই কন্যা জিবীত আছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র নজরুল ইসলাম (৪৫), শফিকুল ইসলাম (৪০) আব্দুল্লাহ (৩৫), সাইফুল ইসলাম (৩০), শাহিনারা বেগম (৩৮), হাসিনা বেগম (৩২)। শহীদের স্ত্রী খায়রুন নেছা।

(শহীদের পুত্র নজরুল ইসলাম সরকারী প্রমানসহ উপরোক্ত তথ্য প্রদান করেছেন ২২ মার্চ ২০০০ তারিখে)

শহীদ মোঃ খবিরুজ্জামান, বীর বিক্রম, পিতা-মৌঃ আব্দুল জব্বার। গ্রাম-বাগমারা, ডাক-খাবসপুর, থানা-পানচাট, জেলা- মাদারীপুর। পৃথিবীতে প্রতিটি জাতির গৌরবময় অধ্যায় ও ঐতিহ্য হলো তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ। সংগত কারনেই বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও পরিপর তাদের লক্ষ্য প্রানের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

১৯৫৭ সালে বাংলা স্বাধীনতা হারায় পলাশীর প্রান্তরে আর এখানেই সূচিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য চরম আত্মত্যাগের পরীক্ষা। ২৫ মার্চ, রাত্রিতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সৈনিকদের হত্যার চেষ্টা চালায়। বাঙালি যোদ্ধার জাতি না হলেও তাদের উপর জুলুম, অন্যায় এবং অবিচার তারা কখনও মেনে নেয়নি। ইতিহাসে এর অসংখ্য প্রমান আছে।

বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষনা দেয়ার পর সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকরা বিদ্রোহ ঘোষনা করে সেনানিবাস ছেড়ে চলে আসেন। এখানে হাজার হাজার প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। বাংলার দামাল যুবকরাও সশস্ত্র সৈনিকদের পাশে সহায্যকারী ভূমিকায় দণ্ডায়মান হয়।

১৯৭১ সালের ১৩ মে, পলাশীর প্রান্তর যেখানে ২০০ শত বছর আগে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, একই প্রান্তরে কয়েকশত বাঙালি যুবককে সমবেত করে জানতে চাওয়া হয় কে কে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে বাকীরা তেজদীপ্ত সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যাঁদের মাঝে ছিলেন ফরিদপুরের অকুতোভয় যুবক খবিরুজ্জামান। ছাত্রজীবন অসমাপ্ত রেখেই বন্ধুদের নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে চলে আসেন।

সেই সময় প্রবাসী সরকার স্থল বাহিনীর পাশাপাশি একটি নৌবাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যার ভিত্তি ছিল ফ্রান্স থেকে পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করে আগত আটজন বাঙালি সাবমেরীনার। তাঁদের সহযোগিতায় ভারতীয় নৌবাহিনীর সমরবীদগন পাকিস্তান নৌবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য একটি আত্মঘাতী দলের জন্ম দেন। এ ছিল চরম আত্মত্যাগ। বর্ণনা দিয়ে তা উপস্থাপন, কোন লেখক বিদগ্ধ গ্রন্থাগারিকের থাকলেও আমার নেই। কোন মা চোখে দেখে কোলের সন্তানকে পানিতে থাকা কুমীরের মুখে ছুড়ে দেয়া যতটা কঠিন, '৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি যুবকরা তার চেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করে এই স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নৌকমাণ্ডোদের ভূমিকা তার সাক্ষ্য বহন করে।

মোঃ খবিরুজ্জামান পলাশী প্রান্তরে নৌকমাণ্ডো ট্রেনিং নিয়ে ১৫ আগষ্ট প্রথম চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর অভিযানে অংশ নেন। অক্টোবর মাসে দ্বিতীয়বার তিনজন কমাণ্ডোকে পাঠানো হয় টেকেরহাট ফেরী এবং লঞ্চ ও গানবোট ডোবানোর জন্য। তাঁরা এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন মাদারীপুর সরওয়ার মোল্যার ক্যাম্পে। নৌকমাণ্ডো খবিরুজ্জামান, হাফিজুর রহমান এবং তালুকদার আব্দুস সামাদ সরওয়ার মোল্যার পূর্ব পরিচিত।

তখন রমজান মাসের শেষ দিক। সরওয়ার সাহেব তাদেরকে বলেছিলেন তোমরা অপারেশন এর আগে একবার বাড়ি থেকে মা বাবার সাথে দেখা করে এসো। কিন্তু তিনজনের কেহ সম্মত হননি। যদি মায়ের আচঁল তাদের বেঁধে ফেলে তাহলে অপারেশন হবে না। দেশের স্বাধীনতা অর্জন ব্যহত হবে। কঠিন প্রতিজ্ঞা পালনে সংকল্পবদ্ধ তিনজন তরুণ সরওয়ার মোল্যার দলের সাহায্য নিয়ে টেকের হাট অপারেশনে অংশ নেন। রেকী দলের দেয়া তথ্যানুযায়ী একটি দোতলা লঞ্চ যেখানে থাকার কথা- সেখানে ছিলনা। খবিরুজ্জামান এর সাথী হাফিজুর রহমান এবং আব্দুস সামাদ উভয়ে জানিয়েছেন 'সম্ভবত খবির পানি থেকে মাথা উপরে তুলে টার্গেট খোঁজ করছিল'। এসময় গানবোটে অবস্থানকারী পাকিস্তানী সৈনিকদের ঝাঁক-ঝাঁক গুলিতে খবিরুজ্জামানের মাথা গুড়িয়ে যায়। অকুতোভয় বাঙালি সন্তান জাতির মর্যাদা রাখতে এভাবেই তার জীবন উৎসর্গ করে গেলেন।

সদা হাস্যোজ্বল খবিরুজ্জামানের গায়ের রং ছিল কালো কিন্তু দাঁতগুলি ছিল উজ্বল সাদা। তাই এই কাল মানিক ছিলেন ক্যাম্পে সকলের পরিচিত। খবিরুজ্জামানের লাশ পাওয়া যায়নি। বন্ধু হাফিজ এবং আঃ সামাদ ক্যাম্পে ফিরে সরওয়ার সাহেবকে শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে বার বার প্রশ্ন করেছিলেন 'সরওয়ার ভাই পাকিস্তান আর্মি যখন গুলি চালালো তখন আপনার ছেলেরা গুলি না ছুঁড়ে নীরব থাকল কেন? জবাব ছিলনা সরওয়ার সাহেবের মুখে। এত আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা তার মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত কেন?' গোলাম আজমরা একাত্তরের হাসি কেন হাসতে পারছে এর জবাব কে দেবে? শহীদ খবিরুজ্জামানকে, সরকার বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করে সম্মানিত করেছেন। তাঁর সহোদর বদিউজ্জামান বর্তমানে খিলখাঁও মডেল ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ।



মো: আবু তাহের এমসিপিও (ই), পিতা-মৃত মোঃ আনোয়ারউল্লাহ। গ্রাম-সাতবাড়িয়া, পোষ্ট-মিয়াবাজার, থানা-চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা। ১৯৫১ সালের ১২ জুন নিজ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। সাতবাড়ীয়া ফ্রি প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং এস.এস.সি পাশ করার পর ১৯৬৮ সালের ১৮ জুন ডিই/ইউ সি হিসেবে তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন।

অতঃপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য করাচী গমন করেন। পি.এন.এস. 'বাহাদুর' এবং পি.এন.এস. 'কারসাজ' এ ৬ মাস ইনিশিয়াল এবং ৯ মাস এম ই-টু-কিউ ট্রেনিং সমাপ্ত করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি পি.এন.এস. বদর এ বদলি হন।

১৯৭১ সালে পিএনএস জাহাঙ্গীর শুভেচ্ছা সফরে ইন্দোনেশিয়া ছিল। আবু তাহের জাহাজের একজন ক্রু হিসেবে জাহাজে অবস্থান করছিলেন। জাকার্তার সুরাইয়া বন্দরে ২৫ মার্চ তাদের জাহাজ ভিড়ে। এখানে বাঙালি কোন নাবিককে আর ডিউটিতে দেয়া হয়নি। তাদেরকে শহরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য পাঠানো হয়। শহর থেকে ফিরে তিনি দেখেন জেটির বিপরীত দিক থেকে তাঁদের জাহাজে প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ, বোঝাই করা হচ্ছে। রাত্রে তিনি গোপনে জাহাজে অবস্থানরত অন্যান্য বাঙালি নাবিকদের বিষয়টি অবহিত করেন। ঘুমানোর পর মাঝরাতে জেগে দেখেন তাঁর বিছানার পাশে লিডিং রাইটার বেগ নামে একজন পাঞ্জাবী নাবিক ষ্টেনগান হাতে ডিউটিরত। আবু তাহের জানতে চাইলে বেগ কর্কশভাবে জানিয়ে দেয়, 'ইয়ে হুকুমত কা অর্ডার হায়'।

তখন আবু তাহের অনুধাবন করেন নিশ্চিত বাংলাদেশে কিছু একটা ঘটছে। ২৭ মার্চ বিকালে পিএনএস জাহাঙ্গীর চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে এবং সকল প্রতিরোধ উপেক্ষা করে বাফার গান থেকে গোলাবর্ষন করতে করতে বন্দরে প্রবেশ করে। এরপর জাহাজ থেকে চট্টগ্রাম সেনানিবাস এবং হালিশহর ইপিআর ক্যাম্পের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষন করতে থাকে। তখনও এম.ভি. সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামানো হচ্ছিল।

৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর বন্দি সৈনিকদের দ্বারা অস্ত্র নামানো হচ্ছিল। আবু তাহেরকে অস্ত্র খালাসে বাধ্য করা হয়। একপর্যায়ে জাহাজের মাঝে গোলাগুলি শুরু হয়। তখন আবু তাহের নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য দূরে এক পাশে সরে যান। এরপর তিনি কর্ণফুলি নদীতে বহু বাঙালি সৈনিকের লাশ ভাসতে দেখেন। বহু সৈনিককে আহত অবস্থায় কাতরাতে দেখেন। এদিন রাতেই নৌ ঘাঁটির পূর্বে গার্ড রুমের সম্মুখ থেকে

বহু বাঙালি সৈনিককে কর্ণফুলির মোহনায় নিয়ে গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে পেট চিরে নদীতে ফেলে দেয়। বহু বেসামরিক লোকদের ধরে এনে গার্ড রুমের পিছনের ঝোপের মধ্যে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর নিয়মিত অনেক বাঙালিকে ধরে এনে একইভাবে এখানে হত্যা করা হতো।

গার্ড রুমের পিছনে একটি জেনারেটর ছিল। সেখান থেকে এরিয়া কমাণ্ডারের অফিস এবং সিগন্যাল সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। আবু তাহের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন ক্রু হওয়াতে তাঁকে ৩ জন অবাঙালি স্কটের অধীনে এই জেনারেটর চালাতে বাধ্য করা হয়। তিনি একটা উচুঁ টেবিলের উপর বসে ডিউটি করতেন। সেখান থেকে খোলা জানালা দিয়ে পাকিস্তানীদের নির্মমতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। অসয্য যন্ত্রনায় পিপাসায় কেউ পানি চাইলে জল্লাদরা কাপে প্রস্রাব করে তার মুখে ঢেলে দিত। বলত- 'পিয় সরাবন তহুরা'। দিনভর অসংখ্য লোককে হত্যা করা হতো। রাতে এসব মৃত অথবা অর্ধমৃত লাশ ট্রাকে করে ভাটার সময় কর্ণফুলির মোহনায় ফেলে দিত।

এর মাঝে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সৈনিককে তিনি মুখে বেয়নেটের আঘাতে আহত অবস্থায় আনতে দেখেছেন। একইভাবে তাকে রাতে সাগরে ফেলে আসে। ১০ ডিসেম্বর আবু তাহের খুলনায় গানবোটে বোমার আঘাতে আহত হয়ে ভারত থেকে চিকিৎসা নিয়ে দেশে ফিরে ঢাকা সি এম এইচ'এ সার্জিক্যাল স্পেশালিষ্ট এর নিকট গেলে তিনি ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের উক্ত সৈনিককে যার ডান গালে বেয়নেটের আঘাতের ক্ষত ছিল তার সাক্ষাত পান। তিনি এবং আবু তাহের একই টেবিলে বসেন। আবু তাহের তার নিকট থেকে জানেন সাগরে ফেলে দিলে তিনি ভাসতে ভাসতে সাগরের কিনারায় চলে যান। পরদিন জেলেরা তাকে উদ্ধার করে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার এর সাহায্যে লতা পাতা দিয়ে চিকিৎসা করে কিছুটা সুস্থ করে তোলে। স্বাধীনতার পর রেড ক্রসের সাহায্যে বুলগেরিয়া থেকে চিকিৎসা নিয়ে দেশে ফেরেন।

আবু তাহের জেনারেটর রুমে ডিউটি রত অবস্থায় আর একজন যুবককে দেখেছেন। তাকে ইঞ্জিন লিফটিং ষ্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে ২ হাতে ৮টা করে ১৬টা ইট বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করে। কিন্তু এই যুবক মুখে 'জয় বাংলা' ধ্বনী উচ্চারণ করে কলেমা পড়তে পড়তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

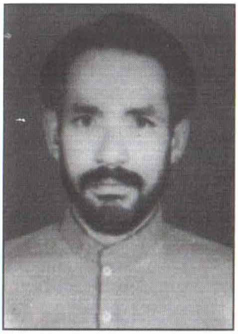
পাকিস্তানীদের এই নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখে আবু তাহের তাঁর সহকর্মী রুহুল আমিন তালুকদার এম ই-১, এর সাথে গোপনে সেখান থেকে পালানোর পরিকল্পনা করতে থাকেন। ২০ এপ্রিল উভয়ে চট্টগ্রাম নৌঘাঁটি থেকে পালিয়ে নয় দিন পায়ে হেঁটে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে তার নিজের বাড়িতে পৌঁছেন।

বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয় তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের মেঘালয় ক্যাম্পে যোগদান করেন।

আগষ্ট মাসের শেষ দিকে তিনি কলকাতার খিদিরপুর 'গার্ডেন রীচ ডক ইয়ার্ডে' (মডিফাইড) গানবোর্টে যোগদানের জন্য সাথী এদের সাথে মিলিত হন। নভেম্বর মাসে এই গানবোটের সাহায্যে তারা প্রথম মংলা বন্দরের প্রবেশ মুখে ৮টি গ্রাউণ্ড মাইন স্থাপন করেন। ১০ ডিসেম্বর 'পদ্মা' এবং 'পলাশ' খুলনা অভিযানকালে জংগী বিমানের বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। আবু তাহের মারাত্মক ভাবে আহত হন। তার দুই হাতের কব্জি শেলের আঘাতে নষ্ট হয়। ১০টি দাঁত পড়ে যায়। মুখের অর্ধেক মাংস কেটে যায়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ৪০টি'র বেশি গুলির আঘাত লাগে। এই অবস্থায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হন। ১৬ ডিসেম্বরের পর তিনি মুক্তি পান এবং চিকিৎসার জন্য ভারতীয় সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হন।

এরপর মেডিকেল ক্যাটাগরী সি (স্থায়ী) হিসাবে চট্টগ্রাম নৌঘাঁটিতে (ষ্টোরে) কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

(তথ্যঃ জনাব আবু তাহের, তারিখঃ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯)

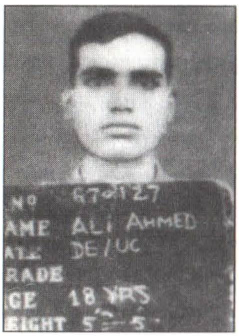


এস.এম. খলিলুল্লাহ, পিতা-মৃত আব্দুল গণি মোল্লা, গ্রাম-কাচারীকান্দী, ডাক-মধ্যনগর, থানা-রায়পুরা, জেলা-নরসিংদী। জন্ম-১৩ আগষ্ট ১৯৫৪ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা-কৃষি ডিপ্লোমা। বর্তমান কর্মস্থল থানা কৃষি অফিস, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

১৯৭১ সালে নবম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ছিলেন। সেসময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে গণআন্দোলনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে তিনি ছাত্র যুবকদের সাথে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি ৭ জন বন্ধুসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের আগরতলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখানে বাংলাদেশের অনেক ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ পান। একমাস এখানে থাকার পর মেঘালয় ক্যাম্পে চলে যান। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখানে তিনমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ৭ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য ৬০ জন কমাণ্ডো দলে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দরে তারা ৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন। নৌকমাণ্ডোদের এই দুঃসাহসীক অভিযান বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টি করে। অপারেশনে দলনেতা ছিলেন সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ বীর প্রতীক।

অক্টোবর মাসে সাবমেরীনার বদিউল আলম বীর উত্তম এর নেতৃত্বে ৪০ জন কমাণ্ডোর সাথে পুণরায় মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং ডিসেম্বর মাস অবধি অত্র এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে অনেকগুলি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কোন কোন যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন। এছাড়া আশাশুনি, পাইকগাছা, দাকোপ, কপিলমুনিতে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে নাল শিরা জাহাজ দখল করার জন্য এল.এম.জি. হাতে নিয়ে তিনি প্রথম জাহাজের উপর উঠেন এরপর বশির আহমদ, আঃ গফুর ও অন্যান্য কমাণ্ডোরা জাহাজে উঠেন। স্বাধীনতার ২২ বছর পর গাজী রহমতউল্লাহ সাহেবের স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি পেয়ে তিনি দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার আনন্দ অনুভব করেন। তিনি বর্তমানে হৃদরোগে আক্রান্ত। অর্থাভাবে সুবিচিৎসা করতে পারছেন না।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



শহীদ আলী আহমদ এমই-১, পিতা-আব্দুর রব। জন্ম-০৩ জানুয়ারি ১৯৪৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা-এস.এস.সি পাশ। ১৯৬৭ সালে চট্রগ্রামে তদানিন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। প্রথম ৩ মাস চট্রগ্রামে-পরে করাচীতে ৬ মাস বেসিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ১০/১৫ তারিখ তিনি করাচী কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে নিজ বাড়িতে আসেন। ২৮ মার্চ, মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। ৩ অক্টোবর '৭১ রামগতি থানার অধীন কড়ইতলা (চর লরেন্স) নামক স্থানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক সম্মুখ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। একই যুদ্ধে মুস্তাফিজুর রহমান নামে তাঁর অপর সাথী ও শহীদ হন। শহীদ আলী আহমদ এর লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই যুদ্ধে স্হানীয় ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বর আঃ খালেক, শাহ আলম পাটওয়ারী এবং তোরাবগঞ্জ গ্রামের আবু মাষ্টার (মৃত) পাকিস্তানীদের সহযোগী ছিল।

(তথ্যঃ প্রদান করেছেন আবুল বাসার শহীদের ভ্রাতা ২৩ মার্চ ২০০০)



শেখ মহসীন আলী, পিতা-শেখ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ গ্রাম-গদাই পুর, পোস্ট-গদাই পুর, থানা-পাইকগাছা, জেলা-খুলনা। ১৯৬৯ সালে খুলনা সহ দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন যখন পাকিস্তানী শাসককুলের বিরুদ্ধে চরম আকার ধারণ করে তখন শেখ মহসীন আলী খুলনা এম এম সিটি কলেজের একজন তুখোড় ছাত্রনেতা হিসেবে সকল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব প্রদান করেন।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষনা করলে সারা দেশের ছাত্র, জনতা, শ্রমিক বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। ৩ মার্চ, খুলনা শহরে ছাত্র জনতার এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করলে ৭ জন শহীদ এবং অসংখ্য লোক আহত হয়। শেখ মহসীন আলী এই মিছিলে ছিলেন।

তখন খুলনার আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক ছিলেন কর্ণেল শামস। তিনি এক কোম্পানী সৈনিকসহ খুলনা সার্কিট হাউসে অবস্থান করছিলেন। কর্ণেল শামসকে তার সৈনিকদের যশোর সেনানিবাসে ফেরত নেওয়ার জন্য আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দসহ ছাত্ররা জোর দাবি জানান। এর সাথে তৎকালীন খুলনা জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার সম্পুর্ণ সহযোগিতা করেন। কিন্তু কর্ণেল শামস্ সেনাবাহিনী ফেরত নেয়ার পরিবর্তে ২৭ মার্চ যশোর থেকে খুলনাতে আরও সৈন্য সমাবেশ ঘটান।

যশোর থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশাল কনভয় খুলনা আসতে থাকলে জনতা, শ্রমিক, পুলিশ, আনসার, ইপিআর তাদেরকে খুলনা যশোর সড়কের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সবচেয়ে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় খুলনার বৈকালী সিনেমা হলের সম্মুখে। এখানে ছাত্র জনতা, পুলিশ, আনসার সামান্য অস্ত্র নিয়ে দিনব্যাপী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে. যায়। বিকাল ৪টা নাগাদ তাদের গুলি শেষ হয়ে এলে তাঁরা পিছু হটে যেতে বাধ্য হন। এখানে শহীদ হন পুলিশের সিপাহী মোজাম্মেল হক এবং জনতার মাঝে একজন। শেখ মহসীন আলী এই যুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

এরপর পাকবাহিনী খূলনা শহরে প্রবেশ করে সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখল করে নেয়। তৎকালে গল্লামারীতে অবস্থানরত রেডিও ষ্টেশনও পাকবাহিনী দখল

গ্রহণ করে। ৫ এপ্রিল মেজর জলিল সমন্বিত, পুলিশ, ইপিআর ছাত্রদের নিয়ে গল্লামারী রেডিও ষ্টেশন দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মেজর জলিলের সাথে সে সময় সহযোগিতাকারীদের মাঝে ছিলেন খুলনার ছাত্র নেতৃবৃন্দ। রূপসা নদীর অপর পারে নৈহাটী স্কুলে বসে খুলনা রেডিও ষ্টেশন দখলের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। শেখ মহসীন আলীও এই আলোচনা সভায় ছিলেন এবং ৭ই এপ্রিল খুলনা রেডিও ষ্টেশন দখল অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু মেজর জলিল এবং মুক্তিযোদ্ধারা রেডিও ষ্টেশনের দখল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন।

শেখ মহসীন আলী এরপর আর দেশের অভ্যন্তরে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে মেজর জলিলের সাথে ভারত গমন করেন। এপ্রিল মাসে ভারত পৌঁছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এই সময় ৮নং সেক্টর কমাণ্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরী মেজর জলিলকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেন। মেজর জলিল এই অস্ত্র দুটি লঞ্চে ভরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময়ে সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণে গাবুরা গ্রামে পাকিস্তান নৌবাহিনীর গানবোট দ্বারা আক্রান্ত হন। উক্ত গ্রামের পাকিস্তানী দালাল জনৈক সোহ্‌রাব আলী পাকিস্তানীদের নিকট মুক্তিবাহিনীর আগমনের খবর পৌঁছে দেয়। শেখ মহসীন আলী উক্ত লঞ্চে মেজর জলিলের সাথে ছিলেন। উভয় পক্ষের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর লঞ্চ দুটি বিধ্বস্ত হলে তিনি সাঁতরিয়ে কিনারে উঠে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন এবং পুণরায় ভারতের টাকি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ফিরে যান। যুদ্ধে পাকবাহিনীর একটি গান বোটও বিধ্বস্ত হয়।

১২ মে এই ক্যাম্প থেকে উচ্চতর নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় ৪০০০ যুবকের মধ্য থেকে মাত্র ৮৫ জন মনোনীত হন। শেখ মহসীন আলীও তাঁদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখানে ৩ মাস কঠোর এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিস্ফোরকের উপর (কমাণ্ডো) প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ১৫ই আগষ্ট, অপারেশন জ্যাকপটের অধীন মংলা সমুদ্র বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

সে দিনের সফল অভিযান শেষে নৌকমাণ্ডো দল সুতারখালী গ্রামে ফিরে আসে। এরপর নিরাপত্তার জন্য প্রেরিত স্থল বাহিনীর গেরিলা কমাণ্ডার খিজির আলী এবং আফজাল ও আনোয়ারের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। খিজির আলী আর ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে রাজী ছিলেন না। অন্যদিকে আফজাল এবং আনোয়ার বন বিভাগের দুটি লঞ্চ দখল করে যোদ্ধাদের একটি অংশ সাথে নিয়ে সকল ফরেষ্ট অফিসগুলিতে হানা দিতে থাকে। এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে শেখ মহসীন আলী সহ ৭ জন নৌকমাণ্ডো স্থলপথে পায়ে হেঁটে ভারতে

ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরুর পর প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে একটি নৌকা ভাড়া করলেন ভারতের পথে আশাশুনি পৌঁছানোর জন্য। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে মাঝি আশাশুনি যাওয়ার জন্য নদীতে প্রবেশ না করে ভুল করে ডানদিকে সাতক্ষীরা শহর অভিমুখে রওয়না হয়। পথিমধ্যে তাদের দলটি শত্রুর এ্যাম্বুশে পড়ে আফতাবউদ্দিন এবং সিরাজুল ইসলাম ২ জন কমাণ্ডো শহীদ এবং ইমামবারী, মুজিবুর রহমান, ইমদাদুল হক ও খলিলুর রহমান ৪ জন শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দি হন।

শেখ মহসীন আলী অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তিনি ভারতে ফিরে গেলে চিকিৎসার জন্য তাকে ফোর্ট উইলিয়ামে পাঠানো হয়। একমাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে পুণরায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি হাত থেকে অস্ত্র ফেলেননি। স্বাধীনতার পর ছাত্র জীবনে ফিরে যান এবং এল.এল.বি. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আওয়ামী লীগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। বর্তমানেও আছেন। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমাণ্ডো এসোসিয়েশনের আইন বিষয়ক সম্পাদক।

(সূত্র ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার এবং মৌখিক বর্ণনা থেকে গ্রন্থিত)



মোঃ আব্দুল হাকিম পাটওয়ারী, বীর প্রতীক (৬-১১-১৯৪৪), পিতা- মৃত মোঃ সোনা মিয়া পাটওয়ারী। গ্রাম-মদনের গাঁ, পোষ্ট চান্দ্রা, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা-চাঁদপুর। এইচ.এস.সি পাশ।

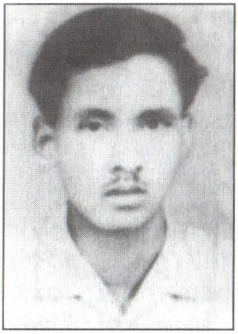
১৯৬৪ সালের ২৬শে জুন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। প্রশিক্ষণের জন্য করাচী গমন করেন। পিএনএস বাহাদুর এ প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পাকিস্তান নৌবাহিনীর বিভিন্ন স্থানে চাকরি করেন। ১৯৭১ সালে দু'মাসের বাৎসরিক ছুটিতে তিনি দেশে আসেন। ২৩ মার্চ, ছুটি শেষে তিনি চাকুরীস্থলে যোগদানের জন্য পিআইএ'র বিমানে উঠেন কিন্তু বিমানের মাঝে আর কোন বাঙালি ছিলনা। বাকী সব যাত্রীর চোখে মুখে আতংকের অনুভূতি দেখে তিনি জিনিস খরিদের কথা বলে বিমান থেকে নেমে শহরে চলে আসেন। এরপর স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

২৫ মার্চের পর তিনি আগরতলা ক্যাম্পে যোগ দেন। জুন মাসের মাঝামাঝি তিনিসহ নৌবাহিনীর ৮ জন নাবিককে পলাশী নৌ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পাঠানো হয়। ট্রেনিং সমাপ্তির পর তিনি ১৫ আগষ্ট চাঁদপুর বন্দরে উপ দলনেতা হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেন সাবমেরীনার বদিউল আলম। চাঁদপুর নদী বন্দরে অভিযানকালে শত্রুবাহিনী তাকে দেখে ফেললে তিনি মেঘনা নদীতে সাত মাইল সাঁতরিয়ে বশীর হাটের চরে এসে উঠেন। সেখানে জনগণ ভয়ে তাঁকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। জেলের বেশ ধরে তিনি বহু কষ্টে মূল দলের সাথে মিলিত হন।

অক্টোবর মাসে পুণরায় সাবমেরীনার আমিন উল্লাহ্ শেখ বীর বিক্রম, এর সাথে চাঁদপুর বন্দর অভিযানে অংশ নেন। ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। আগষ্ট মাসে চাঁদপুর নৌবন্দর অভিযানকালে নৌকমান্ডোদের আশ্রয়স্থল ছিল আব্দুল করিম খার বাড়ী। পরবর্তী সময়ে আশ্রয় দেন এখলাসপুরের মরহুম আব্দুল মান্নান হেড মাষ্টার, ঢাকা নব কুমার হাই স্কুল, মরহুম হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ, প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তা, এখলাসপুর, নাওভাঙ্গা গ্রামের এডভোকেট কামাল উদ্দিন, সুকন্দী গ্রামের প্রাক্তন মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব:) ডা: সামছুল হক সাহেবের বাড়ীতে। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সরকার তাঁকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৮৭ সালের ২৬ জুন এল/এস হিসেবে নৌ বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে নিজ বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করছেন।

(সূত্রঃ তিনি এই তথ্য প্রদান করেন, তারিখঃ ১০ আগষ্ট ১৯৯৩)



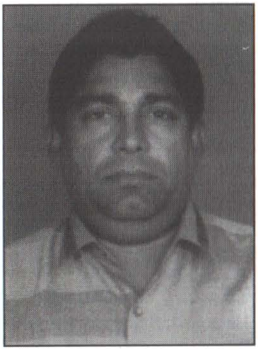
শহীদ বদিউজ্জামান ডিই/ইউসি, পিতা-মোঃ ফজলুল হক। গ্রাম-কালিনগর, পোষ্ট-বাঘবেড়, থানা-নালিতাবাড়ী, জেলা-শেরপুর। ১৯৫২ সালের ১ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। রানীগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৯৬২ সালে নকলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি পাশ করার পর তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ৬০ দিনের বাৎসরিক ছুটি নিয়ে নিজ গ্রামে চলে আসেন। ২৫ মার্চ এর পূর্বে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ থাকলেও দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনি আর কর্মস্থলে ফিরে যাননি।

২৫ মার্চ ১৯৭১, স্বাধীনতা ঘোষনা হওয়ার পর তিনি এলাকার যুব সম্প্রদায়কে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্ধুদ্ধ করতে থাকেন। নিজ এলাকায় সন্ত্রাষীদের দ্বারা লুটপাট ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

এক সময় শেরপুর জেলা, পাকিস্তানী সৈন্যদের দখলে চলে যায়। তারা ঝিনাইগাতী থানার অধীন আহমদ নগরে ঘাঁটি স্থাপন করে। ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা সংঘটিত হয়ে আহমদনগর ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ক্যাম্পের অবস্থা পর্যবেক্ষনের জন্য বদিউজ্জামান, ১৫ই আষাঢ়-রাতে, আহমদনগর গ্রামের জনৈক মেম্বার সাহেবের বাড়িতে এসে উঠেন। রাত আনুমানিক ১০টার সময় স্থানীয় রাজাকার ও আলবদরদের সহযোগিতায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী সমগ্র বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তথ্য বের করার জন্য দিনভর বদিউজ্জামান এর উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। একদিন পর ১৭ আগষ্ট তাঁকে আহমদ নগর ক্যাম্পের অভ্যন্তরে গুলি করে হত্যা করে তাঁর লাশ রাস্তার পাশে ফেলে রাখে। কিন্তু শহীদ বদিউজ্জামান এর লাশ আনতে কেউ সাহস পায়নি। হানাদাররাই রাস্তার পাশে শহীদ বদিউজ্জামানকে মাটি চাপা দিয়ে রাখে। আজ সেই কবরস্থানের কোন চিহ্নমাত্র নেই। দু:খজনক হলো স্বাধীনতার আড়াই যুগের মাঝে কোন ব্যক্তি শহীদ এর পরিবারের খোঁজ খবর নেয়নি।

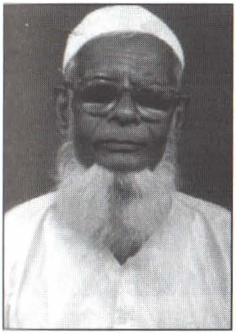
(সূত্রঃশহীদের ভ্রাতা আনছারুজ্জামান এই বর্ণনা দিয়েছেন. তারিখঃ ২০ মার্চ ২০০০)



কমাণ্ডো সাজেদুল হক (চুন্নু), ১৯৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন দুঃসাহসিক যোদ্ধা। বাবা খান বাহাদুর আলিমউদ্দিন। সাজেদ তখন বিএ পাশ করেছেন। মাদারীপুর শহরেও তখন উত্তাল আন্দোলন চলছে। ২৫ মার্চ রাত ১টা, সহপাঠী হাবিবুল হক এসে তাঁকে জানালেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পুলিশ লাইনের ওয়ারলেসে শত শত মানুষ এই ঘোষনা শুনছে। ঢাকায় পাকিস্তানী সৈন্যরা গণহত্যা চালাচ্ছে। সশস্ত্র বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছে বলে জানানো হচ্ছে। ওয়ারলেসে খুব ক্ষীন কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, সকল বাঙালি সৈনিক, পুলিশ, ইপিআর কে ব্যারাক ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসার আহবান জানানো হচ্ছে। তখন মাদারীপুর এসডিও ছিলেন জনাব সৈয়দ রেজাউল হায়াত, বর্তমানে সচিব। পরদিন ২৬ মার্চ এলাকার যুবক এবং আনসার বাহিনীর কতিপয় সদস্যের সহযোগিতায় ৩০৩ রাইফেল নিয়ে মাদারীপুর গার্লস হাই স্কুল মাঠে এবং নাজিমউদ্দিন কলেজের মাঠেও প্রশিক্ষণ শুরু করেন। ২৬০ জন যুবকের প্রশিক্ষণ এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ষ্টুয়ার্ড মুজিব।

প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ষ্টুয়ার্ড মুজিব ১৮ এপ্রিল ২৬০ জন যুবকের সম্পুর্ণ দল নিয়ে লঞ্চ যোগে ভারতের উদ্দেশ্যে মাদারীপুর ত্যাগ করেন। সাজেদুল হক এই দলের অন্যতম সদস্য। এরপর তারা ভারতের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদেন। জুন মাসের ৩ তারিখ সাবেগ সিং ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে ১৫/২০ জন যুবককে মুর্শিদাবাদের পলাশী নৌ-কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে পাঠান। এখানে ৩ মাস প্রশিক্ষণ শেষে তাঁকে চট্রগ্রাম বন্দরে অপারেশনের জন্য পাঠানো হয়। চট্রগ্রাম বন্দর অভিযান শেষে তিনি ভারত প্রত্যাবর্তন করেন। বর্তমানে তিনি লতিফ বাওয়ানী মিলের ক্রয় কর্মকর্তা।

(সূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধ ও নৌকমাণ্ডো অভিযান পৃঃ ২২৮-২৩০)



মোঃ নজরুল ইসলাম, পিতা-মৃত হাসমতউল্লাহ। গ্রাম- পাঁচবাড়িয়া, থানা-বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। জন্ম- ১৯৩৮ সালের ১১ মার্চ। শিক্ষাগত যোগ্যতা- এস.এস.সি পাশ।

১৯৫৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে বয়েজ নেভীতে ভর্তি হয়ে তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীর জাহাজ বাহাদুর, জুলফিকার, হিমালয়া ও বাবর' এ সীম্যানশীপ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। ১৯৭১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পিএনএস তুঘরিল থেকে ২ মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন ময়নামতি সেনানিবাসে বাঙালিদের উপর আক্রমণ চালায় গোলাগুলির আওয়াজ তিনি বাড়ি থেকে শুনতে পান। গ্রামের অনেক ছাত্র যুবক জনতা তাঁর বাড়িতে ভিড় করে এবং এই পরিস্থিতিতে কি করণীয় জানতে চায়। তিনি সকলকে ধৈর্য্য ধরতে বলেন। এই বলে বোঝান যে, গুলির জবাব গুলি ছাড়া দেয়া যায়না। সকলে ফিরে গেলেন।

পরদিন সকাল থেকে তিনি চারিদিকে খোঁজ নিয়ে ৪/৫ জন সেনাবাহিনীর সদস্যের সাক্ষাৎ পেলেন। ২৭ তারিখ তিনি সেনাসদস্যসহ ভারতে চলে যান। নজরুল ইসলামের বাড়ি থেকে সীমান্ত অতি নিকটে। সোনামুড়া পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে, বিএসএফ ক্যাম্পে কয়েকজন বাঙালি সৈনিক আছেন। তাঁরা সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্যাপ্টেন মতিন সাহেবের সাক্ষাৎ পান।

১৪ এপ্রিল, ক্যাপ্টেন মতিন মাত্র ১৩/১৪ জন আর্মি ও বিডিআর সদস্যসহ একমাত্র নৌবাহিনীর নজরুল ইসলামকে, হাবিলদার তাহের এর নেতৃত্বে চান্দিনা ব্রিজ ভাঙ্গার জন্য ভারত থেকে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে পাঠান। সেদিন রাতে তাঁরা চান্দিনা ব্রিজ ভেঙ্গে পাশ্ববর্তী এক হিন্দু বাড়িতে আশ্রয় নেন। সকালে পাকবাহিনী এসে সমগ্র গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ৫ থেকে ৬ গাড়ী সেনাবাহিনী যখন উন্মত্ত অবস্থায় অগ্নি সংযোগ আর লুটপাটে ব্যস্ত তখন ১৪ জন বাঙালি সৈনিক ৩ দিক থেকে পাকিস্তান বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে থাকে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। ৫টা নাগাদ কোথা থেকে হাজার হাজার জনতা তাঁদের পিছনে এসে শ্লোগান দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে উৎসাহ দিতে থাকে। পাকবাহিনী অবরুদ্ধ হওয়ার আশংকায় ৫টার পর কভারিং ফায়ার দিতে দিতে পিছনে হটে যায়। তাদের অসংখ্য লাশ পড়ে থাকে।

বিজয়ের আনন্দে গ্রামবাসী তাঁদেরকে ডাব, মুড়ি, নানা ধরনের খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করতে থাকে। যুদ্ধ চলাকালীন একজন সদস্য হাত উচুঁ করে ''জয়

বাংলা'' বলাতে পাকিস্তানীদের এক ঝাঁক গুলি তাঁর হাত ভেদ করে যায়। এছাড়া যুদ্ধের সময় আরও একজন ইপিআর সদস্য আহত হন কিন্তু যুদ্ধে কোন জীবনহানী ঘটেনি।

এরপর তাঁরা ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে ইলিয়টগঞ্জ ব্রিজ উড়িয়ে দেন। এখান থেকে তাঁরা গোমতী নদীর পাড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মাত্র ১২ জন বাঙালি সৈনিক সারাদিন যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন মতিন কোনভাবে এই সংবাদ জেনে তাঁদের সাহায্য করার জন্য বিকালে আরও একদল সৈন্য পাঠান। নতুন মুক্তিযোদ্ধারা যুক্ত হওয়ায় তাঁদের মনোবল এবং শক্তি অনেকগুন বেড়ে যায়। পাকবাহিনী সম্মুখ সমরে টিকতে না পেরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। বিবির বাজার যুদ্ধে তাঁদের দলের একজন ইপিআর সদস্য শহীদ হন।

সেপ্টেম্বর মাসে ৯১ বিএসএফ ক্যাম্পে নৌবাহিনীর কিছু সদস্য একত্রিত হন। মেজর মতিন নজরুল ইসলামকে ৯১ বিএসএফ ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেন। অক্টোবর মাসে মেজর হায়দার তাকে ভলেনটিয়ার হিসাবে নৌকমাণ্ডো দলের সাথে চাঁদপুর অপারেশনে পাঠিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল নৌকমাণ্ডো অপারেশন পর্যবেক্ষন করা। ফিরে আসার পর মেজর হায়দার তাকে প্রশিক্ষক নিযুক্ত করে ৬৫ জন ঢাকার ছেলেকে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হরিনা ক্যাম্পের পাশ্ববর্তী পুকুরে সাঁতার কাটা এবং জাহাজে মাইন স্থাপনের ট্রেনিং দিতে বললেন। ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত নজরুল ইসলাম ৬৫ জন যুবককে ট্রেনিং দিয়ে ঐদিনই মেজর হায়দার এর সাথে ঢাকা চলে আসেন।

স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে তিনি বীরত্ব সূচক Liberation Star, Camping Star, War Medal, Victory Medal এবং ১৯৭২ সালে Constitution Medal লাভ করেন। ১৯৮৪ সালের ৬ জানুয়ারি পেটি অফিসার হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

(সূত্রঃ তিনি তাঁর যুদ্ধের বর্ণনা দেন, তারিখঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০)



কমাণ্ডো মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, পিতা হাজী আবুল বশর ছিলেন কাষ্টমের অফিসার। '৭১ সালে চট্রগ্রাম সিটি কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র সিদ্দিক ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। সে সময় দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন চলছে।

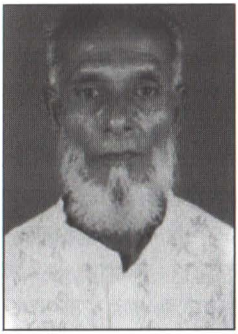
২৫ মার্চ '৭১ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙালি নিধন অভিযানে। বঙ্গবন্ধু শত্রুর হাতে বন্দি হন। বঙ্গবন্ধু ঘোষনা দেন স্বাধীনতা যুদ্ধের। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। সিদ্দিক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাবলেন নিরস্ত্র অবস্থায় শৃগাল কুকুরের মত কেন মরব। মরতে হয় তাদের মেরেই মরব।

তখন এপ্রিলের শেষভাগ। দুই ভাই গিয়ে উঠলেন ভারতের জয় বাংলা অফিসে। সেখানের কর্তব্যরত ব্যক্তিগণ তাদের পাঠিয়ে দেন হরিনা ক্যাম্পে। এখানে তিনি গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ অবস্থায় মে মাসে ভারতীয় নৌবাহিনীর তিনজন কর্মকর্তা এসে হাজির হলেন, জানালেন নৌ প্রাশিক্ষণের জন্য লোক বাছাই করবেন। তিনিসহ ত্রিশজন নিয়োগ পেলেন। নিয়ে যাওয়া হল পলাশীর প্রান্তরে। পলাশীর আম্রকানন ঘেষেই ক্যাম্প। শপথ বাক্য পাঠ ও সুসাইডাল বণ্ড এ স্বাক্ষর নামার মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রশিক্ষণ। আগষ্ট এর প্রথম সপ্তায় প্রশিক্ষণ শেষ হয়। প্রশিক্ষণ শেষে এবার অপারেশন এর জন্য যাত্রা। অপারেশন জোনকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দর তাদের অপারেশন পয়েন্ট। চট্টগ্রাম দলে ২০ জন করে তিনটি দলে ৬০ জনের একটা গ্রুপ। তিনি ২০ জন নৌকমাণ্ডোর একটা গ্রুপের ডেপুটি কমাণ্ডার। এ ডব্লিউ চৌধুরী সকল গ্রুপের সার্বিক দায়িত্বে। বর্ডার ক্রস করার পূর্বে কমাণ্ডোদের সকলকে হস্তান্তর করা হল প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সামগ্রী। তাদের দলটি বর্ডার ক্রস করে তাইয়াবাড়ি হয়ে ছাগলনাইয়া বুরবুরে হাট পৌছেন। বুরবুরে হাট থেকে নৌকা যোগে মিরসরাই এর শাহেরখালি এসে পৌছে। শাহেরখালি থেকে বড় দারগারহাট হয়ে শুভপুর। এখান থেকে বাসযোগে শহরের নন্দন কানন পৌছেন। নন্দনকানন থেকে সবুজবাগ। সবুজবাগে তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন জালাল কমিশনার এবং এমপি ইছহাক মিয়া। ১৩ আগষ্ট স্থানীয় সেল্টার দাতারা তাদের কারখানার ওয়ার্কার হিসেবে আইডি কার্ড তৈরি করে দেন। এ সুবাদে দলটি সবুজবাগ থেকে বাংলাবাজার খেয়াঘাট হয়ে নদীর ওপারে চরলক্ষ্যা গ্রামে গিয়ে পৌছেন। এখানে স্থানীয় কর্মী যথাক্রমে কালা মিয়া সওদাগর, ইউনুস, ছকির আহামদ, মাহফুজের বাবা সহ অনেকে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

১৫ আগষ্ট রাত ১২টা বাজতেই তারা নেমে পড়লেন কর্ণফুলীর বুকে। এক একটি জাহাজের জন্য তিনজন কমাণ্ডো। তার দলে তিনি, যশোর এর শওকত ও ফরিদপুরের আমিন। তাদের টার্গেট ওরিয়েন্ট বার্জ। ৭নং জেটিতে নোঙ্গর করা ছিল। সাথী বন্ধুদের নিয়ে নিস্তব্ধতার মাঝে সাঁতরিয়ে পৌঁছে যান জাহাজের গায়ে। পায়ে ফিনস্ লাগানো সুতরাং সাঁতারের সময় কোন শব্দ হয়না। একেবারে নিরবে নিস্তব্ধে বুকে বাঁধা মাইন খুলে জাহাজের সামনে মাঝে ও পেছনে তিনজনে তিনটা মাইন স্থাপন করে দিলেন। টাইমিং সেট করা ছিল। নদীর ওপারে তীরে পৌঁছতেই গর্জে উঠল তাঁদের স্থাপিত মাইন। জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। বিরাট তিনটা হোল হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তাদের চোখের সামনেই ডুবে গেল ওরিয়েন্ট বার্জ। পূর্ব নির্ধারিত ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী ফিরে গেলেন ভারতের মাদার ক্যাম্পে। ক্যাম্পে এসে এবার দ্বিতীয় ব্যাচে রিক্রুটেড কমাণ্ডোদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য অন্যান্যদের সাথ সিদ্দিক ও নিযুক্ত হলেন।

১ মাস প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর দ্বিতীয়বার অপারেশন করার জন্য চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এবার দলে বিশজন সদস্য। তিনি দলীয় কমাণ্ডার। এ সময় রাস্তাঘাটে অনেক কড়াকড়ি। চট্রগ্রাম পৌঁছতে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের। এবার চট্রগ্রাম কদমতলীতে এসে উঠলেন। এখানে তাঁদের আশ্রয় দেন জাহাঙ্গীর ও লোকমান গনি। তাঁদের সহযোগিতায় বাংলাবাজার খেয়াঘাট দিয়ে নদীর ওপারে কই গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কই গ্রাম বন্দরের বিপরীতে। রেকী করে দেখলেন তখন বন্দরে কোন জাহাজ নেই। শুধু একটি তেলবাহী জাহাজ কর্ণফুলীর মাঝামাঝি অবস্থানে নোঙ্গর করে আছে। জাহাজটির নাম এমভি টেকনাফ। ১৮ নভেম্বর, তিনি সাথী দুই বন্ধুকে নিয়ে নেমে পড়লেন কর্ণফুলীর বুকে। খুব সাবধানতার সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পাক সেনারা এখন খুব এ্যালার্ট। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জাহাজের বাম পার্শ্বে গিয়ে অবস্থান নিলেন। নিঃশব্দে মাইনগুলি জাহাজের গায়ে স্থাপন করে তাঁরা নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছার ২০-৩০ মিনিট পরই বিস্ফোরিত হয় মাইন কটি। ডুবে গেল এমভি টেকনাফ। পূর্ণ হল তাঁর কাঙ্খিত স্বপ্ন ও সাধনা। ১৯৭১ এর সেই অগ্নি ঝরা দিনগুলি তার স্মৃতিতে আজও অম্লান হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর ছাত্র জীবনে ফিরে যান। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রামে নিজের ব্যবসা পরিচালনা করেন।

(তথ্যঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমাণ্ডো এসোসিয়েশন স্মরনিকা ৯৯ পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪ অবলম্বনে এবং প্রদত্ত যুদ্ধের বিবরণ থেকে)



মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মোঃ আলী আজম। গ্রাম-রাম রায়গ্রাম, থানা- চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা। জন্ম-৫ নভেম্বর ১৯৪৩। মেট্রিক পাশ করার পর ১৯৬১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান নৌবাহিনীতে শিক্ষানবীশ হিসেবে ভর্তি হন। করাচীতে পিএনএস বাহাদুর ও পিএনএস হিমালয়াতে ১৯৬৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আর এস ক্লিপটন থেকে ৬০ দিনের ছুটিতে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। ১ মার্চ তিনি পাকিস্তান যাওয়ার জন্য ঢাকায় উপস্থিত হন। এদিন ষ্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা চলছিল। সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষনা করলে দর্শকরা বিক্ষোভ করে ষ্টেডিয়াম ছেড়ে রাজপথে নেমে আসে। এসময় সিরাজুল ইসলাম সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এর পাশে এক বাসায় অবস্থান করছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রাথমিক অবস্থায় ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাকবাহিনী তার ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধ সময়ে তিনি স্থল বাহিনীর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার দু'মাস পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন।

১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধে (রান আপ কচ্ছ) তিনি তাঘমা-ই-জং, তাঘমা-ই-দীপা, সিতারা-ই-হারব পদক লাভ করেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের পর তিনি সমর পদক, মুক্তি পদক, জয় পদক, নিরাপত্তা পদক, সংবিধান পদক, সামরিক জ্যেষ্ঠতা লাভ করেন। ১৯৯১ সালে সি আর হিসাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে, হায়দার সুপার মার্কেট, চৌদ্দগ্রাম বাজার, কুমিল্লাতে নিজ ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম 'ইসলাম এন্টারপ্রাইজ'।

(সূত্রঃ তিনি এই তথ্য প্রদান করেন, তারিখঃ ২৩ জানুয়ারি ২০০০)



দেলোয়ার হোসেন, পিতা-মরহুম হাজী আব্দুল অদুদ ভূঞা, ফেনী সদর থানার ফাজিলপুরে ১৯৪৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মাতার নয় সন্তানের মধ্যে তিনি প্রথম।

১৯৬১ সালে নিজ গ্রাম ফাজিলপুরে ডব্লিউ, বি কাদেরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করে কাউকে না জানিয়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। সেখানে করাচী ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৭০ সালে ডিগ্রী নিয়ে ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে চাকরিতে ঢোকেন। চাকরি জীবনে ঢোকার পর জনাব দেলোয়ার প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাঙালিদের প্রতি পশ্চিমাদের ঘৃণা। সেদিন একান্ত খেয়াল বশে যুবক দেলোয়ার পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেও এক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ইসলাম এবং ভ্রাতৃত্বের কথা বললেও তারা দেশের পূর্ব অঞ্চলকে একটি উপনিবেশ হিসেবে মনে করতো। সর্বক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের মাঝে বিরাট বৈষম্য দেখে ক্রমান্বয়ে তার মন বিদ্রোহী হতে থাকে। ইতিমধ্যে দেশের পূর্ব অংশে মানুষ ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু করলে তিনি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। '৭১ এর ১ ফেব্রুয়ারীতে ছুটি নিয়ে নিজ গ্রামে চলে আসেন কিন্তু সকল আশা ভঙ্গ হয় ২৫ মার্চ রাতে যখন পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকাসহ সারা দেশে নিরস্ত্র বাঙালি নিধন শুরু করে। দেশপ্রেমিক দেলোয়ার হোসেন আপন ভাই, চাচাত ভাই, চাচা ও অন্যান্য যুবকসহ ১৮ এপ্রিল '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতের পথে রওয়ানা দেন। অনেক প্রতিকুল অবস্থা অতিক্রম করে একই তারিখে তাঁরা ভারতের হরিনা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লেখান। একমাস এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ছাত্র-যুবক যারা যুদ্ধে এসেছিলেন, কেবল সহযোগীর ভূমিকা পালন করছিল। দেলোয়ার হোসেনও তখন একই ভাবে চলছিলেন। জুন মাসে ক্যাম্পে উপস্থিত হন একদল পদস্থ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা। উচ্চতর নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে দেলেয়োর সামরিক ট্রাকে চেপে প্রথমে আগরতলা পৌঁছেন। তারপর পলাশী নৌপ্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পৌছান। পরদিন থেকে তাদেরও প্রশিক্ষণ শুরু হয় দেড় মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি একজন সাহসী নৌকমান্ডো হিসেবে গড়ে উঠেন। ১৫ আগষ্ট, 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিকল্পনায় তাঁকে চট্রগ্রাম বন্দরের জন্য মনোনীত ৬০ জন কমান্ডোর একজন সদস্য হিসেবে পাঠানো হয়।

১২ তারিখ তাদের ২০ জন কমান্ডোর দল এসে পৌছে চট্রগ্রামের ফৌজদার হাটে। কিন্তু ঝুলন ব্রীজের নিকট পাকিস্তানী বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার মুখে তাঁরা এখানে এসে আটকা পড়েন। সঠিক সময়ে শহরে পৌছতে না

পারায় তিনি প্রথম অভিযানে অংশ নিতে ব্যর্থ হন। পলাশী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ফিরে আসেন যুদ্ধে অংশ নিতে না পারার ব্যাথা নিয়ে।

অক্টোবর মাসে পুণরায় অপর একটি দলের সাথে তাকে সন্দ্বীপ পাঠানো হয়। সন্দ্বীপ হতে ভোলা পর্যন্ত সকল বয়া ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য এই দলের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তিনি সন্দ্বীপ ও অত্র এলাকায় অবস্থান করেছেন। ডিসেম্বরের শুরুতেই সন্দ্বীপ শত্রুমুক্ত হলে তিনি নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। ডিসেম্বরের ৮ তারিখ ফেনীতে বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসেন।

১৯৭৩ সালে ক্যাডার সার্ভিস (সিভিল) পরীক্ষায় মনোনীত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন ফৌজদারহাটের বশীর মাষ্টারের স্ত্রীর অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ তার কাছে স্মরনীয় হয়ে আছে। চট্রগ্রাম বন্দর অভিযানের সময় তিনি এবং সহযোদ্ধাসহ বশীর মাষ্টার ও ডাঃ ফয়েজ আহমেদ এর বাড়িতে কয়েকদিন গোপনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিদায় মুহুর্তে মাষ্টার সাহেবের স্ত্রীর স্নেহমাখা চাহনি এবং সজল চোখে সতর্কভাবে চলার পরামর্শ তিনি ভূলতে পারেন না।

(তথ্যঃ মুক্তিযুদ্ধ ও নৌকমান্ডো অভিযান গ্রন্থ পৃষ্ঠা ২১৯-২২১)



সিরাজ উদ্দিন আহমদ, পিতা-মৃত আব্দুল ওহাব। গ্রাম-রাম রায় গ্রাম, পোঃ-চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা। জন্মঃ- ২৩-২-১৯৪৬। এস.এস.সি পাশ করার পর ১৯৬৩ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকার আজিমপুর রিক্রুটমেন্ট সেন্টার থেকে কুক পদে মনোনীত হয়ে করাচীতে প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান। এখানে পিএনএস বাহাদুর, পিএন এস হিমলয়াতে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে বিভিন্ন জাহাজে চাকরি করেন।

১৯৭১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ৬০ দিনের ছুটি নিয়ে তিনি নিজ গ্রামে চলে আসেন। ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হলে তিনি ২নং সেক্টরে মেজর হায়দারের অধীন বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে পুনরায় যোগদান করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে নিজ বাড়ীতে অবসর জীবন যাপন করছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ননা, তারিখঃ ৩ নভেম্বর ৯৯)



মোঃ আব্দুস সামাদ তালুকদার (১-১-১৯৫৪), পিতা- মরহুম ইসমাইল তালুকদার, মাতা-বেগম মাঝু ইসমাইল। গ্রাম-স্বর্ণঘোষ, ডাক-ধানুকা, থানা-পালং, জেলা-শরীয়তপুর। বর্তমান-সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, পালং তুলামার গুরুদাস সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, শরীয়তপুর। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএবিএড, এম এ ইন (এডুকেশন) ডি.ইউ।

১৯৭১ সালে পূর্ব মাদারীপুর, পালং এর সর্বদলীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন। ২৭ এপ্রিল, তিনি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মেঘালয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। মে মাসে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং সাবমেরীনার দলের কয়েকজন সদস্য নৌ যুদ্ধে প্রশিক্ষণের জন্য মেঘালয় আসেন। এখানে সমবেত ৪৫০০ যুবকের মধ্যে সাঁতার প্রতিযোগিতার পর মাত্র ২৫ জন যুবককে মনোনীত করেন। এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য পলাশী নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে ট্রেনিং শেষে অক্টোবর মাসে সৈয়দ মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে ফরিদপুর জেলার অধীন টেকেরহাটে ফেরী এবং দোতলা লঞ্চ ডোবানোর জন্য পাঠানো হয়। দলে ছিলেন ৩ জন কমাণ্ডো সদস্য। আব্দুস সামাদ, হাফিজুর রহমান এবং শহীদ খবিরুজ্জামান। টেকেরহাট যুদ্ধে কমাণ্ডো খবিরুজ্জামান শহীদ হন।

এরপর আঃ সামাদ এবং হাফিজুর রহমান স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা দলের সাথে মিশে বিভিন্ন স্থানে স্থল যুদ্ধে অংশ নেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন জনাব পান্না এবং সরোয়ার মোল্লা। টেকের হাটে একটানা ১৩ দিন যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে প্রায় ৫০০০ মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেয়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনী প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে ফরিদপুর চলে যেতে বাধ্য হয়।

১৯৭১ সালে পালং থানায় কুখ্যাত রাজাকার ও দালালদের মধ্যে কয়েকজন- সোলায়মান মাওলানা (আংগারিয়া), সালামত উল্যা শিকদার (২৪ রশি, পালং), সামছুল হক তালুকদার (স্বর্ণঘোষ), আঃ আজিজ মোল্যা (স্বর্ণঘোষ), আবদীন তালুকদার (পালং), আকুবালী শেখ (পালং), রবিউল্যাহ মাষ্টার (রুদ্রকর), ফজলুর রহমান কোতায়াল (পালং), মতিউর রহমান খান (স্বর্ণঘোষ)।

বর্তমানে নৌকমাণ্ডো আঃ সামাদ তালুকদার শিক্ষকতা একই সাথে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত। মুক্তিযোদ্ধারা সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত হোক এটি তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করেন।

(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা. তারিখঃ ৭ অক্টোবর ৯৯)

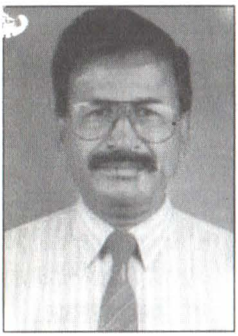


সাব লে: কাজী আব্দুল মতিন (অব:), পিতা-মৃত আলহাজ্ব কাজী মোঃ আনোয়ার আলী। গ্রাম-বহরী, ডাক-আড়ং বাজার, থানা-মতলব, জেলা-চাঁদপুর। বর্তমান-আব্দুল হামিদ সড়ক, ফয়েজ লেক, পোষ্ট-ইউএসটিসি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। জন্ম-১৯৪৫ সালের ১ নভেম্বর। এইচ.এস.সি পাশ করার পর ১৯৬৪ সালের ২৩ জুন তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে ভর্তি হন। করাচীতে পিএনএস বাহাদুর ও পিএনএস শেফা (হাসপাতাল) তে প্রাথমিক এবং প্রফেশনাল শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পূর্বে দুই মাসের ছুটিতে বাড়িতে আসেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি আগরতলা মতিনগর ক্যাম্পে যোগদান করেন। জুলাই মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদানের জন্য তিনি কলকাতার গার্ডেন রীচ ডক ইয়ার্ডে চলে আসেন। আগষ্ট মাস থেকে এখানে দু'টি গানবোট সংস্কার ও রূপান্তরের কাজে তদারকি করেন। অক্টোবরের শেষ দিকে গানবোট দু'টি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়। কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান গানবোট দু'টিকে পদ্মা ও পলাশ নামে কমিশন করেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তাঁরা হলদিয়া বন্দরে জাহাজ দু'টি নিয়ে মহড়া দিতে থাকেন।

নভেম্বর মাসে এই গানবোটের সাহায্যে তাঁরা মংলা বন্দরের আউটার এ্যাংকরেজে ৮টি গ্রাউন্ড মাইন পেতে রাখেন। ১০ ডিসেম্বর 'পদ্মা' ও 'পলাশ' আইএনএস পানভেল এবং বিএসএফ এর জাহাজ চিত্রাঙ্গদা সমবিব্যহরে খুলনা অভিযানকালে বিমান হামলায় পদ্মা ও পলাশ নিমজ্জিত হয়। অনেকে শহীদ এবং আহত হন। কাজী আব্দুল মতিন আহত হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হন। সার্কিট হাউজে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর চিকিৎসার জন্য খুলনা জেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ১৭ ডিসেম্বর খুলনা মুক্ত হলে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি নৌবাহিনী থেকে সাঃ লেঃ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বীরত্বসূচক খেতাব সম্বন্ধে বলেন, বিমান আক্রমণের আশংকায় অনেকে প্রাথমিক অবস্থাতে জাহাজ ছেড়ে পানিতে লাফিয়ে অক্ষত অবস্থায় আত্মরক্ষা করে বীর উত্তম খেতাব পেয়েছেন। অথচ তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাহাজে থেকে আহত হলেও খেতাব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

(তথ্যঃ সাঃ লেঃ আঃ মতিন, তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০০)



মোঃ নজরুল ইসলাম, বীর প্রতীক, পিতা মরহুম কেরামত আলী। গ্রাম- চরবাতিয়া, ডাক- খাসসাতবাড়িয়া, থানা- শাহজাদপুর, জেলা- সিরাজগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা: প্লট-৩১৩, রোড নং-২১, মুজগুন্নি আবাসিক এলাকা, খুলনা-৯০০০। জন্ম-২১ জুলাই ১৯৪৭ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং (মেরিন)।

২৫ মার্চের পর পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে ঢাকা থেকে নিজ এলাকায় গমন করে এলাকার ছাত্র যুবক, শ্রমিক, ইপিআর এবং সেনা সদস্যদের সমন্বিত করে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকবাহিনীকে পাবনা, বেড়া, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, বগুড়ার পথে অগ্রসর হতে বাঁধার সৃষ্টি করেন। এ সময় ৭/৮ দিন পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং এক পর্যায়ে তাঁদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে গেলে তিনি সহযোদ্ধাসহ ভারতে আশ্রয় নেন। প্রথম দেড় মাস দেরাদুণে প্রশিক্ষণ নেন। এখান থেকে ফিরে তিনি পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে আরও দু মাস প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ১০ জন নৌকমাণ্ডো সহ বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর পুনরায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সরকার তাঁকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন। অ:সাব লে: (ই) হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

(তথ্য প্রদানঃ ১৫ আগস্ট ২০০০)



মোঃ আব্দুল আজিজ, পিতা- মরহুম মোঃ তফিল উদ্দিন আহম্মদ, মাতা-মরহুমা তকিরন নেছা। গ্রাম-পান্টি, থানা-কুমারখালী, জেলা-কুষ্টিয়া, বর্তমান- ২২ বয়রা সেমিপাকা কলোনী, বয়রা, খুলনা। জন্ম- ২৪ এপ্রিল ১৯৪৭।

১৯৬৪ সালে এস.এস.সি পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে ইসলামিয়া কলেজ করাচী থেকে আইএ, এবং ১৯৭৩ সালে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পাশ করেন। ১৯৬৫ সালের ৫ জুলাই বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তদানিন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে বিভিন্ন জাহাজে কর্মরত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি কুষ্ঠিয়াতে প্রতিরোধ যুদ্ধে সামিল হন। অতঃপর ৮নং সেক্টরের অধীন মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সর্বশেষ পশ্চিমবংগের নেভাল ডিটাচমেন্ট ক্যাম্প হাসনাবাদে মেজর জলিল এর তৈরী নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। মেজর জলিল ৬টি যাত্রীবাহী লঞ্চে ভারী মেশিনগান বসিয়ে এগুলিকে গানবোট হিসেবে যুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকেন। পাকিস্তান নৌবাহিনীর পক্ষ ত্যাগকারী নাবিকবৃন্দ এই রূপান্তরিত গানবোট গুলির ক্রু হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। প্রায় ৫০ জন নাবিক ৬টি গানবোট নিয়ন্ত্রণ করতেন। হাসনাবাদ নৌবাহিনীর ডিটার্চমেন্ট ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন নৌবাহিনীর সাঃ লেঃ এম বদরে আলম।

গানবোটগুলি মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবহন, অস্ত্র সামগ্রী পৌঁছে দেয়া এবং সীমান্ত সংলগ্ন সুন্দরবনের অভ্যন্তরে পাহারার দায়িত্ব পালন করত। মোঃ আঃ আজিজ, মেজর জলিল এর সৃষ্টিকরা এই নৌবাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারদের খারাপ আচরনের কারনে ১৯৮৭ সালে, পেটি অফিসার (মেডিকেল) হিসাবে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাঁর জানামতে পাকিস্তান প্রত্যাগত এই সকল অফিসাররা বাংলাদেশ স্বাধীন হবে বিশ্বাস করতেন না। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধ সময়ে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তারা অনেকেই পাকিস্তানে বদলি নিয়ে চলে যান। কিন্তু নির্মমতা হলো ওই সকল পাকিস্তান প্রেমী অফিসারদের অধীনে তাঁদের চাকরি করতে হয়। কিন্তু তাঁদের রুক্ষ আচরণের ফলে মুক্তিযোদ্ধা নাবিকবৃন্দ চাকরি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বর্তমানে তিনি খুলনাতে অবস্থান এবং নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

(১৯৯৯ সালের ১৫ আগষ্ট তিনি বর্ণনা দিয়েছেন)।



সত্যেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, পিতা- জনার্দন বিশ্বাস, গ্রাম- ধর্মরায়ের বাড়ী, ডাকঘর-উজয়ন, থানা- মুকসুদপুর, জেলা-গোপালগঞ্জ। ১৯৪৯ সালের ১৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা-বিকম পাশ।

কলেজে প্রবেশের পর রাজনীতিতে যোগ দেন। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণে তাদের প্রতি ঘৃণা রাজনীতিতে বেশি আকৃষ্ট করে। ছাত্র জীবনে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং পরে ১১ দফা আন্দোলনে এলাকাতে নেতৃত্ব দান করেন। ২৫ মার্চ, ঢাকায় গণহত্যাা এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের সংবাদ জানার পর এলাকায় ছাত্র যুবকদের নিয়ে বাঁশের লাঠির সাহায্যে প্রশিক্ষণ আরম্ভ করেন। ১০ এপ্রিল মাদারীপুর ষ্টুয়ার্ড মুজিবের অনুপ্রেরণায় কর্ণেল শওকত আলী এমপি. সাহেবের নেতৃত্বে ১৭ এপ্রিল ভারতে পৌঁছে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদেন। এখানে কিছুদিন থাকার পর নৌযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে চলে যান। তিনমাস প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ আগষ্ট চট্রগ্রাম বন্দরে অপারেশনের জন্য গমন করেন। এখানে জাহাজ, বার্জ, গানবোটসহ ১০টি টার্গেট ধ্বংস হয়।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তায় সিলেটে অপারেশনের জন্য যান। ১২ জন কমান্ডোর দলনেতা ছিলেন মীর মোশতাক আহমেদ রবি। সিলেট-শেরপুর রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে যাওয়ার পথে তাঁরা অন্ধকারে ভূলক্রমে পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানের মাঝে ঢুকে পড়েন। তখন উভয় পক্ষের মাঝে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়। নৌ কমান্ডোরা যুবক হলেও তাদের আন আর্মড কমব্যাট ভালভাবে প্রশিক্ষণ ছিল। তবুও পাকিস্তানীদের শারীরিক শক্তি অধিক থাকায় তাঁরা নিজেদের ছাড়িয়ে নিয়ে নিকটে বাঙ্কারে অবস্থান গ্রহণ করে প্রচণ্ড গুলি ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু কমান্ডোরা ধানক্ষেতের মাঝে শুয়ে ক্রলিং করে দূরে চলে যেতে সক্ষম হন। এই অভিযানে সত্যেন্দ্র নাথ বিশ্বাস দুঃসাহসীকতার স্বাক্ষর রাখেন। পাকবাহিনীর গুলিতে কেহ আহত না হলেও মুক্তিযোদ্ধারা যখন ধানক্ষেতে আশ্রয় নেন তখন মুক্তিযোদ্ধাদের খালি শরীর পেয়ে সমস্ত গায়ে জোঁক ধরে রক্ত চুষতে থাকে। এক এক জনের গায়ে ৩/৪ শত জোঁক লেগে থাকে। সকালে তাঁরা একে অপরের শরীর থেকে এই জোঁক ছাড়িয়ে ফেলেন। জোকের আক্রমণে একজন নৌযোদ্ধা এতই আক্রান্ত হন যে, পরবর্তী সময়ে সকলে ধারনা করতে থাকেন তাঁর কুষ্ঠ হয়েছে। তারা ক্যাম্পে ফিরে দু'দিন পর মীর মোশতাক আহমদ রবি এর নেতৃত্বে সিলেট দামাই চা বাগানের মেশিনটি এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেন।

স্বাধীনতার পর নিজ বাড়িতে চলে আসেন। বহুরকম ঝঞ্জার মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। বর্তমানে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অর্থাভাবে চিকিৎসা করতে পারছেননা। সকল স্থানে আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ দিনের অপেক্ষায় আছেন।

(তথ্য সূত্র লিখিত বর্ণনা থেকে, তারিখ ২৫ আগষ্ট ৯৯)

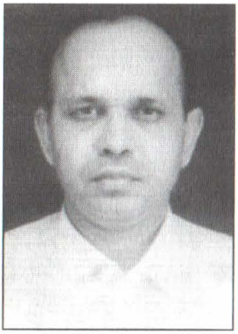


মোঃ ফজলুল কবির, পিতা- মরহুম নূর মোহাম্মদ, গ্রাম- জয়নগর, ডাক- হড়িয়া, থানা- শাহরাস্তি, জেলা- চাঁদপুর। বর্তমান ঠিকানা: ৩৬/৩/বি আহম্মদ বাগ, সবুজবাগ, ঢাকা। জন্ম- ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ এস সি পাশ।

২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালির উপর নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ করতে থাকে সাধারণ মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিতে থাকলে ফজলুল কবির স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের সাথে মিশে তাঁদের সকল রকম সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন কিন্তু হানাদার বাহিনী গ্রামে পৌঁছে বাঙালি যুবক এবং ছাত্রদের হত্যা শুরু করলে তিনি সাথী বন্ধুসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জুন মাসের মাঝামাঝি নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী ক্যাম্পে এসে পৌছেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর ১৫ আগষ্ট চাঁদপুর নদীবন্দর অপারেশনের জন্য মনোনতী হন। তিনি ২০ জন নৌকমাণ্ডোর একটি গ্রুপের পরিচালক মনোনীত হয়ে এই অভিযান সফল করেন। দলের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সাবমেরীনার বদিউল আলম।

এরপর অক্টোবর মাস থেকে বিজয় অর্জন পর্যন্ত চাঁদপুর বন্দরে পরিচালিত প্রতিটি নৌযুদ্ধের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৭২ সালের ২০ ডিসেম্বর বহিরাগত ক্যাডেট সাব ইনসপেক্টর হিসেবে পুলিশ বিভাগে যোগদেন। পদোন্নতি পেয়ে বর্তমানে ইন্সপেক্টর হিসাবে খাগড়াছড়ি জেলায় মাটিরাংগা থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত আছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য সাহসিকতার পরিচয় দিলেও তিনি বীরত্ব সূচক খেতাব থেকে বঞ্চিত হন।

(তথ্য সূত্র ঃ লিখিত বর্ণনা থেকে, তারিখ ঃ ২২ আগষ্ট ২০০০)



বিধান বিশ্বাস, পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে অনেক ত্যাগ, তিতীক্ষা ও লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে। ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল শুধুমাত্র একটি ধর্মের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু একটি দেশের দুই প্রান্তের জনগণের মধ্যে সামাজিক, রীতিনীতি বা ভাষা, এসব কোন ক্ষেত্রেই মিল ছিলনা। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিতে দুই অঞ্চলের মানুষের মাঝে অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। '৭১ এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হায়েনাদের নির্বিচারে গণহত্যা ও বর্বরতায় নিমিষেই ছিন্ন হয়ে যায় পূর্ব ও পশ্চিমের ২৫ বছরের ধর্মীয় বন্ধন। সেদিন নিরীহ বাঙালি জনগনকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাদের সম্পত্তি লুট করা হয়েছে এবং মা বোনের সম্ভ্রম হনন করা হয়েছে তার নজীর পৃথিবীতে বিরল। বাঙালির জীবন, আদর্শ এবং তাদের শত শত বছরের লালিত স্বপ্নকে পুরনের জন্য পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ছাড়া জনগণের সম্মুখে আর কোন পথ খোলা ছিলনা।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল কোন নির্দেশনা ছাড়াই বিশৃঙ্খল ভাবে এবং সমন্বিত পরিকল্পনা ছাড়াই। কিন্তু ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধ জমাট বাঁধতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানী হানাদারদের বিতাড়িত করতে রক্ত শপথ নিয়েছিল প্রতিটি বাঙালি। ইপিআর, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, যার অগ্রভাগে ছিল এদেশের ছাত্র সমাজ।

এই অকুতোভয় ছাত্রদের একজন বিধান বিশ্বাস। পিতা-কুঞ্জ বিহারী বিশ্বাস। ১৯৫০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানার মহাতলি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি '৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং জগন্নাথ হলের ছাত্র সংসদের ভিপি ছিলেন।

১৫ মার্চের পূর্বে তিনি শহর ত্যাগ করে নিজ এলাকায় চলেযান এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদেন। পরে উচ্চতর এবং বিশেষ কমান্ডো ট্রেনিং গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে প্রতিষ্ঠিত নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তিন মাস পর কঠোর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ৬০ জন কমান্ডোর মাঝে ৪০ জন কমান্ডো সেদিন বন্দরে পৌছতে সক্ষম হন। এবং তারা ১০টি জাহাজ ডুবিয়ে

দেন। একই অপারেশনে আঃ রশিদ, দেলোয়ার হোসেনসহ ২০ জন কমাণ্ডোদল সীতাকুণ্ডে পাকিস্তানীদের সম্মুখ দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে সাহস পায়নি ফলে তারা অপারেশনে অংশ গ্রহনে ব্যর্থ হয়ে পলাশীতে ফিরে যায়। এজন্য ক্যাম্প কমাণ্ডার জি.এম. মার্টিস আব্দুর রশিদকে পুনরায় নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখেন দেননি।

এরপর অক্টোবর মাসে তিনিসহ চারজন কমাণ্ডো মেজর হায়দারের নির্দেশে কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার অধীন ছয়শতি ব্রিজটি ধ্বংস করার জন্য উপস্থিত হন। তাঁর সাথী ছিলেন শাহাবউদ্দিন ভূঁইয়া, আলী আহমদ এবং আব্দুর রহিম। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার সুরুজ মিয়া তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা দেন। ব্রিজ ধ্বংসের জন্য ৩০০ পা: এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করেন। বিজয় অর্জন পর্যন্ত তারা এখানে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর ছাত্র জীবন সমাপ্ত করেন। এবং বিসিএস ক্যাডারে মনোনীত হন। বর্তমানে এডিসি (রেভিনিউ) হিসেবে সিলেটে কর্মরত আছেন।



মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, পিতা-তোফাজ্জল হোসেন হাওলাদার, গ্রাম-সোনাতলা, ডাক-সোমাদ্দরখালী, থানা-মোরলগঞ্জ, বাগেরহাট। বর্তমান সদর কোর্ট, পটুয়াখালী। জন্ম-১ নভেম্বর ১৯৪৯। শৈশবে নিজ গ্রামের স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে তিনি কলেজ ছাত্র ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন সমগ্র বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে, সাথে সাথে পাকিস্তান সমর্থিত একশ্রেণীর বাঙালি দালালও নিরীহ জনগণের উপর অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং হত্যাযজ্ঞ চালায় এই সময় জনাব আব্দুল কুদ্দুস বন্ধু বান্ধবসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ২৩ এপ্রিল ভারতের তকিপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। ক্যাম্প পরিচালক ছিলেন ক্যাপ্টেন শাহজাহান আলী (মাষ্টার)।

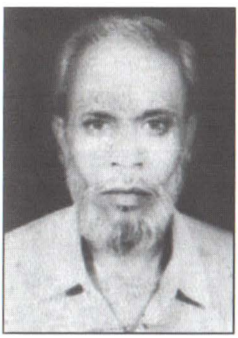
এখানে প্রশিক্ষণকালে ১২ মে ভারতের নৌবাহিনীর কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, কর্ণেল এম এ জি ওসমানী এবং দুজন সাবমেরীনার গাজী মোঃ রহমতউল্লা এবং সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ তকীপুর ক্যাম্পে আসেন নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যুবক মনোনয়ন করার জন্য। এদিন ৪০০০ যুবক কে লাইনে দাঁড় করিয়ে সকল রকম পরীক্ষার পর ৮৫ জন যুবককে মনোনীত করে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে আনা হয়। এখানেই গড়ে তোলা হয় নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। তাঁদের বিশেষ ধরনের সাঁতার এবং বিস্ফোরক ও লিমপেট মাইন ব্যবহার শিক্ষা দেয়া হয়। তিন মাস এই কঠিন প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রথম ব্যাচের কমান্ডো প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। নৌ কমান্ডোদের তিনমাসে যে প্রশিক্ষণ রপ্ত করতে হয় নিয়মিত বাহিনীতে একই প্রশিক্ষণ রপ্ত করতে কমপক্ষে দুই বছর সময়ের প্রয়োজন হতো। এ জন্য নৌ কমান্ডোদের ২৪ ঘন্টার মাঝে ১৮ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

আগষ্ট মাসের ১ম সপ্তায় প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলে ৪ আগষ্ট তিনি মংলা সমুদ্র বন্দর অভিযানের জন্য মনোনীত হয়ে সাবমেরীনার জনাব আহসানউল্লার নেতৃত্বে ৬০ জন কমান্ডোর সাথে মংলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। প্রথম সফল অভিযান শেষে তিনি পলাশী ক্যাম্পে ফিরে আসেন। অক্টোবর মাসে পুনরায় সাবমেরীনার বদিউল আলমের নেতৃত্বে মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এবারে নভেম্বর পর্যন্ত অত্র এলাকায় অবস্থান করে বিভিন্ন গ্রুপের সাথে অনেকগুলি দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নেন।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তায় একটি কমান্ডো গ্রুপ রমেন্দ্র নাথের নেতৃত্বে ইপিআর, পুলিশ ও স্থল বাহিনীর যোদ্ধা সহ মোল্লাহাট থানা শত্রুমুক্ত করার

জন্য অপারেশন পরিচালনা করেন। যুদ্ধে মোল্লাহাট থানার মিলিশিয়া পুলিশ এবং রাজাকার সহ ৪০ জন অস্ত্র সহ মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ২ জন মিলিশিয়া পুলিশ যুদ্ধে নিহত হয়। আব্দুল কুদ্দুস এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর দেশ স্বাধীন হলে তিনি শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে ১৯৭২ সালে পুলিশ বিভাগে যোগদান করেন। বর্তমানে একজন সৎ ও দক্ষ পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে উক্ত বিভাগে কোট ইন্সপেক্টর হিসেবে পটুয়াখালী জেলা সদরে কর্মরত আছেন।

(সূত্র ঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখ ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০০)



মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, পিতা-সুলতান মিয়া। গ্রাম-বোস্তা, ডাক-আদর্শ ইছাপুর, সাহরাস্তি, চাঁদপুর। জন্ম-১ মার্চ ১৯৪৯। এস.এস.সি পাশ করার পর তিনি ১৯৬৭ সালের ১২ মে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে পেট্রোলম্যান হিসেবে ভর্তি হন। করাচীতে বিভিন্ন নৌ ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর দুই মাসের ছুটি নিয়ে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রথমে মেজর খালেদ মোশাররফ এর অধীনে এবং পরে মেজর শফিউল্লা সাহেবের অধীনে বিভিন্ন যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেন।

অক্টোবর মাসে নৌবাহিনীতে যোগদানের জন্য তাঁকে কল্যানীতে পাঠানো হয়। এখানে 'পিএনএস পারুল' নামক একটি জাহাজে যোগদানের জন্য তিনিসহ ২১ জন নাবিক অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু পারুল জাহাজটিকে ম্যাণ্ডেড করা হয়নি। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হলে তিনি নিজ বাড়িতে চলে আসেন। পরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সালের ১১ মে রেগুলেটিং পেটি অফিসার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

(তথ্য সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা থেকে, তারিখঃ ২০ আগষ্ট ১৯৯৯)



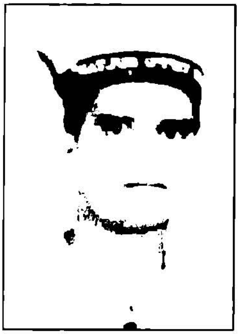
মোঃ শাহাবউদ্দিন ভূঁইয়া, পিতা-মোঃ হানিফ ভূঁইয়া। সোনালী কাচঘর, প্রধান সড়ক, মাদারীপুর। ১৯৭১ সালে মাদারীপুর কলেজে ৪র্থ বর্ষের ছাত্রবস্থায় ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২৫ মার্চ, পাকিস্তানী জান্তা দেশব্যাপী গণহত্যা শুরু করে। এ সময় তিনি ষ্টুয়ার্ড মুজিবের নেতৃত্বে মাদারীপুর কলেজ মাঠে বাঁশের লাঠির সাহায্যে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু করেন। কিন্তু আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ, এভাবে বেশি দিন টেকা যাবেনা চিন্তা করে ১০ এপ্রিল লঞ্চ যোগে ২৬০ জন যুবককে নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। চাঁদপুর পৌছে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ১৭ এপ্রিল তাঁরা হরিনা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছেন।

এখানে কিছুদিন অবস্থানের পর কর্ণেল শওকত আলী এমপির নির্দেশে তিনিসহ ২০ জন যুবক নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী ক্যাম্পে উপস্থিত হন। তিন মাস প্রতিদিন ১৮ ঘন্টা পরিশ্রম করে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর তিনি ১৫ আগষ্ট চট্টগ্রামে বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তাদের সাথে ২০ জন কমাণ্ডো চট্রগ্রাম শহরে পৌছতে সক্ষম হননি। তাঁদের মাঝে ছিলেন অনিল বরন, দেলোয়ার হোসেন, আঃ রশিদ, মূসা চৌধুরী, সাইদুর রহমান, আবু তাহের, মনোজ দত্ত।

১৫ আগষ্ট অপারেশন জ্যাকপটের অধীনে চট্টগ্রাম বন্দরে ডাঃ শাহ আলম বীর উত্তম এবং মাযহারউল্লা বীর উত্তমের নেতৃত্বে ৩৪ জন কমাণ্ডো সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বন্দরে ১০টি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন। অক্টোবর মাসে তিনি, বিধান বিশ্বাস, আলী আহমদ ও আঃ রহিম মেজর হায়দারের নির্দেশে কিশোরগঞ্জ জেলার চরকুলিয়াতে পৌঁছেন। এখানে ভৈরব থেকে কিশোরগঞ্জের মধ্যবর্তীস্থলে ছয়শতি রেল ব্রিজ ধ্বংস সহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন।

স্বাধীনতার পর ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। বর্তমানে মাদারীপুরে ব্যবসা করছেন।

(তথ্য সূত্রঃ লিখিত সাক্ষাৎকার, তারিখঃ ৩ মার্চ ১৯৯৯)



শহীদ মোঃ দৌলৎ হোসেন মোল্লা এবি, বীর বিক্রম। পিতা- মৃত মোঃ আয়েত আলী মোল্লা। গ্রাম- চর খামের, ডাক- চরখামের, থানা- কাপাসিয়া, জেলা- গাজীপুর। বর্তমান ঠিকানা: ৪২৯ নয়াটোলা, চেয়ারম্যানগলি, মগবাজার, থানা- রমনা, ঢাকা। জন্ম- ১২ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ এস সি পাশ।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করে করাচীতে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে বিভিন্ন সময়ে জাহাজে দায়িত্ব পালন করেন। ৯ এপ্রিল সপক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১০ ডিসেম্বর পদ্মা এবং পলাশ জাহাজে খুলনা অভিযান কালে বোমারু বিমানের আঘাতে জাহাজ দুটি ধ্বংস প্রাপ্ত হলে দৌলৎ হোসেন মোল্লাসহ অনেকে শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সরকার তাঁকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করেন।

(তথ্যঃ শহীদের কন্যা স্মৃতির প্রদত্ত বর্ননা থেকে। তারিখঃ ২৪ অক্টোবর২০০০)



সাইদুর রহমান মন্নু, পিতা- মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া, কুঠিবাড়ি কমলাপুর (পলাশবাড়ী), ফরিদপুর সদর, জেলা-ফরিদপুর।

১৯৭১ সালে আইএ প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। কলেজে অধ্যয়নকালে পাকিস্তানীদের দুঃশাসন এবং অসমনীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এসময় তিনি মাদারীপুর কলেজের ছাত্র লীগের কলেজ শাখার সদস্য ছিলেন। তখন শহরে প্রতিদিন জংগী মিছিল এবং মিটিং হতো। সাইদুর মিটিং ও মিছিলে অগ্রণী ভূমিকা রাখতেন। '৭০ এর নির্বাচন উত্তর দেশব্যাপী আরও উত্তেজনা বাড়তে থাকে। পশ্চিমা শাসকরা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী নয়। ঘটলোও তাই কিন্তু সমগ্র বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। ক্ষমতা ছাড়তে হবে নাহলে স্বাধীনতা।

মাদারীপুর ছাত্র জনতা সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ষ্টুয়াড মুজিব, মাদারীপুর কলেজ মাঠে

শতাধিক ছাত্র যুবককে বাঁশের লাঠি আর বন্দুক নিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে হানাদার বাহিনী মাদারীপুর আসবে জানতে পেরে তিনি এই ছাত্র-যুবক দলকে একটি লঞ্চে উঠিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সাইদুর রহমান এবং তাঁর কয়েকজন সতীর্থ-একই লঞ্চের যাত্রী। তাঁদের লক্ষ্য ভারতে পৌঁছে উন্নত প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সংগ্রহ করা। ১৮ এপ্রিল তাঁরা চাঁদপুর শহরের দক্ষিণে কোন এক অজানা গ্রামে (নীলকমল) পৌঁছে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ৭ দিন পর ভারতের আগরতলা ক্যাম্পে পৌঁছেন। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হন।

সাইদুর রহমান এবং অন্যরাও জানতেননা তাঁদের দায়িত্ব কি হবে। পরে ক্যাম্প পরিচালক বুঝিয়ে দিলেন এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে একটি আত্মঘাতি দল গঠন করা হবে। অনেক যুবক এই প্রশিক্ষণ গ্রহণে অসম্মতি জানায়। তাদেরকে বিহারের চাকুলিয়াতে ট্রেনিং এর জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে ১২০ জন যুবককে নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এটি ছিল সুসাইডাল স্কোয়াড। একটি অতি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মাইন বহন করে কর্ণফুলি, পশুর, যমুনা কিংবা ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে জাহাজের গায়ে মাইনটি স্থাপন করে, সেটির বিস্ফোরন ঘটাতে হবে। ক্যাম্প কমাণ্ডার স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন বিস্ফোরনের আওতায় তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনা ৯০ ভাগ।

পলাশী ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, কিভাবে পানির নীচ দিয়ে এই ভয়াল এবং খরস্রোত নদী শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে অতিক্রম করতে হবে এবং ফিরে আসতে হবে। এরসাথে বিশেষ ধরনের লিমপেট মাইনের ডিভাইজ, ডেটনেটিং ইত্যাদি। লিমপেট মাইনগুলি ছিল খুবই কমপ্লিকেটেড। একসাথে শারিরীক শক্তির প্রয়োজন। সাধারনত এই প্রশিক্ষণ রপ্ত করতে একজন সুশিক্ষিত সৈনিকের প্রয়োজন হয় দুই বৎসর। কিন্তু মাত্র তিন মাসে নৌ কমাণ্ডোদের প্রশিক্ষিত করে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের ৪টি বন্দরে অপারেশনের জন্য পাঠানো হয়।

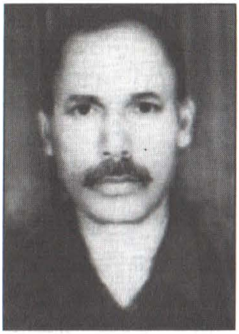
সাইদুর রহমান ৬০ জন কমাণ্ডো দলের সাথে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দর অভিযানে যান। কিন্তু দূর্ঘটনাক্রমে তাঁদের ২০ জন কমাণ্ডোর গ্রুপ কমাণ্ডো আব্দুর রশিদ এর নেতৃত্বে ফৌজদারহাট পৌঁছানোর পর পাকিস্তানীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে যথাসময়ে শহরে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। ফলে তাঁদের দলের 'সি' গ্রুপ এর ২০ জন কমাণ্ডো অপারেশন জ্যাকপটে অংশ নিতে পারেননি। এজন্য তিনি কমাণ্ডো দেলোয়ার হোসেনের নেতিবাচক মনোভাবকে দায়ী করেন।

দ্বিতীয়বারও তিনি মাযহার উল্লাহর নেতৃত্বে চট্রগ্রাম যান। কিন্তু মাযহারউল্লাহর পায়ে খেজুর গাছের কাঁটা ফুটলে ফারুক-ই-আজম নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে মন্নু তিনটি অপারেশনে অংশ নেন। (১) বহ্নিনোঙ্গর অপারেশন (ব্যর্থ) (২) এমভি রশিদ (৩) এমভি নাসিম। এরপর তিনি আগরতলা ফিরে যান।

এখানে সাবমেরীনার আবদুর রহমান দ্বিতীয়বার নারায়ণগঞ্জ বন্দর অপারেশনে যাওয়ার জন্য কমাণ্ডো খোঁজ করছিলেন। সাইদুর রহমান তাঁর দলভূক্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জ বন্দর অপারেশনে চলে আসেন। এখানে মূসার চরে জয়নাল আবেদীন সাহেবের বাড়ী। হাজী বাড়ি হিসেবে পরিচিত। তাঁর ছেলে নাসির, কবির, সুবীর ও মেয়ে আলো নৌ কমাণ্ডোদের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিল। এখানে থেকে 'তুরাগ' জাহাজটি তারা ডুবিয়ে দেন। অভিযানে অংশ নেন মন্নু, মনোজ এবং কাজী এমদাদ। এর আগে সাইদুর রহমান মন্নু কাঁচপুর ফেরীঘাটে 'ফেরী' ডোবানোর অভিযানেও অংশ নেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন দুঃসাহসী যোদ্ধা। নৌ কমাণ্ডোদের দায়িত্ব ছিল মাত্র একবার অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রবাসী সরকারের প্রধান সেনাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ''যেসব কমাণ্ডো একবার অপারেশনে অংশ নেবেন তাঁকে সর্বোচ্চ বীরত্ব সূচক খেতাব দেয়া হবে।'' একজন যোদ্ধাকে জীবিত অবস্থায় যে খেতাব দেয়া হয়। কিন্তু রক্ষা করেননি কেউ সেই অঙ্গীকার। পাশাপাশি অনেক তোষামদকারী যুদ্ধের ধারে কাছে না থেকেও এমন খেতাবের অধিকারী হয়েছেন। কেহ কেহ একাধিক খেতাব অর্জন করেছেন। এই পক্ষপাত পুষ্টতা মন্নুকে সবসময় পীড়া দেয়।

অকুতোভয় নৌকমাণ্ডো সাইদুর রহমান মন্নু দীর্ঘদিন হতাশা আর বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হতে হতে এখন মৃত্যুপথযাত্রী। তার দুটি কিডনী নষ্ট হতে চলেছে। অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় ঢাকা ত্যাগ করে নিজ বাড়িতে মৃত্যুর দিন গুনছেন। যখন এ লেখা ছাপা হবে তিনি দেখে যেতে পারবেন কিনা জানিনা। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এমন অবহেলা প্রদর্শিত হবে তিনি কখনও আশা করেননি। মৃত্যুর পর হলেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতি প্রত্যাশা করেন।

(সূত্রঃ তাঁর লিখিত বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত, তারিখ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০)



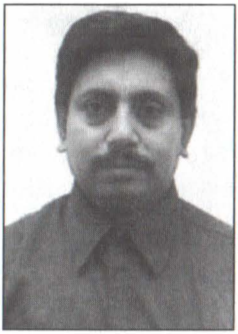
এম. এ. গফুর, পিতা-মৃত মোঃ আব্দুল হামিদ। গ্রাম-খোষপা, ডাকঘর-বিজয়া বাজার, জেলা-কুমিল্লা। জন্ম-১৯৫০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। গ্রামের স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬৫ সালে এস.এস.সি এবং ১৯৬৭ সালে এইচ.এস.সি পাশ করেন।

১৯৬৭ সালের ১৪ নভেম্বর কুমিল্লাতে তদানিন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ইউসি হিসাবে ভর্তি হন। অতঃপর পাকিস্তান নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ পিএনএস বাহাদুরে ৩ মাস বেসিক এবং ১৫ মাস প্রফেশনাল ট্রেনিং গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পূর্বে ৬০ দিনের বাৎসরিক ছুটিতে বাড়িতে আসেন। ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ২৭ মার্চ থেকে এলাকার ছাত্র যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সংগঠিত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারত গমন করেন। তিনি এলাকায় স্থায়ী ভাবে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করে তার নেতৃত্ব দেন।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে দুঃসাহসিকতার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে পুনরায় যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে এস/এল হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি সৌদি আরবে একটি কোম্পানীতে চাকরি করছেন। বিদেশে অবস্থান করেও তিনি দেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের কথা ভুলতে পারেন না।

(তথ্যঃ এম.এ গফুর, তারিখঃ ৫ মার্চ ২০০০)



মোঃ আবু তাহের, পিতা মৌলানা মরহুম মুখলেছুর রহমান, মাতা- বাছেরা খাতুন। গ্রাম- ভগবতীপুর, ডাক- জোরারগঞ্জ, থানা- মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমান- ৫২২০ ওয়ালনাট ষ্ট্রীট, ফিলাডেলফিয়া, ইউ.এস.এ.। জন্ম-৩১ মার্চ ১৯৫৫।

১৯৭০ সালে জোরারগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি, ১৯৭২ সালে নিজামপুর কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে বি.এস.সি. পাশ করার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ও.এ-৪ হিসেবে যোগ দেন। একজন কৃতি এ্যাথলেট। নৌবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় তিনি ১৫০০ মিটার, ৫০০০ মিটার, ১০০০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন এবং জাতীয় অলিম্পিকে উক্ত দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। ১৯৮০ সালে নৌবাহিনীর চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে মধ্য প্রাচ্যে চলে যান। ১৯৮৬ সালে আমেরিকা যান। বর্তমানে সেখানেই একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে অবস্থান করছেন।

ষাটের দশকের শেষ ভাগে যখন সমগ্র বাঙালি জাতি পশ্চিমা শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সোচ্চার আবু তাহের তখন ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য হিসেবে এই আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। '৭১ এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দেন তিনি এই সভায় যোগদানের জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা চলে আসেন। বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ তাঁকে দারুণভাবে উদ্বেলিত করে। নিজ এলাকায় ফিরে, তিনি ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করতে থাকেন। তিনি উপলব্ধি করেন বিশাল পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রের প্রয়োজন।

২৫ মার্চ '৭১ মেজর রফিক তাঁর অধীনস্ত ইপিআর সদস্যদের নিয়ে মিরসরাই এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। যুবক আবু তাহের সশস্ত্র ইপিআর বাহিনীর পাশে থেকে তাঁদের সকল প্রকার সহযোগিতার চেষ্টা করেন। পাকিস্তানীদের প্রবল আক্রমনের মুখে একসময় বাঙালির প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায়। তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের হরিনা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আওয়ামীলীগ নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মেজর রফিকুল ইসলাম। এই ক্যাম্পে অবস্থানকালে জুন মাসে তিনি নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হন। সহস্রাধিক যুবককে লাইনে দাঁড় করিয়ে এর মধ্য থেকে মাত্র ৬০ জন যুবককে মনোনীত করা হয়। এরপর পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পৌছেন। দেড় মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় চট্টগ্রাম বন্দরে

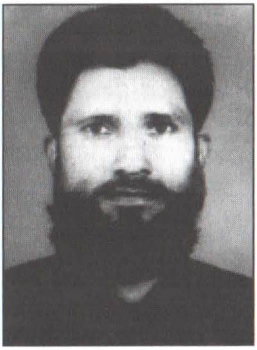
জাহাজ ডোবানোর জন্য ৬০ জন কমাণ্ডো দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে চলে আসেন। সম্পুর্ণ দলটি মিরসরাই পৌঁছানোর পর তিনটি দলে বিভক্ত করে ভিন্ন-ভিন্ন পথে চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিনটি গ্রুপে ৩ জন দলনেতা মনোনীত করা হয়। আবু তাহেরের গ্রুপের দলনেতা ছিলেন আঃ রশিদ। এই দলটি পাকিস্তানী বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়, ফলে তারা 'অপারেশন জ্যাকপটে' অংশ নিতে পারেননি।

এরপর ৮ অক্টোবর, ফারুক-ই-আজম এর নেতৃত্বে আবু তাহের এবং সাইদুর রহমান মন্নু সল্টগোলা থেকে নদীতে নেমে ১৩নং জেটিতে অবস্থানরত শত্রু জাহাজ 'এম.ভি. নাসিম' ধ্বংস করেন। এরপর চট্টগ্রাম বন্দর বহি:নোঙর অপারেশনে অংশ নেন। যে অপারেশনটি ছিল নৌ কমাণ্ডোদের জন্য চরম ট্রাজেডি।

২৬ নভেম্বর, ঢাকার কাঁচপুর ফেরীঘাট অপারেশনে তিনি এবং মতিউর রহমান দু'জন নৌকমাণ্ডো শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়ে রেকী করে দুঃসাহসীকতার সাথে দু'টি ফেরীযান ডুবিয়ে দেন। অত:পর নারায়নগঞ্জে শীতলক্ষ্যায় মিনি লেডি এবং ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার মোহনায় তুরাগ জাহাজ অপারেশনে অংশ নেন। তিনি চার'টি অভিযান দুঃসাহসীকতার সাথে সফল করলেও তাঁকে কোন খেতাব প্রদান করা হয়নি। আবু তাহেরের অভিযোগ, ঝুঁকিপূর্ণ নৌ অভিযানের ধারে কাছে না থেকেও কেহ কেহ বীরত্ব সূচক খেতাব পেয়েছেন। এদের মাঝে কেহ-কেহ অভিযানের নামে নিজ বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন।

আবু তাহের দাবি করেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যুদ্ধের ৫০/৬০ বছর পরও যোদ্ধাদের খেতাব দেয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একবার খেতাব প্রদান করা হয়েছে কিন্তু এই খেতাব প্রদানতো স্থগিত ঘোষনা করা হয়নি। তাই যাঁরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তিনি তাঁদের খেতাব প্রদানের জন্য সরকারের নিকট দাবি করেন। দুই পুত্র এবং একমাত্র কন্যা আমেরিকাতে অধ্যয়নরত। স্ত্রীসহ সকলে আমেরিকাতে বসবাস করছেন এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২৩ মে ২০০০)



মোঃ আব্দুল বারী, পিতা-মৃত মোঃ আব্দুল গণি। গ্রাম-কেল্লাপাথর, ডাক-মাদলা বাজার, থানা-কসবা, জেলা-ব্রাহ্মনবাড়ীয়া। ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।

এস.এস.সি পাশ করার পর ১৯৬৭ সালের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এম-এ হিসেবে ভর্তি হন। ১৯৬৮ সালে করাচীতে নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ হাসপাতাল শিফাতে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে পিএনএস বাবর জাহাজে কর্মরত ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ জানুয়ারি ৯০ দিনের ছুটি নিয়ে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতের আগরতলা মুক্তিযোদ্ধা সদর দপ্তরে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নয় মাসের যুদ্ধ সময়ে তিনি অসংখ্য আহতকে চিকিৎসা এবং সেবা প্রদান করেছেন। অনেক মর্মন্তুদ দৃশ্য, মুক্তিযোদ্ধার ছিন্নভিন্ন শরীরের অংশ, ভিতর থেকে সম্পুর্ণ ভুড়ি বেরিয়ে এসেছে, হাত অথবা একটি পা সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এমন সব যুবককে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে চিকিৎসা সেবা দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি সবসময় ভাবতেন এই দুঃসময়ে আহত যুবকের কোন আপনজন পাশে নেই। তিনি সকলকে ভাইয়ের মত করে নয়টি মাস তাঁদের পাশে পাশে থেকেছেন। সম্মুখ যুদ্ধের চেয়েও তাকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারণ রাত-দিন সবসময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহতরা আসতে থাকত। এই নয় মাসের অনেক হৃদয় বিদারক স্মৃতি আজও তাকে বিচলিত করে। ১৯৮৭ সালে তিনি বাংলাদেশ নৌ বাহিনী থেকে পিও (মেড) হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

(সূত্রঃ আব্দুল বারীর বর্ণনা, তারিখ ১২ মার্চ ২০০০)



মোঃ ফজলুল হক, পিতা-মৃত মোঃ চাঁন মিয়া, গ্রাম- তুলাতুলি, পোষ্ট- পাঁচগাছিয়া, থানা-দাউদকান্দী, জেলা-কুমিল্লা। বর্তমান- অ:সা: লেফটেন্যান্ট। বাংলাদেশ নৌবাহিনী। সদর দপ্তর ঢাকা। জন্ম- ১ মে, ১৯৪৯। ১৯৬০ সালে নিজ গ্রাম তুলাতুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে সাদাবদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৭০ সালে করাচী ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন।

১৯৬৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর, মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। করাচীতে পিএনএস বাহাদুর ও শিফা হাসপাতালে ৩ বৎসর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং এম.এ. প্রথম শ্রেণী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।

১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর, কর্মস্থল থেকে দুই মাসের বাৎসরিক ছুটি নিয়ে নিজ বাড়িতে চলে যান। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে তিনি আর কর্মস্থলে ফিরে যাননি। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আগরতলা চলে যান। পরে হেলিকপ্টার যোগে কলকাতা এবং মে মাসে পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন।

১৭ অক্টোবর ১৯৭১, ৬ জন কমাণ্ডোর দলনেতা হিসেবে তিনি নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর অভিযানে রওনা দেন। এই লক্ষ্যে পলাশী থেকে আগরতলা এসে পৌছেন। এখানে মেজর হায়দার দলটিকে নারয়নগঞ্জ পৌছানোর জন্য নারায়ণগঞ্জ তুলারাম কলেজের ছাত্র আবু বক্কর সিদ্দিক এবং আবুল হোসেন কে তাঁদের পথ প্রদর্শক হিসেবে সাথী করে দেন। দু'জন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধার হাতে ছিল দু'টি এস.এম.জি।

দলটি বুড়িচং, দেবীদ্বার থানাধীন মাসীগাড়া গ্রামের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে। গ্রামের অভ্যন্তরে খালের উপর ছিল কালভার্ট। কালভার্টের সন্নিকটে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ্যাম্বুশ করে বসেছিল। কমাণ্ডো দলটি তাদের এ্যাম্বুশে ঢুকে পড়ে। অকস্মাৎ তাদের প্রতি গুলি বর্ষিত হতে থাকলে গুলিতে কমাণ্ডোরা সকলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাইড ছাত্র দু'জন শত্রুর হাতে বন্দি হন এবং সেখানেই তাঁদের গুলি করে হত্যা করে।

গ্রুপ লীডার ফজলুল হক এর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক হাত ঝুলে পড়ে। আহত অবস্থায় তিনি ধান ক্ষেতের মধ্যে নিঃশব্দে লুকিয়ে থাকেন। দু'জন ছাত্রকে হত্যা করার কয়েক মিনিট পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী স্থান ত্যাগ করে

চলে যায়। মোঃ ফজলুল হক বহুকষ্টে একহাতে আহত হাতটি ধরে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে ভোরবেলা অচেনা গ্রামের একটি মক্তব ঘরের বারান্দায় পাতা চৌকিতে শুয়ে পড়েন। ইমাম সাহেব ভিতরে নামাজে মগ্ন ছিলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি ইমাম সাহেবের নজরে পড়েন। পানি চাইলে তিনি দৌঁড়ে পানি এনে দেন। পাশের বাড়িটি ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডারের বাবার। পেশায় শিক্ষক। সংবাদ পেয়ে এসেই তিনি ডাক্তারের জন্য লোক পাঠান। গোলাগুলির শব্দে তখন সকলে পলাতক। কাউকে না পেয়ে মাষ্টার সাহেব আহত ফজলুল হককে নিয়ে নৌকা যোগে অনেক দূরে চাষারপার গ্রামে পৌঁছে সেখানে গ্রাম্য ডাক্তার দিয়ে তার গুলিবিদ্ধ স্থান পরিষ্কার করে টেনে ভাঙ্গাহাড় বসিয়ে ঔষধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেন। কিন্তু ডাক্তার হিউমারাস বোনের দুইখণ্ড ঠিকভাবে জোড়া লাগাতে পারেননি, ফলে জনাব ফজলুল হকের বাম হাতটি আজও বাঁকা।

১৬ ডিসেম্বর, দেশ স্বাধীন হয়। তিনি পুণরায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু ত্রিশ বছর যাবত যন্ত্রনায় ভুগছেন, চাওয়া পাওয়ার হিসাব মিলাতে নয়। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ভুলুণ্ঠিত হওয়ায়। তিনি আজও অপেক্ষায় আছেন। যদি আর একবার মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হতো? কিন্তু তাতো হবার নয়। একটি জাতির ইতিহাসে একটি প্রজন্মের দূর্লভ সুযোগ আসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার। ফজলুল হক সেই অমৃতের সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কারো একার নয়। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে অঃসাঃলেঃ হিসাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী থেকে অবসর গ্রহন করেন।

(তথ্যঃ এম এফ হক, তারিখঃ ২৬ ডিসেম্বর ২০০০)



মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন, পিতা-মরহুম আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম-শোমসপুর, থানা-খোকসা, জেলা-কুষ্টিয়া। বর্তমান- প্রধান শিক্ষক, আজমপুর উচ্চ বিদ্যালয়, আমলা সদরপুর, কুষ্টিয়া। জন্ম- ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫০।

১৯৬৬ সালে মিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি ১৯৭২ সালে এইচ.এস.সি এবং ১৯৮৬ সালে বিএ পাশ করেন। ১৯৯০ সালে বি এড এবং ১৯৯৪ সালে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন।

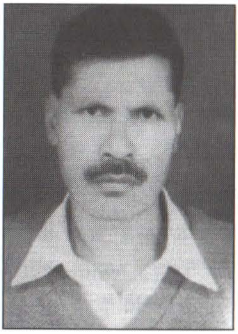
১৯৬৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ডিই/ইউসি হিসেবে ভর্তি হন। করাচীতে পিএনএস বাহাদুর, পিএনএস কারসাজ ও পিএনএস খাইবার এ চাকরি করেন।

১৯৭১ সালের ২৯ জানুয়ারি ৬০ দিনের ছুটি নিয়ে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ২৭ মে প্রশিক্ষক হিসেবে টালিখোলা ইয়ুথ ক্যাম্পে যোগদান করেন। এই ক্যাম্পের সংগঠক ছিলেন লেঃ (অবঃ) মতিউর রহমান নেভী, এমপিএ। মুক্তিযুদ্ধ সময়ে তিনি কুষ্ঠিয়া অঞ্চলে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বনগাঁ ক্যাম্পে অবস্থানকালে তিনি মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নির্দেশে একদল বিদেশী সাংবাদিকসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর বাঙ্কারের সন্নিকটে উপস্থিত হন। বিদেশী সাংবাদিক বুঝে পাকিস্তানীরা গুলি ছুড়তে সাহস করেনি। সারাদিন তাঁরা ঘুরে দেখেন। ক্যাম্পে ফিরলে মতিউর রহমান এমপিএ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

সেপ্টেম্বর মাসে জনাব মোকাদ্দেস হোসেনকে ৯নং সেক্টরের (টাকী) অধীন নেভাল ডেটাচমেন্টে পাঠানো হয়। এখানকার সিও ছিলেন লেঃ এম বি আলম (নেভী)। এখানে ছয়টি যাত্রী বাহী লঞ্চকে গানবোটে রুপান্তরিত করে। এগুলির নামকরন করা হয় (১) বংগবীর (২) বংগশৌর্য্য (৩) বংগবীর্য (৪) বংগবজ্র (৫) বংগবিদ্যুৎ (৬) মনে নেই। রুহুল আমীন বীর শ্রেষ্ঠ এই ডেটাচমেন্টে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তিনি খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে সুপারভাইজার পদে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালে পদত্যাগ করেন। ১৯৮০ সাল থেকে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হন।

(সূত্রঃ তিনি এই তথ্য প্রদান করেন তারিখঃ ২৭ অক্টোবর ১৯৯৯)

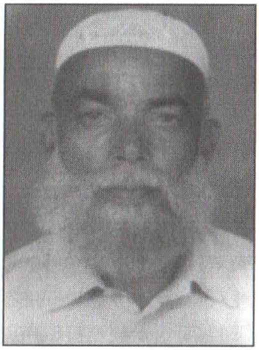


মোঃ আলমগীর শিকদার, পিতা- মৃত আবু জাফর শিকদার। গ্রাম- টিটা, ডাকঘর- কাশিয়ানী, থানা- আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর। ৭ এপ্রিল বনগাঁ ৫নং টালীখোলা ক্যাম্পে যোগদান করেন। পরবর্তীতে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী চলে যান। ট্রেনিং শেষে ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন।

অক্টোবর মাসে মহেন্দ্রনাথ এর নেতৃত্বে গোয়ালন্দঘাট অপারেশনে অংশ নেন। কুষ্টিয়ার ভিতর দিয়ে ফরিদপুর হয়ে রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দের সন্নিকটে হাসন মিয়ার বাড়িতে থেকে অপারেশন সম্পন্ন করেন। এখানে তাঁরা একটি তেলের ট্যাংক ডুবিয়ে দেন।

পরবর্তীতে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ দাস বাবুর অধীনে ৮/১০ জন নৌকমান্ডো ট্রেনযোগে শিলিগুড়ি পৌঁছেন। সেখান থেকে শিকারপুর হয়ে নৌকা যোগে পাবনার প্রফেসর আব্দুল গনির সহযোগিতায় সাতবাড়িয়া এলাকায় আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এখান থেকে নৌকা যোগে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ অপারেশনে যাওয়ার পথে পাকসেনা ও রাজাকাররা সন্দেহ করে গুলি করে তাঁদের নৌকাটি ডুবিয়ে দেয়। তাঁরা সাতরিয়ে পদ্মা দিয়ে ভেসে ফরিদপুর রাজবাড়ীর একচরে এসে উঠেন। পরে আস্তে আস্তে সবাই একত্রিত হন। দাশ বাবুর মৃত্যুর পর আলমগীর এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন সামসুল হক, মহেন্দ্র,বশির। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। বর্তমানে ১৮ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর হাবিলদার হিসেবে কর্মরত আছেন।

(তথ্যঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২৮ জুন ২০০০)



রশিদ আহমদ, পিতা-মৃত গুনু মিয়া সওদাগর। গ্রাম-নারানগিরিপুর, পোষ্ট-রাইখালী বাজার, থানা-চন্দ্রঘোনা, রাংগামাটি। ১৯৪৬ সালের ১ জুন জন্মগ্রহণ করেন। এস.এস.সি পাশ।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা আন্দোলন ঘোষনা করলে তিনি এলাকার আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের সাথে জনগনকে উদ্ধুদ্ধ করতে থাকেন। আন্দোলনের ধারায় `৭১ এর মার্চ মাস চলে আসে। ১ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে শরীক হন।

৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পর তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ২৬ মার্চ চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষনা শোনার পর তিনি ১টি মাত্র রাইফেল ও ৫টি গুলি সহ অলি নামের একটি ছেলেকে সাথে নিয়ে পাশ্ববর্তী চন্দ্রঘোনা থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।

পাশ্ববর্তী গ্রাম ভুল্লুদাঁড়িতে ২জন পাকিস্তানী পুলিশকে দেখে তাদেরকে নিরস্ত্র করে চন্দ্রঘোনা থানায় সোপর্দ করেন। পরদিন থানা কর্তৃপক্ষ দু'জন পাকিস্তানীকে আঃ রশীদের নিকট পুনরায় ফেরত দেয়। তখন এলাকার একজন ১ম শ্রেণীর হাকিম দু'জন পাকিস্তানীকে গুলি করার নির্দেশ দিলে আঃ রশিদ তাই করেন। প্রথম পাকিস্তানীর রক্তে হাত রঞ্জিত করে তাঁর ভিতরে বিদ্রোহ বেড়ে যায়।

এরপর তিনি গ্রামের যুবকদের নিয়ে ১টি দল গঠন করেন। কয়েকদিন পর তাঁদের নিয়ে ভারতের হরিনা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌছেন। কিছুদিন পর ভারতীয় নৌবাহিনীর কয়েকজন অফিসার ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে, যারা সাঁতার জানে তাদের হাত উঠাতে নির্দেশ দিলেন।

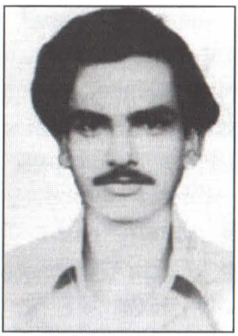
আঃ রশীদ নৌযুদ্ধের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদের পলাশী ক্যাম্পে চলে আসেন। দেড়মাস প্রশিক্ষণ শেষে তিনি চট্রগ্রাম বন্দর অভিযানে ২০ জন কমাণ্ডোর গ্রুপ লীডার মনোনীত হন। এই দলটি সীতাকুণ্ড থানায় আটকা পড়ে। সাথী কোন-কোন যোদ্ধার কারণে তিনি যথাসময়ে চট্রগ্রাম বন্দর পৌছতে ব্যর্থ হন। বয়সে বেশি এমন ২/১জন কমাণ্ডো সম্মুখে পাকিস্তানীদের দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। ফলে তাঁদের পক্ষে অভিযানে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সঙ্গীদের মাঝে দেলোয়ার হোসেন এর কথা তাঁর মনে আছে। অধিকাংশ কমাণ্ডো এখান থেকে ভারত প্রত্যাবর্তন করেন কারণ ১৫ আগষ্ট, সারা বাংলাদেশে নৌ এবং সমুদ্র বন্দরে অপারেশন পরিচালিত সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি চট্রগ্রাম বন্দর বহির্নোঙ্গর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এরপর পলাশী ক্যাম্পে ফিরে সত্য ঘটনা বলার জন্য লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস তাঁকে

কোয়ার্টার গার্ডে পাঠান। এরপর এই দলের যোদ্ধাদের আর কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি। বিজয়ের ঠিক আগে আঃ রশিদ ল্যাণ্ডফোর্সের সাথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। বর্তমানে তিনি নিজ ইউনিয়নের নির্বাচিত জন প্রতিনিধি।

তাঁর এলাকায় প্রফুল্ল ভৌমিকের স্ত্রী প্রভা রানী ভৌমিক পাকবাহিনী কর্তৃক লাঞ্ছিত হন। নেতৃত্বের ভূলে বহ্হিঃনোঙর ব্যর্থ অপারেশনের পর চট্টগ্রামে পাক বাহিনী কর্তৃক মোঃ হোসেন ফরিদ এর মর্মান্তিক মৃত্যু আজও তাঁকে শিহরিত করে।

(১৯৯৯ সালের ২৬ আগষ্ট তিনি লিখিতভাবে এই বর্ণনা দেন)



ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবুল বশর, পিতা- মরহুম হাজী মোঃ সামছুল হক। গ্রাম- ধুম, পোষ্ট- মহাজনহাট, থানা- মিরশ্বরাই, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগ-১, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম। জন্ম- ২১ ডিসেম্বর ১৯৫৪। তিনি নিজ গ্রামের গোলকের হাট প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে মহাজনহাট এফ.আর হাই স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণীতে টেলেন্টপুল স্কলারশীপ লাভ করেন। একই স্কুল হতে ১৯৭০ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭০ সালে তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে ভর্তি হন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে চট্টগ্রামের নিজামপুর কলেজ হতে প্রথম বিভাগে এইচ.এস.সি, ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল) এ সন্তক ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্রলীগের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। স্কুল জীবনে তিনি ছাত্রলীগের স্কুল শাখার সভাপতি, কলেজ জীবনে কলেজ শাখার সহ-সাধারন সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এবং সর্বশেষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারন সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আবুল বশর ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলন থেকে ১৯৬৯ সালের ১১ দফা আন্দোলন সহ সকল আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা সহ সারাদেশে নিরীহ জনগনকে নির্বিচারে হত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধুর আহবানে বাঙ্গালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অতঃপর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

২৯ মার্চ থেকে ক্যাপ্টেন রফিক তাঁর ইপিআর বাহিনী এবং মেজর জিয়া, ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন ভুঁইয়া প্রমুখ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অল্প সংখ্যক জোয়ান ও স্বল্প পরিমান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধে টিকতে না পেরে বাধা প্রদান করতে করতে অবশেষে এপ্রিল মাসেই ভারতের হরিনায় যেয়ে উঠেন।

বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পাকবাহিনীর দখলে চলে যায়। যুবক আবুল বশর বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মে মাসের প্রথমার্ধে ভারতে পাড়ি জমান এবং ১ জুন নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে যোগদন করেন এবং ঐতিহাসিক ভাগীরথী নদীতে বিশেষ পদ্ধতির সাঁতার সহ দুই মাসের এক কঠিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি আগষ্ট মাসে চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরে জাহাজ ডোবানোর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে দলনেতা ছিলেন এ.ডব্লিউ. চৌধুরী এবং এই যুদ্ধে সাহায্য করেন তদানীন্তন ওয়াপদার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব কে. কে. আলতাফ, মিরশ্বরাইয়ের জানে আলম, ছাত্র নেতা মহিউদ্দিন রাশেদ, পটিয়ার ইউনুস সহ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষীয় শক্তির ব্যক্তিবর্গ। ১৫ আগষ্ট '৭১ দিবাগত রাত্রের এই অপারেশনে বশর, জিলানী ও বীর উত্তম মজাহার এই তিনজন বন্দরে ভাসমান বিশাল আকৃতির পাকিস্তানী জাহাজ 'আল-আব্বাস' কে লিমপেট মাইন সংযোজন করে নিমজ্জিত করেন। এদিন চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি জাহাজ নৌ কমাণ্ডোদের দ্বারা নিমজ্জিত হয়।

৯ মাসের যুদ্ধকালীন সবচেয়ে স্মরনীয় ঘটনা হলো একজন নৌকমাণ্ডো বুকে মাইন বাঁধা অবস্থায় বঙ্গোপসাগরে মৃত্যুবরণ করেন। স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখে তৎকালীন চট্টগ্রামের পাক-নেভাল চীফ কমোডোর মমতাজের বাঙালি সম্পর্কে তার বাজে ধারনা আমুল পাল্টে গিয়েছিল। আগষ্ট মাসে তিনি নিজ বাড়িতে যান। জানতে পেরে রাজাকাররা বশরকে ধরতে আসে। এসময় রাজাকারদের সাথে সম্মুখ সমরে প্রতিবেশী হাবিলদার শান্ত মিয়া শহীদ হন।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বশর পুণরায় ছাত্রজীবনে ফিরে যান। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে ১৯৭৯ সালে তিনি কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় নৌযুদ্ধের উপর প্রতিবেদন লেখেন, যা অত্যন্ত সমাদৃত। ১৯৮০ সালের ১৭ জুলাই ইঞ্জিনিয়ার বশর, হাউজিং ও গৃহ সংস্থান অধিদপ্তরের প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী আলহাজ্ব রিয়াজ উদ্দিন আহামদ সাহেবের একমাত্র কন্যা মিসেস বেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি আহমদ কামরুল হাসান রুমী ও আহাম্মদ নাজমুল হাসান মিঠু নামক স্কুল-কলেজে অধ্যায়নরত এই দুই পুত্র সন্তানের জনক।

(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ৩০ আগষ্ট ১৯৯৯)



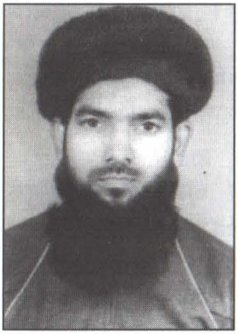
মোঃ জয়নাল আবেদীন, পিতা-মোঃ আব্বাস আলী। গ্রাম- স্বরসতির চর, ডাকঘর- সাতআনি, থানা- দাউদকান্দী, জেলা- কুমিল্লা। যুবক জয়নাল স্কুলে অধ্যয়নকালে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

১৯৭১ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি মতিনগর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখানে প্রায় ৪ মাস কঠিন এবং আত্মঘাতী মূলক কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অক্টোবর মাসে কমাণ্ডো হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে সিলেটের ভাটী অঞ্চলে শত্রুর জাহাজ, ফেরী, গানবোট, লঞ্চ, ব্রিজ ধ্বংসের জন্য যাত্রা করেন। দমদম বিমান বন্দর থেকে ৮জন কমাণ্ডোকে বিমানযোগে ভারতের বালাট আনা হয়। ভারতের শিলং হয়ে তারা সুনামগঞ্জে পৌছেন। সিলেট ছিল রাজাকার অধ্যুসিত এলাকা।

সুনামগঞ্জে তাঁরা প্রথম অপারেশনটি করতে পারেননি। নদীর নীচে এক ধরনের লম্বা লতা তাদের পায়ে জড়িয়ে যেতে থাকে। যারফলে সম্মুখে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁদের জীবন হানীর আশংকা দেখা দেয়। ফলে দলনেতা অপারেশন পরিকল্পনা স্থগিত করতে বাধ্য হন। এরপর তাঁরা তাহেরপুর আর্মি জেটিতে একটি বার্জ ও একটি স্পীড বোট মাইনের সাহায্যে ডুবিয়ে দেন। সেপ্টেম্বর মাসে ধিরাই থানায় একটি বার্জ এবং অক্টোবর মাসে বানিয়াচং এলাকায় একটি গানবোট মাইন লাগিয়ে ডুবিয়ে দেন। এই দলে দলনেতা হাবিবুর রহমান সহ জয়নাল আবেদীন, মেজবাহউদ্দিন চৌঃ এবং আব্দুর রহমানসহ ৮জন নৌকমাণ্ডো ছিলেন। তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ছিল নিকলী থানার অধীন বাইলাবাড়িতে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করে বাইলাবাড়ি সড়কে যোগাযোগ ব্রিজটি তাঁরা এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেন। নভেম্বর মাসে তাঁরা আজমপুরে পাকবাহিনীর একটি গানবোট মাইন লাগিয়ে ডুবিয়ে দেন। এই অপারেশনে দলনেতা হাবিবুর রহমান অল্পের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। পাকবাহিনী তাকে দেখে ঝাকে ঝাকে এলএমজি থেকে গুলি ছুড়লে তিনি ডুব দিয়ে একটি লঞ্চের আড়ালে চলে যান এবং আত্মরক্ষায় সমর্থ হন।

স্বাধীনতার পর জয়নাল আবেদীন টেলিফোন বোর্ডের অধীন চাকরি গ্রহণ করেন এবং এখনও কর্মরত আছেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমাণ্ডো এসোসিয়েশনের দপ্তর সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন করছেন।

(সূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধ ও নৌকমাণ্ডো অভিযান পৃঃ ১৩৪)



জি. এম. এ. রহিম, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। দিনে দিনে বিস্মৃতির অতল গহবরে তলিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক বীরোচিত ঘটনা। একই সাথে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে একে একে হারিয়ে যাচ্ছেন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর যোদ্ধাগন যাঁরা একদিন পৃথিবীর বুকে স্থাপন করেছিলেন দেশ প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এদের মাঝে অনেকেই এখনও জীবন যুদ্ধে সংগ্রামে রত। তাঁদেরই একজন নৌকমাণ্ডো জি, এম, এ রহিম। পিতা-জি এম সাকিমউদ্দিন। ১৯৫৫ সালে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত নকীপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে যখন সমগ্র বাঙালি পাকিস্তানী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর সেই সময় যুবক আব্দুর রহিম দশম শ্রেনীর ছাত্র। মানুষের জীবন গড়ার প্রকৃষ্ট সময় যৌবনকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন জাতির মুক্তির জন্য। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসকদের দুঃশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য স্কুলের বইখাতা রেখে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগদেন।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ। দখলদার বাহিনী সে সময় প্রত্যন্ত সুন্দরবন পর্যন্ত পৌঁছে নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ এবং নারী নির্যাতন শুরু করেছে। সারা দেশের বাতাস বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে। পাকবাহিনীর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে যুবক রহিমের মনও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাথী বন্ধুদের সাথে মিশে একদিন নিজ গ্রাম থেকে অদূরবর্তী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছে তকীপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদেন। দেশের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের উদাহরন সৃষ্টি করতে নৌকমাণ্ডো হিসাবে সুইসাইড স্কোয়াডে নাম লেখান।

তিনমাস কঠোর এবং বিপজ্জনক বিস্ফোরক প্রশিক্ষণ নিয়ে আগষ্ট মাসে মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। বিজয় অর্জন পর্যন্ত অসংখ্য আত্মঘাতী অভিযানে অংশ নিয়ে নিজেকে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরে পরিণত করেন। তাঁর অংশ গ্রহণকৃত যুদ্ধের সংখ্যা বিশের অধিক। এর মাঝে ১২টি নৌযুদ্ধ এবং ৮টি স্থলে। সবকটি যুদ্ধ বৃহৎ এবং ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। পায়ে আঘাত পাওয়াতে একটি মাত্র নৌযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি তবে সেদিনও কভারিং যুদ্ধে যোগদিয়েছেন। এ সব ঘটনা আজ তাকে শিহরিত করে। একদিন নৌকমাণ্ডো দল পানিতে নামারপর দলনেতা সাবমেরীনার গাজী মোঃ রহমতউল্লা বীর প্রতীক এবং বদিউল আলম বীর উত্তম তাঁকে একা নৌকায় রেখে দূরে চলে যান। আঃ রহিমের হাতে একটি ষ্টেনগান। নৌকা বানিয়া শান্তা গ্রামের সর্ব উত্তরে শ্মশান ঘাটের খুটিতে বাঁধা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। শত্রুবাহিনীর প্রতিরোধ

করতে এগিয়ে আসলে আঃ রহিম তার প্রথম স্বীকার হবেন। মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত শ্মশান ঘাটে তাঁর সময় কাটে। যা তাঁরকাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণের চেয়ে কঠিন সময় ছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আব্দুর রহিম, যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের প্রশাসনিক কাজ, যোদ্ধাদের খাওয়া, থাকা চিকিৎসাসহ যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন।

১৯৭২ সালের শেষের দিকে তিনি চলে আসেন ঢাকায়। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও সহযোদ্ধা ডাঃ মাহফুজুল হক এবং অন্য ছাত্ররা আঃ রহিমকে তাদের সংগে রাখেন। নিয়মিত মসজিদে নামাজ আদায় করতে করতে অনেক সময় তাঁকে আজান দিতে হতো। এভাবে চলতে চলতে এক সময় তিনি মিটফোর্ড কলেজ ছাত্রাবাস মসজিদের নিয়মিত মোয়াজ্জিন এবং বর্তমানে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২৭ বছর যাবত এই মসজিদে দায়িত্ব পালনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তিনি বেতন, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট পেয়ে আসছেন। কিন্তু দুঃখ জনক আজও তাঁর চাকরি নিয়মিত করা হয়নি। এজন্য এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল অফিসে অনেক ঘুরেছেন কিন্তু তেলের মিলে যেমন মধু বের হয়না একজন সৎ, উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধা মসজিদের ইমামের জন্য এজি অফিসের কংক্রিটের দেয়াল থেকে সহানুভূতি নিসৃত হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব সূচক খেতাব প্রসংগে তাঁর মত হলো যদি বীরত্ব দেখানোর জন্য সত্যি খেতাব দেয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই খেতাবটি প্রথম তাঁর পাওনা। তাঁর দাবি অযৌতিক হলে এখনও সময় আছে কর্তৃপক্ষ যাচাই করতে পারেন।

বর্তমানে তিন সন্তানের জনক আঃ রহিম স্ত্রী পরিজন নিয়ে কলেজের কমনরুমের বারান্দার এককোনে চৌকি ফেলে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। কোথাও তাঁর নিজের মাথা গোজার ঠাঁই নেই। পিতার ভিটাতে মাথা গোজার জন্য একখানা ঘর বানাতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চাইলে, সাহায্য পাওয়ার পরিবর্তে তাঁকে মনোকষ্ট নিয়ে ফিরতে হয়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বর্তমান চেয়ারম্যান তাঁকে কথা দিয়েছিলেন সোনালী ব্যাংক দশজন মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযুদ্ধে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অবদানের জন্য এক লাখ করে টাকা পুরস্কার দেবে। ৫০০ জন নৌকমাণ্ডোর মাঝে একমাত্র আঃ রহিম মনোনীত হয়েছিলেন। বুকে দীর্ঘ স্বপ্ন এবং আশা নিয়ে তিনমাস মুক্তিযোদ্ধা সংসদে দৌড়ানোর পর তাকে জানানো হয় ব্যাংক এ ব্যাপারে অর্থ যোগান দেবেনা। এখানেও আঃ রহিম নিরাশ হন।

এই হলো এদেশের মুক্তিযোদ্ধার জীবন। এক সময়ের অসমসাহসী তরুণ আজ শ্মশ্রুমণ্ডিত আব্দুর রহিম যার চিত্র। প্রতারনা আর অনিয়মের বিরুদ্ধে তাঁদের যুদ্ধ শুরু হলেও প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে সবকিছুই সমর্পিত হয়েছে।

যুদ্ধ বিজয়ী আঃ রহিমরা জীবন যুদ্ধে পরাজিত তাঁরা বাঁচতে চায়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কর্মকান্ড তাঁরকাছে প্রহসন এবং এই সংগঠনকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতারণার সরকারী হাতিয়ার বলে মনে হয়েছে।

নৌকমান্ডো আব্দুর রহিম হাতে লিখে ২০০ পৃষ্ঠা তাঁর যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। যারমাঝে অনেক অজানা তথ্য রয়েছে কিন্তু সব প্রকাশের সময় এখনও আসেনি। সৎ এবং নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটি নিজের সহস্র কষ্টের মাঝে আজও বন্ধু সহযোদ্ধাদের দুঃখের সাথী। কারও অসুবিধা দেখলে নিজের কষ্টের কথা ভুলে তাঁর দুঃখ সরাতে পাশে দাড়ান। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডো এসোসিয়েশনের নির্বাহী সদস্য। তিনি তিন কন্যার জনক। বড় মেয়ে রহিমা খাতুন এসএসসি পরীক্ষার্থী। দ্বিতীয় মেয়ে ফাতেমা জান্নাত অষ্টম শ্রেণী এবং কনিষ্ঠ কন্যা রওশন আরা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। স্ত্রী মমতাজ বেগম গৃহিনী।

(তথ্যঃ প্রদত্ত বর্ণনা এবং দৈনিক জনকণ্ঠ ১০ জুলাই ১৯৯৭)



লেঃ কমাণ্ডার মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, পিতা-মৃত আবেদ আলী মণ্ডল, গ্রাম-পরমানন্দপুর, ডাকঘর -ডি, কেন্দুয়া, থানা- সরিষাবাড়ী, জেলা- জামালপুর, বর্তমানঃ কমাণ্ডার বা নৌ জাঃ হাজী মহসীন, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা, জন্মঃ ২৯ মার্চ ১৯৪৭। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএ পাশ।

১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর ডিই আনক্লাস হিসেবে রংপুর থেকে তদানিন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহনের জন্য তাঁকে করাচি পাঠানো হয়। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধ শুরু হলে ট্রেনিং অসমাপ্ত রেখে তাঁকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়। এখানে নৌঘাটি বাহাদুর এবং হিমালয়াতে প্রাথমিক ও বেসিক ট্রেনিং এবং ট্রেড কোর্স সমাপ্ত করেন।

পাক ভারত যুদ্ধে তিনি তামঘায়ে জং পদক লাভ করেন।১৯৬৬ সালে অক্টোবর মাসে পি এন এস বাবর জাহাজে ট্রেনিং এ প্রথম হন। এখানে ২ বৎসর থাকার পর পিএনএস হিমালয়ে বদলী হন। ১৯৭০ সালে মাইন সুইপার জাহাজ মোহাফিজ এ বদলী হন।

১৯৭০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তিনি ৬০ দিনের বাৎসরিক ছুটি নিয়ে নিজ গ্রামে আসেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী ছুটি শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে না যেয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। এ সময় তিনি ট্যাকটিক্যাল অপারেটর ক্লাস-১ পদে নিয়োজিত ছিলেন। চাকরিতে যোগদান না করায় কর্তৃপক্ষ তাঁর নামে সমন পাঠায়। কিন্তু চাকরির মায়া না করে ১ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে তিনি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন।

২৫ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীনতা ঘোষনার পর তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হানাদার বাহিনী তার এলাকা দখল করে নিলে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মেঘালয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদেন। এরপর ১১নং সেক্টরের অধীনে ধানুয়া কামালপুর যুদ্ধে অংশ নেন। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে মুক্তিবাহিনী কামালপুর পাকবাহিনীর ঘাঁটি অবরোধ করে রাখে। ১৫ দিন অবরুদ্ধ রাখার পর ৪ ডিসেম্বর শত্রুবাহিনী আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। চাকরিতে পারদর্শিতা এবং নৈপুন্যের জন্য তিনি মুক্তি তারকা, রন তারকা, সমর পদক, বিজয় পদক ও সংবিধান পদক লাভ করেন। ২০ মার্চ ২০০০ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

(তথ্যঃ এম এ কুদ্দুস, তারিখ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৯)

অ. সা. লে. মোঃ কামাল উদ্দিন, পিতা- মৃত মোঃ আহাম্মদ ছোবহান। গ্রাম- উত্তর ইছাখালী, ডাক- মাদাবার হাট, থানা- মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমান-ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফরওয়ার্ড বেস কক্সবাজার, লাইট হাউজ কক্সবাজার। জন্ম-১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। তাঁর পিতা এলাকার একজন গন্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন।

১৯৬৬ সালের ২৬ জুন ডিই/ইউসি হিসেবে কুমিল্লা-তে তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। অতঃপর করাচীতে পিএনএস বাহাদুরে ৬ মাস প্রাথমিক এবং ১ বৎসর বেসিক ট্রেনিং সমাপ্ত করেন। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত করাচী ওয়ারলেস/ আর এস ক্লিনটনে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৯ সালের জুন মাস হতে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পিএনএস শাহজাহান করাচীতে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত পিএনএস রাজশাহী চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে ছিল প্রতিরোধের ঢেউ। পাকিস্তানী জাহাজ 'আল আব্বাস' এবং 'সোয়াত' থেকে পাঞ্জাবী সৈন্যরা গোলাবারুদ নামানোর চেষ্টা করলে জনতা বাঁধা দেয়। পাকিস্তানী সৈন্যরা নির্বিচারে প্রতিবাদমুখী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে। বহু লোক নিহত হয়। এই অবস্থা পর্যবেক্ষন করে মোঃ কামালউদ্দিন কৌশলে জাহাজ পরিত্যাগ করে নিজ গ্রামে চলে আসেন। স্থানীয় জনগণের নিকট বন্দরের অবস্থা বর্ণনা করেন যাতে তারা পাকিস্তানীদের মনোভাব বুঝতে পারে।

২৫ মার্চ, তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং প্রাক্তন সৈনিকদের নিয়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। ২৬ মার্চ, রক্তে রাঙা সূর্য ওঠার সাথে আওয়াজ আসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক। এরপর তিনি মাতবর হাট মাদ্রাসার মাঠে একত্রিত করেন অবসর প্রাপ্ত সৈনিক ও আনসার সদস্যদের।

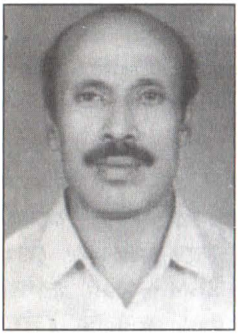
হাবিলদার আবুল বাশার এর অধীনে গঠন করেন গণবাহিনী। ছাত্র-যুবকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। একদল ছাত্রকে সংগঠিত করে সীমান্তের ওপারে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রের জন্য পাঠান। তাঁরা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র নিয়ে এলাকায় ফিরে আঁসে। এই সময় এলাকায় কুখ্যাত রাজাকার খলিল ডাক্তার এবং আবুল কাশেমগং ঝুলন পোল এর নিকট আস্তানা তৈরি করে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগিতায় অসংখ্য নিরীহ মানুষ হত্যা করে ভাসিয়ে দেয় ইছাখালীর খালে।

জুলাই মাসে মোঃ কামালউদ্দিন সহ ৪০ জন প্রাক্তন সেনাবাহিনীর সদস্য ১নং সেক্টরে ক্যাপ্টেন হায়দারের অধীনে হরিনা ক্যাম্পে যোগদান করেন।

সেখান থেকে নৌ এবং বিমান বাহিনীর সদস্যদের পৃথক করে আগরতলা পাঠানো হয়। মোঃ কামাল উদ্দিন নৌবাহিনীতে যোগদানের জন্য আগরতলা থেকে কলকাতা হয়ে হলদিয়া চলে আসেন। এখানে আরও বাঙালি নাবিক সমবেত ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রণতরী 'পদ্মা' এবং 'পলাশ' যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলে তিনি পদ্মা জাহাজের একজন ক্রু হিসেবে নিযুক্ত হন। ১০ ডিসেম্বর পদ্মা এবং পলাশ খুলনার সন্নিকটে বোমার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে অনেক নাবিক শহীদ হন, অনেকে আহত অবস্থায় পানিতে ভাসতে থাকেন। মোঃ কামাল উদ্দিনকে ভাসমান অবস্থায় ভারতীয় গানবোট উদ্ধার করে। এরপর কলকাতায় কমবাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতালে চিকিৎসার পর ৬ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন এবং ৮ জানুয়ারি ঢাকা নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে যোগদান করেন। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি নৌবাহিনী দলের সাথে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অফ অনার জানান। তিনি বলেন ১০ ডিসেম্বর অভিযানে কোন প্রকার ভূমিকা নারেখেও অনেকে বীরত্বসূচক খেতাব পেয়েছেন কিন্তু তিনি যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েও খেতাব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

(সূত্র ঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



মোহাম্মদ নূর হোসেন, পিতা- মৃত মৌলানা মকবুল আহমদ সওদাগর। গ্রাম-ধুম (আলী মিয়া সওদাগর বাড়ী) পোষ্ট- মহাজনহাট, থানা- মিরশরাই, চট্টগ্রাম। ১৯৫০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৬৬ সাল থেকে তিনি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৬৯ সালের অভূতপূর্ব গণআন্দোলনে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বর্তমানে বিমান ও পর্যটন মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিটি মিটিং এবং মিছিলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এসময় তিনি শান্তিরহাট আওয়ামীলীগ শাখার প্রচার সম্পাদক ছিলেন।

২৫ মার্চ, পাকিস্তান বাহিনী নিরীহ বাঙালি হত্যা শুরু করলে তিনি স্থানীয় ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর ও সেনা সদস্যের সাথে শুভপুর ব্রিজের মুখে প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ সম্ভব নয় ভেবে তিনি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারত গমন করেন। প্রথমে শ্রীনগর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। পরে শ্রীনগর থেকে হরিনা ক্যাম্পে পাঠানো হয়। এখানে কিছুদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে চলে আসেন।

এখানে এক মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কমাণ্ডো মতিউর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ জন কমাণ্ডো যশোর এর বাগদা বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। যশোরের একটি স্থানে রাজাকারদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। তাঁরা ফরিদপুর হয়ে ১০ দিন পর বরিশাল শহরের বিপরীতে কর্ণকাঠী গ্রামে অধ্যাপক সাত্তার, অধ্যাপক জামাল এবং মধুদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে ৫/৬ দিন অবস্থান গ্রহণের পর বরিশাল নদী বন্দরে ২টি বার্জ ধ্বংস করেন। এই যুদ্ধে মতিউর রহমানকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করা হয়। বর্তমানে নূর হোসেন, ইঞ্জিন টেনডল হিসেবে আনাম লাইনার্স লিঃ এর এম.টি. পানকৌড়ি জাহাজে কর্মরত আছেন।

(তথ্য সূত্র ঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখ ২৬ আগষ্ট ৯৯)



মোঃ আতাহার উদ্দিন তালুকদার, পিতা-মৃত আফছার উদ্দিন তালুকদার, গ্রাম- বটকাজল, থানা- বাউফল, জেলা- পটুয়াখালী। নিজগ্রামে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ২য় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। বরিশাল এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয় হতে অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে বরিশাল জিলা স্কুল হতে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি এবং ১৯৬৯ সালে ঢাকা কলেজ হতে দ্বিতীয় বিভাগে এইচ.এস.সি পাশ করেন। ১৯৭৬ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চট্টগ্রাম হতে ২য় শ্রেণীতে বি এস সি ইঞ্জিনিয়ারিং তড়িৎ ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬৯ সালে ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন কালে ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এসময় দেশব্যাপী ছাত্র ও গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রনেতা জনাব তোফায়েল আহমদের আস্থাভাজন কর্মী হিসেবে সর্বদা তাঁর সাথে মিছিল ও মিটিংএ অংশ নিয়েছেন, ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের জন্য। এরপর চলে আসে ৭০ এর নির্বাচন এবং '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ।

৭ মার্চ, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জনসভায় যোগদান করেন। সেদিন বাঙালিকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ হতে দেখেছেন যুবক আতাহার উদ্দিন ভেবেছেন জাতির স্বাধীনতাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা।

২৫ মার্চের পূর্বে তিনি ঢাকা ত্যাগ করে পটুয়াখালী নিজগ্রামে চলে যান। এখানে স্থানীয়ভাবে স্কুলের শরীরচর্চা শিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। এ সময় উপলব্ধি করেন স্বাধীনতা আনতে হলে অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। ১৭ মে, হানাদার বাহিনী পটুয়াখালী শহরে প্রবেশ করে। তিনি জনাব কে.এম. নূরুল হুদা (বর্তমান যুগ্ম সচিব) ও ইউসুফ আলী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ জন্য কিছু টাকা ও কলেজের পরিচয় পত্র মুচি দ্বারা স্যান্ডেলের তলায় অতিরিক্ত চামড়া লাগিয়ে সেলাই করে নেন। ১৯ মে, ৩ জন, ফজর নামাজের পর নিজ গ্রাম ছেড়ে পায়ে হেঁটে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে অনেক রকম প্রতিকূল এবং তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ২৫ মে ভারতের হিঙ্গলগঞ্জ এসে পৌঁছেন। বিএসএফ কর্তৃপক্ষ তাঁদের ৩ জনকে হাসনাবাদ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ২৬ মে, ৩ জন তকিপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। তাঁরা ২৬ মে থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। ২৩ জুন, আতাহারউদ্দিন নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে ২৪ জুন, পলাশীতে পৌঁছেন এবং অপর দুই বন্ধু কে.এম. ইউসুফ আলী ও নূরুল হুদা স্থলবাহিনীর প্রশিক্ষণ

গ্রহণ করতে চাকুলিয়া চলে যান।

তিনমাস প্রশিক্ষণ শেষে ৯ সেপ্টেম্বর ৪৫ জন কমান্ডোকে ব্যারাকপুর হয়ে হাসনাবাদ আনা হয়। বাগেরহাট, মাদারীপুর ও বরিশাল এলাকায় অপারেশন পরিচালনার জন্য। ৪৫ জনকে ৩ দলে বিভক্ত করে ৩ স্থানে পাঠানো হয়। বরিশাল অভিযানে ১২ জন কমান্ডোকে দলনেতা সৈয়দ আবুল বাশার এর নেতৃত্বে পাঠানো হয়। আতাহার উদ্দিন বরিশাল অভিযানে অংশ নেন। ১২ নভেম্বর, তিনি বরিশাল কির্তনখোলা নদীতে একটি বৃহৎ তেলের ট্যাংক ডুবিয়ে দেন। এরপর ২৯ নভেম্বর ঝালকাঠির সন্নিকটে দোয়ারিকা ফেরী ডোবানোর জন্য তাঁকে পাঠানো হয় কিন্তু এই ফেরীটি ছিল দু'টি কাঠের নৌকা জুড়ে তৈরি। কাঠের সাথে চুম্বকযুক্ত লিমপেট মাইন স্থাপন সম্ভব নয় ভেবে অপারেশন পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়। এরপর তিনি ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের নেতৃত্বে কর্ণকাঠি ও দপদপিয়া দু'টি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর তিনি শিক্ষা জীবনে ফিরে যান। ১৯৭৬ সালে সহকারী প্রশিক্ষণ প্রকৌশলী হিসেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯৭৯-৮০ বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৮৫-৮৭ সৌদি আরবে একটি কোম্পানিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে চাকরি করেন। বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে (বিউবো) খুলনাতে কর্মরত আছেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য স্বাধীনতা বিরোধী দালালরা শত্রুবাহিনীর হাতে তার ছোটভাই আজহারউদ্দিন তালুকদারকে ধরিয়ে দেয়। শত্রুরা তাঁর ভাইএর উপর অত্যাচার চালানোর পর নির্মমভাবে হত্যা করে।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ৬ মার্চ ২০০০)



মোঃ শাহজাহান সিদ্দিকী, বীর বিক্রম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা নবীনগর থানার সাতমোরা গ্রামের জনাব আব্দুর রাজ্জাক মাষ্টারের ছেলে শাহজাহান সিদ্দিকী। মেট্রিক পাশ করেন ১৯৬৫ সালে। এইচ.এস.সি তে উত্তীর্ণ হন ১৯৬৭ সালে। '৭১ সালে যুদ্ধের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে শাহজাহান সিদ্দিকী ভারতে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদেন। সেখান থেকে নৌকমান্ডো হিসেবে পলাশীর প্রান্তরে ভাগীরথী নদীতে ট্রেনিং নেন।

ট্রেনিং শেষে শাহজাহান সহ অনেক নৌ-কমান্ডোকে আগরতলা হয়ে ত্রিপুরায় আনা হয়। পাহাড়ঘেরা এক নৌ ট্রানজিট ক্যাম্পে আসেন শাহজাহান অন্যান্যদের সাথে। ট্রানজিট ক্যাম্পটি 'নিউ ক্যাম্প' নামে পরিচিত ছিল।

এ ক্যাম্পে মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন হায়দার, ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ কমান্ডার রায়, কমান্ডার সামন্ত প্রমুখ সেনানায়কদের সাথে পরিচিত হন শাহজাহান। এরা প্রায়ই ক্যাম্পে আসতেন। কমান্ডোদের খবরাখবর নিতেন। ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং ও আসতেন মাঝে মাঝে।

আগস্ট মাসের ৫/৬ তারিখ হবে। একদিন ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লেঃ দাশ এলেন ক্যাম্পে। ডেকে নেন শাহজাহান সিদ্দিকীকে। দায়িত্ব দেয়া হলো দাউদকান্দি ফেরীঘাট অপারেশনের। যুদ্ধের দিক হতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ঢাকার সাথে ময়নামতি সেনানিবাসের যোগাযোগ রক্ষা হচ্ছিল প্রধানত এ ফেরী ঘাটের মাধ্যমে। চট্টগ্রাম হতে অস্ত্র গোলাবারুদ ঢাকায় যাচ্ছিল এদিক দিয়ে। এই ফেরীঘাটটি ধ্বংস করতে পারলে হানাদারদের চরম ক্ষতি হবে।

দাউদকান্দী ফেরী অপারেশনের দায়িত্ব বুঝে নেন শাহজাহান সিদ্দিকী। অপারেশনটির প্রস্তুতির সময় ও আঘাত হানার সময় নির্ধারন করবে হেডকোয়ার্টার। শাহজাহান সিদ্দিকীকে একটি রেডিও সহ সংকেত জানিয়ে দেয়া হলো। সিগন্যাল ও সময়ের ব্যাপারটি জানলেন শুধু শাহজাহান। দলের অন্য কেউ নয়। নিরাপত্তার খাতিরে এ ব্যবস্থা। অপারেশন পরিচালনার জন্য উপ দলনেতা মনোনীত হন মতিউর রহমান বীর উত্তম।

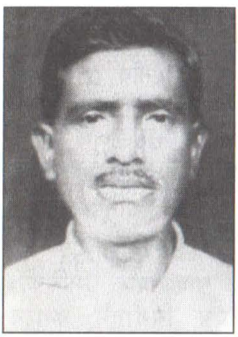
পুরো দলের জন্য অস্ত্র বরাদ্দ ছিল ১টি স্টেনগান, ১টি রেডিও, প্রতি সদস্যের জন্য ১টি করে লিমপেড মাইন, ১ জোড়া ফিনস্ ও ১টি করে কমান্ডো নাইফ।

আগস্টের ১১ কি ১২ তারিখ হবে। দলসহ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢোকেন তিনি।ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকে ক্যাম্প হতে এনে কুমিল্লার কংশনগরের পূর্ব দিকে সীমান্তের কাছে নামিয়ে দেয় নৌযোদ্ধাদের। সাথে আরও

৮/১০ জন স্থল বাহিনীর গেরিলা। যারা তাঁদের নিরাপত্তার জন্য মনোনীত।

মধ্য আগস্টে পথ প্রদর্শকের নির্দেশ মত সীমান্ত হতে কিছু পথ পায়ে হেটে, কিছু পথ নৌকায় করে দাউদকান্দি বন্ধরামপুরে পৌছেন শাহজাহান। সাথে অস্ত্রসহ পুরো দল। তিনি নয়জন কমাণ্ডোসহ দাউদকান্দীতে ১৬ আগস্ট একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন ফলে ফেরীঘাটের পল্টুনটি বিধ্বস্ত হয়। যুদ্ধোত্তর প্রশাসনিক ক্যাডারে যোগ দেন। একজন সৎ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। সবসময় ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরন করেছেন। ১৯৯৫ সালে জেলা প্রশাসক হিসেবে ময়মনসিংহে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের বিদেশী দূতাবাসে কমার্শিয়াল কনস্যুলার হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী। তিন সন্তানের জনক শাহজাহান সিদ্দিকী। দাউদকান্দি ফেরী পল্টুন ডোবানোর জন্য সরকার তাঁকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতি একদিন উদ্ভাসিত হবে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

(১৯৯৫ সালে সাক্ষাতকার গৃহীত)



মোঃ ওয়ালিউল্লা হাওলাদার, পিতা-মোঃ মদন আলী হাওলাদার। গ্রাম-গৈজ্যা, ডাকঘর-ভেদরগঞ্জ, থানা-ভেদরগঞ্জ, জেলা-শরীয়তপুর। জন্ম তারিখঃ ০২-৩-১৯৫২।

১৯৬৯ সাল থেকে গণআন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। ছাত্রাবস্থায় তার নেতৃত্বে ভেদরগঞ্জ থানাসহ সরকারী অফিস সমূহ আক্রমনে নেতৃত্ব দেন। এসময় আন্দোলনে তার সাথী ছিলেন আব্দুল হাই, আনোয়ার হোসেন, মিন্টু, আব্দুল আজিজ কালু প্রমুখ। সরকারী অফিস ভাঙচুরের ফলে তাঁর বিরুদ্ধে কেস এবং গ্রেপ্তারী পরোওয়ানা জারী হয়।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর তিনি ষ্টুয়াড মুজিবের নেতৃত্বে মাদারীপুর কলেজ মাঠে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু করেন। ১০ এপ্রিল, তিনি ষ্টুয়াড মুজিবের নেতৃত্বে ২৬০ জন যুবকের সাথে লঞ্চ যোগে এবং পায়ে হেঁটে ভারতে পৌছে মুক্তিযুদ্ধে যোগদেন। এরপর নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১৫ আগষ্ট চট্টগ্রাম বন্দর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। অত:পর তিনি বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর প্রাইভেট চাকরিতে যোগদেন। বর্তমানে বেকার জীবন যাপন করছেন।

(তথ্যঃ লিখিত বর্ণনা এবং অডিও সাক্ষ্যৎকার, তারিখঃ ২৮ আগস্ট ১৯৯৯)



নায়েব সুবেদার মোঃ এনামুল হক, পিতা- মোঃ জমির উদ্দিন খলিফা। গ্রাম-বাহের চর, ডাকঘর- জমিতপুর, থানা- দাউদকান্দী, জেলা- কুমিল্লা। বর্তমান- ৪৩, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সাভার, ঢাকা। এস.এস.সি পাশ। ১৯৭১ সালে চৌদ্দগ্রাম হাই স্কুলের ছাত্রাবস্থায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২৫ মার্চ, হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি নিধন শুরু করলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ২৩ এপ্রিল ভারতের হাতিমারা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখান থেকে সীমান্তের বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।

নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ লাভের পর তিনি সুবেদার নূরুল আজিম চৌধুরী (২য় বেঙ্গল) ও নায়েব সুবেদার আব্দুল গফুর ইপিআর এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। রাধাগঞ্জ বাজার, নয়াচর, শহরের বাজার, হাসনাবাদ বাজার এবং চরশোবব্দি বাজারের আশ্রয় কেন্দ্রে থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার বদ্দারচর ব্রিজের নীচে অবস্থানরত গানবোট এবং ব্রিজটি ধ্বংস করতে অপারেশনে অংশ নেন। এরপর ১০ নভেম্বর, হাটুভাঙ্গা ব্রিজ অপারেশন করেন। এখানে শত্রুবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয়।

অক্টোবর মাসে ভৈরবে গৌরীপুর রেল ষ্টেশনটি এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেন। এসময় পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এরপর ২২ সেপ্টেম্বর খানাবাড়ি ব্রিজ অপারেশন, আক্টোবর মাসে বেলাব বাজারে শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ এবং সর্বশেষ ৬ ডিসেম্বর পুটিয়া বাজারে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এই সকল যুদ্ধে তার সহযোদ্ধা ছিলেন নৌকমাণ্ডো বাদশা মিয়া, নজরুল ইসলাম, মোয়াজ্জেম হোসেন। বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার জালাল আহমেদ (সিগন্যালস), ২য় বেঙ্গলের সিপাহী হাবিবুর রহমান ও এলাহী বক্স, ইপিআর আলী আজগর এবং বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা এবং মুক্তিযোদ্ধা গয়েজ আলী মাষ্টার। তাঁর মনে পড়ে এ সময় স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁরা হাটুভাঙ্গা ব্রিজ অপারেশন করার পর সেই সংবাদটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। তাঁর এলাকার কুখ্যাত রাজাকার গেদু মিয়ার সহিংসতার কথা আজও তাকে শিহরিত করে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন। বর্তমানে নায়েব সুবেদার হিসেবে সাভার সেনানিবাসে কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ তিনি এই বর্ণনা প্রদান করেন, তারিখঃ ১৪ আগষ্ট ১৯৯৮)



মোঃ শাহজাহান মিয়া, (১৩-১০-৫৫), পিতা- মৃত মনির আহমেদ। গ্রাম-বাড়ীয়াখালী, ডাকঘর-দারোগাহাট, থানা-মিরসরাই, চট্রগ্রাম। বর্তমান-রাঙ্গুনিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাঙ্গুনিয়া, চট্রগ্রাম। শিক্ষাগত যোগ্যতা- এইচ.এস.সি পাশ।

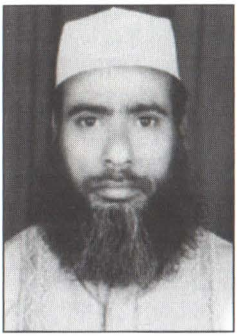
১৯৭১ সালে যুবক এবং ছাত্রাবস্থায় নিয়মিত আন্দোলনে অংশ নেন। মার্চ মাসের পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত গমন করেন। মে মাসে ত্রিপুরা রাজ্যের হরিনা যুব ক্যাম্পে ভর্তি নন। আগষ্ট মাসের শেষ দিকে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন কমান্ডো মরহুম ডাঃ শাহ আলম বীর উত্তম, খোরশেদ আলম বীর প্রতীক, আবুল বশর, আবু বক্কর সিদ্দিক, এমদাদ হোসেন মতিন প্রমুখ এর নিকট।

অক্টোবর মাসে তিনি অভিমন্নু মন্ডলের নেতৃত্বে গোয়ালন্দ ঘাট অপারেশনে অংশ নেন। যশোর বাগদা সীমান্ত দিয়ে ৪টি দল একসাথে প্রবেশ করে দু'টি দল বরিশাল ও ঝালকাঠি এবং অপর দু'টি দল আরিচা এবং গোয়ালন্দ ঘাট অপারেশনের জন্য। এ দু'টি দল স্থানীয় গাইডের অধীনে পাংশা থানার কারিকর পাড়ায় এক আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখান থেকে নৌকা যোগে গোয়ালন্দ রাখাল গাদির চরে এসে উঠেন। এই দলে ছিলেন ৬ জন কমান্ডো অভিমন্নু মন্ডল, শাহজাহান মিয়া, আলমগীর শিকদার, সিরাজ, ফারুক আহমেদ ও মাহবুব। তাঁরা গোয়ালন্দে ১টি তেলের ট্যাংকার ডুবিয়ে দেন।

ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে তিনি দ্বিতীয়বার ফ্লাঃ লেঃ জামাল চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মুক্তিযোদ্ধা দলের সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এই দলের সাথে ৬ জন নৌকমান্ডো ছিল। কমান্ডো ফজলুল হক, শাহজাহান মিয়া, আলমগীর সিকদার, মহিউদ্দিন, আব্দুল হক ও এনামুল হক। ১৪ ডিসেম্বর, তারা বোয়ালমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে পৌছেন। তখন এলাকা মুক্ত হয়ে যাওয়ায় কমান্ডার নির্দেশে সাথের মাইনগুলি পাশের পুকুরে বিস্ফোরন ঘটান হয়।

স্বাধীনতার পর তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। এখনও কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ তিনি এই বর্ণনা প্রদান করেন, তারিখঃ ৯ আগষ্ট ১৯৯৫)

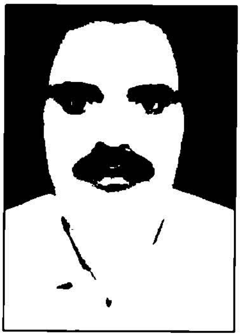


মোঃ শফিকুর রহমান, পিতা-হাজী মোঃ সরু মিয়া। গ্রাম-গোবিন্দপুর, পোষ্ট-পীর যাত্রাপুর, থানা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা। বর্তমান-কনস্টেবল নং-৬৭১, চাঁদপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ি, লঞ্চঘাট, জেলা-চাঁদপুর। জন্ম- ১৫ জুন ১৯৫২। দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। '৭১ সালে হানাদার বাহিনী কর্তৃক বুড়িচং থানায় অগ্রাভিযান কালে ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন (জিয়া হত্যা মামলায় ফাঁসী দেয়া হয়) এর নেতৃত্বে গোমতী নদীর তীরে মালাপাড়া গ্রামে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এপ্রিলের ৪ তারিখ তিনি ভারতের মতিনগর যুব ক্যাম্পে যোগ দেন। এখানে ক্যাপ্টেন মতিউর, ক্যাপ্টেন হায়দার, লেঃ মাহবুব এর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন হায়দার তাকে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী প্রেরণ করেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর নভেম্বর মাসে কমাণ্ডো মতিউর রহমান বীর উত্তমের নেতৃত্বে ৩০ জন নৌ কমাণ্ডোর একটি দলকে বরিশাল নদী বন্দরে অপারেশনের জন্য পাঠানো হয়। শফিকুর রহমান এই দলের সদস্য ছিলেন। তাঁরা বরিশাল শহরের ২ কিলোমিটার দক্ষিণে খাদ্যবাহী দু'টি টাগ ডুবিয়ে দেন। এই অপারেশনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য মতিউর রহমানকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করা হয়।

শফিকুর রহমান স্বাধীনতার পর পুলিশ বিভাগে কনস্টেবল পদে চাকরি গ্রহণ করেন। এখনও একই পদে কর্মরত আছেন।

(তথ্যঃ সফিকুর রহমান, তারিখঃ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



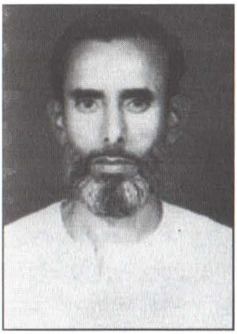
মোঃ আবুল হোসেন, পিতা-হাজী হাবিবউল্লা, মাতা-আমিরের নেছা। গ্রাম-তালুয়া চাঁদপুর, থানা-বেগমগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী। ১৯৫৫ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর বজরা উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। বাবার আর্থিক অনটনে পড়াশুনা এগোয়নি। প্রথমে এলাকাতে ব্যবসা শুরু করেন কিন্তু সফল না হতে পেরে ১৯৬৯ সালে কাজের সন্ধানে ঢাকা চলে আসেন। সেই সময় থেকে ঢাকাতে রড বাইন্ডার হিসেবে কাজ করতে থাকেন। তখন ঢাকা আন্দোলনে উদ্বেলিত। মাঝে মধ্যে আবুল হোসেন মিছিলে যোগ দিতেন।

১৯৭০ সালে জামান সাহেবের নেতৃত্বে প্রতিটি মিটিং এবং মিছিলে যোগ দিতে থাকেন। মার্চ মাসে যেদিন পল্টন ময়দানে ছাত্ররা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে আবুল সেই মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন। ২৫ মার্চ, গণহত্যা শুরু হলে তিনি ঢাকা ত্যাগ করে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ২০ এপ্রিল, ভারতের টাকী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন।

মে মাসের ১২ তারিখ, নৌবাহিনীতে লোক ভর্তির জন্য সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়। ৫০০০ যুবকের মধ্য থেকে মাত্র ৮৫ জন যুবককে এই প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়। তার সঙ্গী ছিলেন মীর মোশতাক আহমেদ রবি, খলিলুর রহমান, মহসীন আলী, আলফাজউদ্দিন, আঃ গফফার, আঃ সেলিম, ইমাম বারী প্রমুখ। পলাশীতে তিনমাস ট্রেনিং শেষে ১৫ আগষ্ট চট্রগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ নেন। ১৯ অক্টোবর তিনি একযুদ্ধে ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

স্বাধীনতার পর পুণরায় নিজের কর্মজীবনে ফিরে যান। দু'বছর বিদেশে ছিলেন। বর্তমানে বেকার জীবন যাপন করছেন।

(তথ্য সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২৬ আগষ্ট ২০০০)



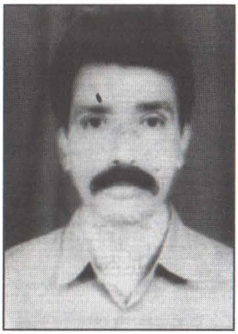
মোঃ বশীর আহমেদ, পিতা-মোঃ রইসউদ্দিন। গ্রাম- শেখেরমারী, ডাক- দামকুরাহাট, থানা- রাজশাহী, জেলা- রাজশাহী।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর ভারতের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী চলে যান। সেখানে প্রশিক্ষণ শেষে ৮ থেকে ১০ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম যুদ্ধ জাহাজ 'পদ্মা' ও 'পলাশ' এর খুলনা অভিযানকালে তিনি পলাশের একজন সাহসী নাবিক হিসেবে অবস্থান করছিলেন। অক্টোবর মাসে তিনি পলাশ জাহাজে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১০ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় যৌথ বাহিনীর ৪টি গানবোট খুলনার শীপ ইয়ার্ডের নিকট পৌঁছলে ভারতীয় বিমান থেকে বোম্বিং এবং খুলনা শীপ ইয়ার্ড থেকে পাকিস্তান বাহিনীর হেভী মেশিনগানের গুলিতে অনেকে শহীদ এবং অধিকাংশ নাবিক আহত হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভারতীয় গানবোট বশির আহমদকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে কলকাতা হাসপাতালে ভর্তি করে। তাঁর হীপের একপাশের মাংস সম্পুর্ণ কেটে পড়ে যায়। পায়ে বোমার স্পিলিন্ট ঢুকে হাড় ভেঙ্গে যায়। সেখান থেকে পঙ্গু এবং কর্মহীন অবস্থায় জীবন যাপন করছেন।

১৯৯৫ সালে পত্রিকায় তাঁর উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁর পুত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োগ দেন। তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাষ্ট থেকে যুদ্ধাহত হিসেবে কোন ভাতা পাননা।

(সূত্রঃ তিনি এই বর্ণনা প্রদান করেন, তারিখঃ ৭ জুন ১৯৯৫)



শেখ মোহর আলী, পিতা-মৃত শেখ ছাকাওয়াত আলী। গ্রাম-হায়বাতপুর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা। ১৯৫৫ সালের ৭ই নভেম্বর নিজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১ম বিভাগে এস.এস.সি পাশ করেন।

১৯৭১ সালে মোহর আলী বয়সে যুবক ছিলেন। কিন্তু পাকহানাদার বাহিনীর অত্যাচার এবং নির্বিচারে গণহত্যা দেখে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তিনি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে গমন করেন।

প্রথমে ২৪ পরগনা জেলার টাকী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। এখান থেকে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌকমাণ্ডো ক্যাম্পে উপস্থিত হন। এখানে তিনমাস প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়বার অক্টোবর মাসে মীর মোশতাক আহমেদ রবির নেতৃত্বে সিলেট অঞ্চলে অভিযানে অংশ নেন। এই দলে ছিলেন আবু বক্কর ছিদ্দিক, এস.এ মজুমদার, সত্যেন বিশ্বাস সহ ১০ জন নৌ কমাণ্ডো। এখানে তাঁরা দামান চা বাগানে অভিযান চালিয়ে চা তৈরির মেশিনটি সম্পুর্ণ ধ্বংস করেন। এছাড়াও তাঁরা এখানে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন।

স্বাধীনতার পর ১৯৮০ সাল থেকে তিনি দলিল লেখক হিসেবে কর্মরত। বর্তমানে কলারোয়া সাব রেজিষ্ট্রি অফিস, কলারোয়া, জেলা- সাতক্ষীরাতে একই কাজে দায়িত্ব রত আছেন।

(তথ্য সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা ও অডিও রেকর্ডিং, তারিখঃ ২৯ জুলাই ১৯৯৯)



আবু মুসা চৌধুরী, ১৯৭১ সালে ছিলেন এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। মাত্র ষোল বছরের এক কিশোর। মুসার বাবা সোলতান আহমদ চৌধুরী ছিলেন বৃটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের একজন কর্মী। প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মুসা তাঁর বাবাকে হারান। বাবার কথা মুসার তেমন স্মরন নেই। মুসা ক্লাস সেভেনে যখন উঠেন তখন তার মা মারা যান। এর পর তিনি তার বাড়ি ফটিকছড়ির পাইন্দং ইউনিয়নের হাইদচকিয়া গ্রাম হতে চলে আসেন নারায়ণ হাটে। তার ফুফুর বাড়ীতে। ভর্তি হন নারায়ণহাট বাজার হাই স্কুলে।

হাবিবুর রহমান সিকদার। মুসার ফুফাত ভাই। আওয়ামীলীগ করতেন। জনাব সিকদারের ওখানে চট্রগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগ নেতারা প্রায়ই আসতেন। চট্রগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগ নেতা এম এ আজিজ, আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী, এম এ হান্নান প্রমুখকে অনেকদিন দেখেছেন মুসা, তার ফুফাত ভাইয়ের সাথে বৈঠক করতেন।

এ রাজনৈতিক পরিবেশ তাকে রাজনীতিতে আকৃষ্ট করে। একদিন চট্রগ্রাম জেলা ছাত্রলীগ নেতা সাবের আহম্মদ আসগরী মুসাসহ অনেক ছাত্রকে নিয়ে বৈঠক করেন। শোষণের, নির্যাতনের কথা বলেন। বৈঠক শেষে ছাত্রলীগ গঠনের কথা বলেন। ছাত্রলীগ পশ্চিমা শোষণের বিরুদ্ধে প্রধান সংগঠন ধারনা দেন। বাঙালি জাতির গৌরবের কথা তুলে ধরেন। পশ্চিমারা এ জাতিসত্ত্বা বিকাশের প্রধান অন্তরায়। তাই তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে বলে জানান। সাবেরের বক্তব্যে মুসাসহ সব ছাত্র অভিভূত হলেন। ছাত্রলীগ কমিটি তৈরী হল।

১৯৭০ সালে মুসা নারায়নহাট বাজার হাই স্কুল কমিটির সভাপতি হন। একই সাথে তিনি ফটিকছড়ি উত্তর জোন কমিটির সভাপতি হন। মূসা তখন দশম শ্রেনীর ছাত্র। ছাত্রলীগের মাধ্যমে এ সময় হতেই তিনি স্বাধীনতার বক্তব্য দিতে শুরু করেন। ৬ দফা না হলে স্বাধীনতা। এটাই ছিল বক্তব্য।

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাস। নির্বাচনের পরের মাস। আওয়ামীলীগের সভা সমিতি থামে না। একের পর এক সভা চলে গ্রামে। মূসাও বক্তব্য দেন মাঝে মাঝে। ৬ দফা না হলে এক দফা। ৬ দফা মানবেনা পাকিস্তানী শাসকরা। তাই এক দফা চাই।

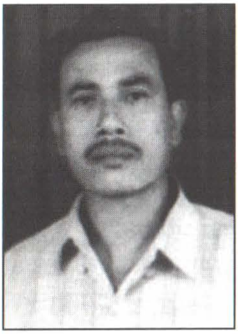
১ মার্চ হতে ২৫ মার্চ প্রতিদিনই মিছিল করেছেন মূসা। তার সাথীদের নিয়ে স্বাধীনতার শ্লোগান দিয়েছেন। ২৫ মার্চ রাতে শহর হতে খবর আসে।

স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছে। বংগবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন। এলাকায় মাইকে তা প্রচারিত হল। এ রাতেই বাঙালি ইপিআরদের শহরের দিকে যেতে দেখলেন মূসা। এলাকার লোকেরা অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাদের। ইপিআর সৈন্যরা সীমান্ত হতে আসছেন। অপরদিকে মেজর ক্যাপ্টেন। এক অসম যুদ্ধ। একদিন পাকবাহিনী নারায়ণহাট পৌঁছে তিন দিক হতে আক্রমন করে। বাঙালি সেনারা পিছু হটে রামগড়ে চলে যায়। মূসাও পৌঁছেন রামগড়। আবার নারায়নহাটে আসেন মূসা। সেখানে দেখা পান এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধূরী। এছাড়া ছিলেন ফারুক-ই আজম, আমানুল্লাহ চৌধুরীসহ প্রায় ১০০ জনের মত একটি দল। তাদের সাথে মূসা সাবরুম পৌঁছেন। সাবরুম পৌঁছার পরদিনই নেভাল কমাণ্ডো হিসেবে ট্রেনিং এর জন্য নির্বাচিত হন। চলে যান ভাগীরথী নদীর তীরে। ট্রেনিং নেন। তৈরী হন অপারেশনের জন্য। মূসার প্রথম অপারেশন আউটার এ্যাংকরেজ। মূসা ভারত যান এ অপারেশনের পর। অপারেশন এর ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষন করেন। বাদানুবাদ হয় সাবমেরীনার এ ডব্লিউ চৌধুরীর সাথে। যুদ্ধের সময় এটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। মূসার সাথে মনোজ ও তাহের একই অপরাধে অভিযুক্ত হন। তিনজনকে একই সাথে কোয়ার্টার গার্ডে দেয়া হয়। কোয়ার্টার গার্ড হল শাস্তির একটি পদ্ধতি। কোয়ার্টার গার্ডে থাকা অবস্থায় এ তিনজনের সাথে দেখা করলেন চার যুদ্ধ নায়ক। পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের বি এম শর্মা, সাবেক সিং, কর্ণেল রব, মেজর রয়। কর্ণেল রব বাঙালি, বাকি ৩ জন ভারতীয়। যুদ্ধ নায়করা এ কিশোর বয়সী তিন যোদ্ধার সাথে কথা বললেন। এর কয়েকদিন পরই এদের কোয়ার্টার গার্ড হতে মুক্ত করে দেয়া হল। ফারুক-ই-আজমকে দলনেতা করে একটি টিমে তাঁদের যুক্ত করা হল। এরপর থেকে এ ডব্লিউ চৌধুরীকে অপারেশনে পাঠানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। মিরস্বরাই হয়ে নৌ যোদ্ধাদের এ দলটি শহরে পৌছে। আশ্রয় নেয় কাকলীতে। কাকলীর মালিক এনায়েত মাওলা। দলনেতা ফারুক কাকলীতে থেকে যান। মূসা মনোজ চলে আসেন চকবাজারে। সবুজ হোটেলের সামনে একটি বাড়ীতে। দলনেতা ফারুক অপারেশনের প্ল্যান তৈরী করছেন।

পূর্বের নৌ অপারেশন হয়েছে নদীর ওপার হতে। সাঁতরিয়ে এপারে আসতেন যোদ্ধারা। মাইন লাগিয়ে ওপারে ফেরত যেতেন। আগের অপারেশনে যোদ্ধাদের সংখ্যাও থাকত অধিক। পূরাতন এ পদ্ধতির কথা পাকবাহিনী বুঝে যায় তারা নৌ অপারেশন বন্ধ করতে সেভাবেই ব্যবস্থা নেয়। কড়া পাহারা বসায় নদীতে। লক্ষ্য রাখে ওপার হতে কোন কিছু আসছে কিনা। সব চাইতে সতর্ক অবস্থায় থাকে জোয়ার ভাটার সংযোগ সময়ে। তাই দলনেতা অপারেশন প্ল্যানের রদবদল করেন কিছুটা। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যথাসম্ভব কম সদস্য দিয়ে অপারেশন করাবেন। সম্ভব হলে নদীর এপার থেকে নৌ যোদ্ধারা অপারেশন করবেন। এতে পাকিস্তানীদের কড়া প্রহরা ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে।

এর মাঝে খবর আসে দুটো জাহাজের। একটি জাহাজের নাম MANA এটি আমেরিকান এক কোম্পানীর নিয়ন্ত্রিত একটি জাহাজ। অপর জাহাজের নাম AVLOUSE। গ্রীক জাহাজ। গুপ্তাখালের মুখে বেঁধে রাখা হয়েছে এটিকে। দুটো জাহাজই টার্গেট। মুসার সহযোদ্ধা মনোজ কুমার দত্ত, পিতা-ধীরেন্দ্র কুমার দত্ত, গ্রাম-ধূম, ডাকঘর-মহাজনহাট, মিরশরাই, চট্টগ্রাম। এই দুজন কমান্ডো দলনেতা ফারুক-ই আজম এর সাথে পরামর্শ করে এ দুটি জাহাজ ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় পাকিস্তানের অকৃত্রিম বন্ধু ছিল আমেরিকা। এ জাহাজ দুটোকে আঘাত করতে পারলে এ দু'টো সরকার পাকিস্তানের উপর কিছুটা হলেও আস্থা হারাবে। ঠিক হল গুপ্তাখাল দিয়ে জাহাজ দু'টোকে আক্রমণ করা হবে। মনোজ MANAকে আঘাত করবেন। মূসা করবেন AVLOUSE কে। প্ল্যান চূড়ান্ত হল নূরুদ্দিনের বাড়ি পৌছেই মূসা এবং মনোজ অপারেশনে যাত্রার প্রস্তুতি নেন। ফারুক লিমপেট মাইনগুলো বেধে দেন যোদ্ধাদের কোমরে। দু'যোদ্ধার পরণে তখন কাপড় বলতে শুধু মাত্র জাঙ্গিয়া। উদ্যোম শরীর। যাওয়ার মূহুর্তে দূ'জন এক জোড়া করে ফিন্স নেন। ফারুক-নূরুল হক কল্যারহাট হতে চলে আসেন। সূযোগের অপেক্ষায় থাকলেন দু'নৌকমাণ্ডো। আট দশ মিনিট পর যাত্রা শুরু করেন দু'জন। ছোট খালটি যেখানে গুপ্তাখালে পড়েছে তার কাছেই চেকপোষ্ট। অল্প সময় পরই দু'জন পৌঁছে যান গুপ্তাখালে। আট দশ মিনিট পর জাহাজের ইঞ্জিন যেখানে থাকে তার কাছাকাছি যান মূসা। দু'টো মাইন জাহাজের পরিস্কার করা অংশে বসান। মনোজ MANA জাহাজের দিকে যেতে তীব্র স্রোতের সম্মুখীন হলেন। এগোতে পারছেন না। এক ডুবে মনোজ AVLOUSE এর কাছে ফিরে এলেন। একই পদ্ধতিতে মাইন লাগান। দ্রুত লাগালেন। দ্রুত চললেন ওপারে। মূসা আগেই অপর পাড়ে যেয়ে পৌঁছেন। এ সময়ই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিকালে মূসা আসেন কাকলীতে। দলনেতা ফারুক বুকে জড়িয়ে ধরেন মূসাকে। মনোজও ফিরে আসেন। এরপর মূসা এবং মনোজ আরো বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেন। মূসা বর্তমানে আমেরিকাতে অবস্থান করছেন। মনোজ নিজ গ্রামে ঔষধের ব্যবসায় নিয়োজিত।

(সূত্রঃ বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম)



শেখ আব্দুল কাদের, পিতা-মৃত শেখ ইব্রাহিম। গ্রাম- বাজুয়াগড়, ডাক- রতনপুর, থানা-কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা। জন্ম- ১৬ জুলাই ১৯৫৩।

১৯৭১ সালে দৌলতপুর সরকারী কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়ন কালে দেশব্যাপী ছাত্র ও গণ আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় কলেজে ক্লাস হতোনা। শহরে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে তিনি নিজ গ্রামে চলে যান। কিন্তু একসময় শত্রুবাহিনী এবং স্থানীয় দালালরা গ্রামের যুবকদের হত্যা এবং স্বাধীনতার পক্ষের জনগণের গৃহে লুটপাট, অগ্নি সংযোগ ও নারী ধর্ষন শুরু করে। যুবক আব্দুল কাদের এইসব দৃশ্য দেখে তাদের ঘৃণ্য কাজের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে তিনি গ্রামের কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের তকীপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আঃ কাদের সহ ৪৫ জন যুবক নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হন। পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ২ মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর হিরন পয়েন্ট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ১২ জন নৌকমান্ডো দলের জন্য নির্ধারিত গাইড মেজর জিয়াউদ্দিন এই কমান্ডো দলকে হিরন পয়েন্ট না নিয়ে উজিরপুর তার ক্যাম্পে নিয়ে একমাস বসিয়ে রাখেন। ফলে হিরন পয়েন্ট অভিযান ব্যর্থ হয়।

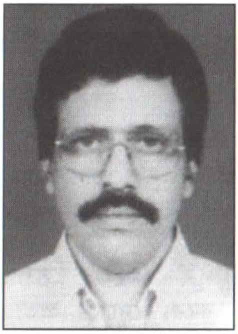
একমাস পর ১২ জন কমান্ডো মেজর জিয়াউদ্দিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ক্যাম্প ত্যাগ করে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সাতক্ষীরা জেলার হরিনগর নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের দলটি পাকিস্তান গানবোটের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পাকিস্তানী গানবোটটি প্রভুত ক্ষতি স্বীকার করে পালিয়ে যায়।

এরপর শেখ আব্দুল কাদের খুলনার উপকণ্ঠে বটিয়াঘাটা থানার সম্মুখে একটি দুঃসাহসিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেন। এর নেতৃত্ব ও পরিকল্পনাকারী ছিলেন গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ বীর প্রতীক।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে রহমতউল্লাহ সাহেব জানতে পারেন যে, বটিয়াঘাটা থানার সম্মুখে নদীতে একটি ল্যাণ্ড ক্রাফট এবং গানবোট অবস্থান করছে। তিনি শেখ আঃ কাদেরকে স্থানীয় এক ব্যক্তির সাথে মৌলভীর পোষাক পরে শত্রুর মধ্য দিয়ে রেকী সম্পন্ন করে সেইদিনই অপারেশন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনে কেবল ৪ জন কমান্ডোকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। শেখ আব্দুল কাদের এই অভিযানে সফল হন। ল্যাণ্ড ক্রাফটি সম্পুর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়।

স্বাধীনতার পর তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন। বর্তমানে তিনি স্থানীয় কাটুনিয়া রাজবাড়ি কলেজে অধ্যাপনা করছেন। আব্দুল কাদের এক কন্যা এবং দুই পুত্রের জনক। স্ত্রী মিসেস হাছিনা বানু রানু একজন সুগৃহিণী।

(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২ সেপ্টেম্বর ২০০০)



মোঃ কামাল উদ্দিন, পিতা- মোঃ আবুল হোসেন। গ্রাম-তুলাতলী ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

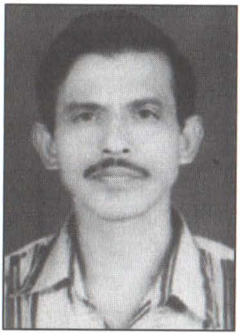
১৯৭১ সালে গণআন্দোলনে অংশ নেন। সেসময় কামালউদ্দিন বয়সে তরুণ। তবুও পাকিস্তানীদের অত্যাচার তাকে প্রতিবাদী করে তোলে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে তিনি শ্রীনগর বর্ডার অতিক্রম করে হরিনা ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখানে ২০/২৫ দিন থাকার পর আগষ্ট মাসে পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে যোগদান করেন।

নভেম্বর মাসে আরিচা ঘাট আক্রমনের জন্য প্রেরিত হন। দলনেতা ছিলেন কমাণ্ডো এনামুল হক। ৮/৯ দিন পায়ে হেঁটে দলটি গোয়ালন্দ চরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে ৩/৪ দিন থেকে অবস্থা পর্যবেক্ষন করে নভেম্বর মাসের ২০/২২ তারিখে গোয়ালন্দ ঘাটে একটা ফেরী এবং একটা লঞ্চ ডুবিয়ে দেন।

এরপর তারা পুণরায় আরিচা ঘাটে অপারেশন করার জন্য একই আশ্রয়ে অবস্থান করতে থাকেন। ২/৩ দিন অবস্থানের পর ২৬ নভেম্বর সকালে তিনজন ছদ্মবেশে আরিচা ঘাটে গেলে রাজাকাররা সন্দেহ করে তাঁদের তিনজনকে ধরে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তাঁদের উপর নির্মম অত্যাচার করেও কোন তথ্য বের করতে পারেনি। এরপরও তাঁদের গুলি করে মারার প্রস্তুত নিতে থাকে। এসময় একজন মেজর তাঁদের ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। কামাল উদ্দিন বন্দি তিনজনের মধ্যে একজন। ছাড়া পেয়ে তাঁরা পুনরায় ভারত চলে যান।

স্বাধীনতার পর তিনি ঈশাখা ঘাঁটিতে আসেন। এখানে এ.ডব্লিউ চৌধুরী সহ ৪/৫ জন কমাণ্ডো কর্ণফুলী নদী থেকে ৫/৬ বস্তা টাকা উদ্ধার করেন। এগুলি পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণের পূর্বে ধ্বংস করার জন্য নদীতে ফেলেছিল। পরবতীর্তে তিনি বি.টি.সি. সিগারেট প্রস্তুত কারখানায় চাকরি গ্রহণ করেন। এখনও উক্ত কোম্পানির ঢাকা কারখানায় কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ তিনি এই তথ্য প্রদান করেন, তারিখঃ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



নির্মল বিজয় বালা, পিতা- অনাদী নাথ বালা। গ্রাম-টুংগীপাড়া, জেলা- গোপালগঞ্জ, জন্ম -২১ জানুয়ারি ১৯৫৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা আই কম, সি ইন এড।

পাকিস্তানী দুঃশাসন এবং নির্মমতার বিরুদ্ধে এ দেশের ছাত্র সমাজ দুঃসাহসিকতার সাথে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ করে। ছাত্র এবং যুবকরা কোন নির্দেশের অপেক্ষা নাকরে পূর্ব থেকেই সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছে যায়।

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন মহকুমা টুংগীপাড়ার নিভৃত গ্রাম যেখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মলাভ করেন। বঙ্গবন্ধু শৈশবের চঞ্চল দিনগুলি কাটিয়েছিলেন তাঁর পৈত্রিক ভিটায়। সেখানে '৭১ সালে স্থানীয় ছাত্র যুবকরা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তোলেন। ২৬ মার্চ, এই ছাত্ররা বংগবন্ধুর পিতার বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। ছাত্র এবং টগবগে যুবক নির্মল এর নেতৃত্ব দেন।

২৭ মার্চ, পাকবাহিনী বঙ্গবন্ধুর বাড়ির মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ঘেরাও করে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে ফেলে। বন্দিদের মাঝে ছিলেন কাজী তোরাফ হোসেন, শেখ আরশাদ আলী, শেখ মন্টু সহ ৭ জন। প্রথমে তাঁদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় পরে তাদের চোখ বেঁধে লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে।

এরপর নির্মল এলাকায় থাকা নিরাপদ নয় ভেবে ৩০ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কল্যানী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চারমাস থাকার পর বনগাঁ চলে আসেন। আওয়ামীলীগ নেতা লেবু মিয়া তাঁকে চাকুলিয়াতে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠান। একমাস প্রশিক্ষণ শেষে পুনরায় কল্যানী ফিরে আসেন। সেই দিনই নৌযুদ্ধে প্রশিক্ষণের জন্য শতাধিক যুবককে পলাশীতে নিয়ে যায়। নির্মল এই দলভুক্ত হন।

এখানে প্রশিক্ষণ শেষে মিত্রবাহিনীর সাথে পথ প্রদর্শক (গাইড) হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন চিন্ময়কান্তি মণ্ডল। তাঁর এলাকায় স্বাধীনতা বিরোধীদের মাঝে পাটগাতী ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান শেখ নুরু মিয়া। '৭১ সালে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল।

নির্মল বিজয় বালা বর্তমানে পাটগাতী মুন্সীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

(তথ্য সূত্র ঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২৭ জুলাই ১৯৯৯)



তপন মুখার্জী, পিতা-স্বর্গীয় শান্তি রঞ্জন মুখার্জি। গ্রাম- তারপাশা, ডাক- কীর্তিপাশা, জেলা- ঝালকাঠি। বর্তমান- কুমুদিনী হাসপাতাল, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। ১৯৫৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি নিজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এইচ.এস.সি পাশ করার পর মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। স্বাধীনতা উত্তর আর লেখাপড়ায় মন বসাতে পারেননি।

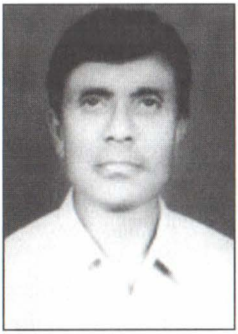
ছাত্র জীবনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ৬৯ সালে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানসহ মিটিং, মিছিল এবং স্বাধীনতার পক্ষে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করেন।

২৫ মার্চের পর ঝালকাঠি থানা থেকে ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন সকল অস্ত্র এনে একসাথে প্রশিক্ষণ শুরু করে। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে আটঘর কুড়িয়ানা গ্রামে পাক হানাদার বাহিনী লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, হত্যা, নির্যাতন শুরু করলে সেসময় প্রায় ১০০ ছাত্র, যুবক, পুলিশ, আনসার, সেনাসদস্য হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। এখানে দু'জন পাক সেনা নিহত হয় এবং তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এরপর তিনি প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রের জন্য ভারতে যান। কলকাতায় আব্দুর রব সেননিয়াবাতের সহযোগিতায় একদিনে ১৭০০ ছেলেকে বিহারের চাকুলিয়াতে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠান। তপন মুখার্জী এইদলে চাকুলিয়াতে প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান। প্রশিক্ষণ শেষে কল্যাণী সেনানিবাসে ফেরত আসলে লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য তপন সহ ১৪০ জন যুবককে পলাশীতে নিয়ে যান। ৪টি রিজার্ভ বাসে তারা পলাশী পৌঁছেন। এখানে একমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নভেম্বর মাসের শেষ দিকে ৩০ জন কমাণ্ডোকে মংলা বন্দর অভিযানে পাঠানো হয়। তপন এই দলে অন্তর্ভূক্ত হন। গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ এই দলটিকে বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে ৪ ডিসেম্বর মংলা বন্দরে একটি মালবাহী জাহাজ ডোবানোর জন্য পাঠান। এটিই ছিল মংলা বন্দরে নৌ কমাণ্ডোদের শেষ অপারেশন।

স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি ঝালকাঠি মহকুমা কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। এসময় বাকশাল গঠিত হলে তিনি বাকশালে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। ২ বছর পলাতক থাকার পর ৭৮ সালে জিয়াউর রহমান এর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে যেয়ে কারাবরণ করেন। '৮৪ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে দীর্ঘদিন কারাবরন করেন। কমিউনিষ্ট পার্টি ভেঙ্গে গেলে '৯০ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। বর্তমানে কুমুদিনী হাসপতালে সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

(তথ্য সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২৬ আগষ্ট ১৯৯৯)



মোঃ ইসহাক ভূঁইয়া, পিতা-মোঃ মঞ্জু ভুঁইয়া, গ্রাম-কুঞ্জশ্রীপুর, থানা-গুনবতী, থানা-চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা। বর্তমান-চীফ ইলেকট্রিক্যাল আর্টিফিসার, বি.এন.এস ওসমান, চট্টগ্রাম। জন্ম-৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৪, শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি। ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা। ১৯৭২ সালের ৯ অক্টোবর ডি.ই.ইউ.সি পদে যোগদান করে বি এন এস ঈশাখান ও বি এন এস শহীদ মোয়াজ্জেম এ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত আছেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, তিনি নিজ গ্রামে অবস্থান করছিলেন। সে সময় তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেনীর ছাত্র। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সর্বত্র গণহত্যা শুরু করলে তিনি এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তায় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ছোত্তাখোলা ক্যাম্পে যোগ দেন। এখানে অল্প প্রশিক্ষণ লাভের পরই বিলোনিয়া সীমান্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুন্সীর হাট ভুঞা বাড়িতে ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটানা ৯ দিন যুদ্ধ চালিয়ে যায়। বেংগল রেজিমেন্টের সাথে ৩০ জন এফ এফ ও ছিল। মোঃ ইসহাক ভুঞা ৩০ জন এফ এফ এর মাঝে একজন ছিলেন। ৯ দিন যুদ্ধ চালিয়েও পাকিস্তান সেনাবাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের সুদৃঢ় বাঙ্কার থেকে পিছু হটাতে না পেরে, শত্রুবাহিনী হেলিকপ্টারের সাহায্যে মুক্তিযোদ্ধাদের পিছনের অবস্থানে সৈন্য অবতরন করায়। পিছন থেকে এল এম জি ও বাঙ্কারে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে মুক্তিবাহিনীকে অবস্থান থেকে পিছু হটাতে সমর্থ হয়। এই যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনী অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

এই সময় ছোত্তাখোলা ক্যাম্পে ১৩০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ১৯ এপ্রিল পুনরায় বেংগল রেজিমেন্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এই যুদ্ধে স্টুডেন্ট কোম্পানী থেকে ৭০ জন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধাকে বাছাই করে বেংগল রেজিমেন্টের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কুমিল্লার সোনাইমুড়িতে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে একটানা তুমুল যুদ্ধ হয়।

এই ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় ১০০ জন যুবককে বাছাই করে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১০০ জন নৌকমান্ডোর একটি দল তিন ভাগে বিভক্ত করে বরিশাল, আরিচা ও

সিরাজগঞ্জের জন্য পাঠানো হয়। যশোর জেলার বয়রা সীমান্ত দিয়ে ১০০ জনের দলটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

বরিশাল অপারেশনের জন্য নির্দিষ্ট ৩০ জন নৌ কমান্ডোর দলনেতা ছিলেন কমান্ডো মতিউর রহমান। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মতিউর রহমান একজন ট্রাকটর ড্রাইভার ছিলেন। ১০০ জন নৌ কমান্ডোর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ৮নং সেক্টরের সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নাজমুল হক আরও ১০০ জন স্থল বাহিনীর গেরিলাকে বিভক্ত করে ৩টি গ্রুপের সঙ্গী ও পথ প্রদর্শক হিসেবে নিযুক্ত করে দেন।

যশোর সীমান্ত ছেড়ে সম্পুর্ণ দলটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর যশোর জেলার কোন একস্থানে মুক্তিবাহিনীর দলটি রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এখানে ৩ জন রাজাকার নিহত হয়। বাকীরা পালিয়ে যায়।

মোঃ ইসহাক ভুঁইয়া মতিউর রহমান এর নেতৃত্বে ৩০ জন কমান্ডো দলের সাথে নভেম্বর মাসের শেষদিকে বরিশালের সন্নিকটে বাকলা গ্রামে তৎকালীন চেয়ারম্যান এর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বরিশাল শহর থেকে বেশ দূরে নিরাপদ স্থানে দু'টি ছোট মালবাহী জাহাজ অবস্থান করছিল অপর ক্ষুদ্রাকৃতির লঞ্চটি শহরের ১ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল। তাঁরা শহরের নিকটস্থ ১টি জাহাজে মাইন লাগাতে ব্যর্থ হন।

৩ জনের এক একটি গ্রুপকে প্রতিটি জাহাজের জন্য দলনেতা নিরাপদ দূরত্ব থেকে জাহাজে মাইন লাগানোর জন্য পাঠান। অন্ধকার রাতে জাহাজে মাইন লাগাতে নৌকমান্ডোদের কোন সংশয় এবং অসুবিধা ছিল না। অপারেশনে দু'টি টার্গেট বিধ্বস্ত হয়। শহর থেকে দূরের জাহাজটিতে মাইন স্থাপনের জন্য ইসহাক ভুঁইয়া নির্দিষ্ট হয়েছিলেন। বরিশাল অপারেশনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য মতিউর রহমানকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করা হয়।

এই অপারেশন শেষে মোঃ ইসহাক ভুঁইয়া নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন কিন্তু এলাকায় পাকিস্তান বিরোধীদের ভয়ে এবং পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি পুণরায় ভারতের রামনগর ক্যাম্পে ফিরে যান। ১৬ ডিসেম্বরের পর নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ৫ নভেম্বর ১৯৯৯)



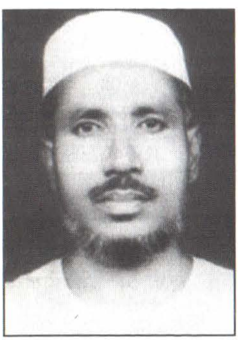
মোঃ লুৎফর রহমান, (১-০১-১৯৫২), পিতা-এম নূর খান। গ্রাম- চাঁদপুর, পোষ্ট- নয়াহাট, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর। বর্তমান-জেলা সঞ্চয় অফিস ব্যুরো, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা। এস.এস.সি পাশ।

জুন মাসের মাঝামাঝি পলাশী নৌ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন। দেড়মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট সাবমেরীনার বদিউল আলমের নেতৃত্বে চাঁদপুর ডাকাতিয়া নদীতে অবস্থানরত ৬টি পণ্যবাহী জাহাজ ও বার্জ ডোবাতে সক্ষম হন। চাঁদপুরের আশ্রয় স্থল করিম খাঁর বাড়ি থেকে ১৮ জন কমান্ডো রাত ২টায় রঘুনাথপুর গ্রাম থেকে পানিতে নেমে পড়েন। অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অপারেশন সফল হয়। দলের উপনেতা ছিলেন। নৌকমান্ডো আলী আশরাফ এবং সালাউদ্দিন বীর উত্তম।

অক্টোবর মাসে পুণরায় সাবমেরীনার আমিনউল্লাহ শেখ এর নেতৃত্বে চাঁদপুর নদীবন্দরে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এই সকল যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন, ফজলুল কবির, আব্দুল হাকিম বীর প্রতীক, অরুন ভট্টাচার্য।

স্বাধীনতার পর তিনি চাকরি গ্রহণ করেন এবং এখনও কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ তিনি এই বর্ণনা প্রদান করেন, তারিখঃ ২৮ আগষ্ট ১৯৯৮)



মোঃ রেজাউল করিম, পিতা-মৃত বজলুল করিম। গ্রাম-পাচবাড়িয়া, থানা-বেগমগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী।

১৯৫০ সালের ১০ জুলাই নিজ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন এলাকার সমাজসেবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি। মোঃ রেজাউল করিম গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক এবং সর্বশেষ বিএ ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে যখন দেশব্যাপী গণআন্দোলন তুংগে সেই সময় তিনি খুলনা নিউজ প্রিন্টমিলে অবস্থান করছিলেন। ১ মার্চ

থেকে বংগবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে তিনি হাজার হাজার জনতার সাথে প্রতিটি প্রতিবাদী মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

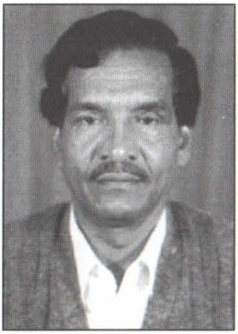
মার্চ মাসের ২০ তারিখে খুলনায় অবাঙালি এবং বিহারীরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট হয়ে খলিশপুর এবং দৌলতপুর এলাকায় বাঙালি নিধন, লুটপাট এবং অগ্নি সংযোগ শুরু করে। এসময় অনেক বাঙালি শহর ত্যাগ করতে থাকে। রেজাউল করিম খুলনা থেকে নিজ গ্রামে এসে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলেন। এলাকার ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।

১২ জুন তিনি এলাকার ছাত্র যুবকদের একটি গ্রুপ সহ ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। প্রথমে ত্রিপুরা রাজনগর যুব ক্যাম্পে যোগ দেন, পরে মেলাঘর চলে আসেন। এখানে মেজর হায়দার নৌ কমান্ডোতে ভর্তির জন্য শত শত যুবককে রৌদ্র সাগরে সাঁতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ১০১ জনকে মনোনীত করেন। রেজাউল করিম প্রতিযোগিতায় প্রথম সারিতে থাকেন।

এরপর পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। সেখানে ট্রেনিং সমাপ্ত করে নভেম্বর মাসে কমান্ডো মতিউর রহমান এর নেতৃত্বে ৩০ জন কমান্ডো দলের সাথে বরিশাল নদী বন্দর অভিযানে অংশ নেন। তাঁদের দলটি যশোর বয়রা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ফরিদপুর হয়ে পায়ে হেটে ১০ দিন পর বরিশাল কাউয়ার চর গ্রামে পৌঁছে। এখানে কীর্তনখোলা নদীতে দু'টি খাদ্যবাহী জাহাজ ডোবানোর পর তিনি নিজ এলাকায় চলে আসেন। সোনাইমুড়ি থানা স্বাধীন হয় ১৯ ডিসেম্বর। এই যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। পুনরায় ভারত হয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষে খালিশপুর নৌঘাটিতে এসে যোগদেন। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর কমান্ডো খলিলুর রহমান খুলনা থেকে তাঁদেরকে ঢাকায় পাঠান।

বর্তমানে সহকারী শিক্ষক হিসাবে শাকতলা ছিদ্দিকীয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় কর্মরত আছেন।

(তথ্য সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



মোঃ আব্দুর রহিম, পিতা-মরহুম মোঃ আলী বক্স বেপারী। গ্রাম- কোড়ালতলী, থানা- ভেদরগঞ্জ, জেলা- শরীয়তপুর। বর্তমান- শ্রমিক নেতা। ইউ, এম, সি পাটকল, নরসিংদী।

১৯৭১ সালের পূর্ব থেকে পাটকলে ম্যাকানিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নরসিংদী শিল্প এলাকা হওয়াতে এখানে শ্রমিক আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার ছিল। আব্দুর রহিম এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখে ছিলেন। ৭ মার্চ তিনি বংগবন্ধুর ঐতিহাসিক জনসভায় যোগদেন। সেখান থেকে নিজ গ্রামে চলে যান। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় ষ্টুয়ার্ড মুজিব ১৬০ জন যুবককে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে লঞ্চযোগে নোয়াখালীর নসিংপুর নামক স্থানে পৌছেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ফেনী হয়ে বেলুনীয়া সীমান্ত অতিক্রম করে সোনাইমুরী বিএসএফ ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হন।

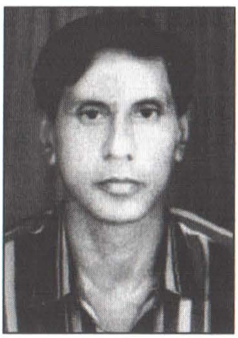
এখানে একমাস ট্রেনিং গ্রহণের পর একদিন কর্ণেল শওকত আলি, এমপি, ক্যাম্পে এসে আঃ রহিমসহ ২৫ জনকে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করে পলাশী পাঠিয়ে দেন। ৩ মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আঃ রহিমকে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর অভিযানে পাঠানো হয়। অপারেশন শেষে পলাশী ফেরার পর লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস আঃ রহিম সহ কয়েক জনকে পৃথক ভাবে ভিন্ন আর একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কয়েকদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তাদেরকে জানানো হয় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ অপারেশন করতে হবে।

একদিন আহসানউল্লা বীর প্রতীকের নেতৃত্বে ট্রাকযোগে তাঁরা ১০/১২ জন কমাণ্ডো জিএম মার্টিস সহ ভারতের জলংগি থানায় এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে নৌকা যোগে ব্রিজের দিকে যাত্রা করেন। পাবনার রূপপুর থানার মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার ওয়াছেব এই দলকে গাইড করছিলেন। সাবমেরীনার আহসানউল্লা তিনবার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ধ্বংসের জন্য হানা দেন কিন্তু অনিবার্য কারণে প্রতিবার বিফল হন।

বিফল হয়ে পলাশী যাবার কয়েকদিন পর কাছড়পাড়া মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন রশীদ পলাশী ক্যাম্পে উপস্থিত হন কয়েকজন নৌ কমাণ্ডোকে তাঁর সাথে নিযুক্ত করার জন্য। কমাণ্ডার মার্টিস আঃ রহিম সহ কয়েকজন ক্যাপ্টেন রশীদের সাথে পাঠিয়ে দেন। লক্ষ্য ছিল রাজশাহীর আড়ানী রেল ব্রিজটি ধ্বংস করা। ১ রমজান তারা আড়ানী ব্রিজটি ধ্বংস করেন। এরপর তাঁকে পাঠানো হয় নারায়নগঞ্জ। ৮ জন কমাণ্ডো দলের নেতা তিনি। গাইডের সাথে সোনার গায়ের অলিপুর, মুছারচর, জাংগালিয়া এলাকায় থেকে কাঁচপুর

ফেরী ধ্বংস এবং বিশ্ব গোডাউনের নিকট গম ভর্তি জাহাজ ডুবিয়ে দেন। সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জ এর দক্ষিণে শীতলক্ষ্যা নদীতে আরও একটি খাদ্যভর্তি জাহাজ ডুবিয়ে দেন। প্রতিটি অপারেশন সংঘটিত হয় একটি গ্রুপের মাধ্যমে। তিনি এই গ্রুপের লিডার ছিলেন।

(তথ্যঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ৮ আগষ্ট ১৯৯৯)



ইউসুফ সিকদার, পিতা- মৃত মুজিবুল হক। গ্রাম- সাতঘরিয়া, থানা- সন্দ্বীপ, জেলা- চট্টগ্রাম। বর্তমান- ব্লক-এ, লাইন- ৯, বাসা নং-১১, হালিশহর হাউজিং এষ্টেট, চট্টগ্রাম। জন্ম- নিজ গ্রামে ১৯৫২ সালের ২ জানুয়ারি। সন্দ্বীপ কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। কলেজ জীবনে তিনি ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী এবং কলেজ ছাত্রলীগের নির্বাহী সদস্য ছিলেন। ১৯৬৯ সালের ছাত্র ও গণআন্দোলনে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ৮ মে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সন্দ্বীপ ত্যাগ করেন। ১০ মে, হরিনা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌছে মুক্তিযুদ্ধে নাম অর্ন্তভূক্ত করেন। এখানে তিনি ১৫ দিন মেডিকেল কোরে ট্রেনিং গ্রহণ করেন।

অতঃপর তাদের ক্যাম্পে নৌকমাণ্ডোতে ভর্তির জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়ে মনোনীত করার জন্য যুবকদের সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। প্রতিযোগিতায় ইউসুফ শিকদার প্রথম হন। ডাক্তারী পরীক্ষাও করা হয়। ৩০ জন যুবক আগরতলা হতে বিমানে গোহাটি দমদম বিমান বন্দর এবং সেখান থেকে ট্রাকে পলাশী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে এসে পৌছেন । এখানে নৌকমাণ্ডো গ্রুপের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ১৫ আগষ্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। নভেম্বর মাসে তাঁর দ্বিতীয় এবং শেষ অপারেশন ছিল মতিউর রহমানের নেতৃত্বে বরিশাল নদী বন্দরে জাহাজ ডোবানো। দুটি অভিযানেই তিনি সফল এবং কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন।

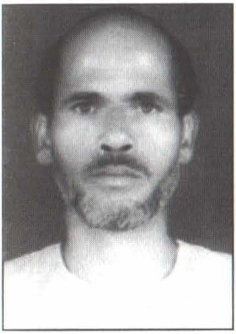
ইউসুফ শিকদার ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন সেই কারণে শত্রুরা গান বোটে এসে গ্রামে ঢুকে তার মামা জাহিদ মোক্তার সাহেবকে ধরে নিয়ে গুলি করে। ইউসুফ এই মামার বাসাতে থেকে লেখাপড়া

করতেন। মামা জাহিদ মোক্তার ও আওয়ামীলীগ নেতা ছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশের চিত্র মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্পুর্ণ উল্টো দিকে প্রবাহিত হতে দেখে তিনি তাঁর অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। যার একটি অংশ অনুরূপ, ''হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে ও নির্যাতনের তাণ্ডব লিলা দেখে কচি বয়সে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য ভারতে চলে যাই। '৭১ এর বাস্তব ঘটনা বুঝিয়ে লেখার মত ভাষা আমার নেই। সেদিনের দুঃখ কষ্টের কথা বর্তমান স্বাধীন দেশের নাগরিকের কাছে হাসি-গল্প, তাই এত বিরোধী দল। তাদের জন্ম তখন হয়নি। জিয়াউর রহমান সামরিক শাসক, এরশাদও তাই। রাজাকার এখন জামাত শিবির, ভাবতে অবাক লাগে। এই অভাগা জাতিকে কি করে বোঝাব যে, কত কষ্ট, কত ত্যাগের বিনিময়ে এই স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছে। স্বার্থের জন্য ক্ষমতার লড়াই চলছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিক্রী করে রাজনীতিবীদরা কোটিপতি। অথচ আমার বাড়ি সন্দ্বীপ। বাসের জন্য এক টুকরো জমিন নেই। নেই বেঁচে থাকার মত অবলম্বন-অর্থ। বেঁচে আছি এটাই মনে হয় বেশি পাওয়া। মিথ্যা আশ্বাসে সোনার হরিন পাওয়ার আশায় বসে আছি। অথচ কার হাসি এদেশে কারা হাসছে। কাদের বাড়ীঘর, বাসস্থান হওয়ার কথা, আর কারা তা ভোগ করছে? সত্য ঘটনাও বাঙালি আজ বিশ্বাস করতে রাজী নয়। কারণ তারা সব ঘরে বসে রাজা হয়েছেন। যার মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট হয়নি, যার সাথী গুলি খেয়ে কাতরায়ে মরেনি, সে কি করে বুঝবে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ?''

স্বাধীনতার পর ইউসুফ শিকদার সাধারন নাবিক পদে নৌবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানেও প্রবঞ্চনা আর অধিকার বঞ্চিতদের পাল্লা ভারী দেখে আক্ষেপে চাকরি ত্যাগ করেন। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং চেতনায় বিশ্বাসী আদর্শবাদী মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ সিকদার আজও বিশ্বাস করেন, এদেশ একদিন সোনার দেশ হবে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



মোঃ শফিকুল ইসলাম, পিতা-মোজাফফর আলি প্রধান। গ্রাম-চরলক্ষীপুর, থানা-মতলব, জেলা-চাঁদপুর।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পর জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাকে পলাশী ক্যাম্পে পাঠানো হয়। এখানে দেড়মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সাবমেরীনার বদিউল আলমের নেতৃত্বে ২০ জন কমাণ্ডোর সাথে ১৫ আগষ্ট চাঁদপুর বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তারা চাঁদপুরের সন্নিকটে করিম খাঁর বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিলেন। ১৫ আগষ্ট তাঁরা ৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন। এই দলে অংশ নেন সালাহউদ্দিন বীর উত্তম, আলী আশরাফ, মমিনউল্লা পাটওয়ারী বীর প্রতীক, বোরহানউদ্দিন আহম্মদ, ফজলুল কবির, আঃ গফুর, জহুরুল ইসলাম, লুৎফর রহমান, আমির হোসেন, মুন্নাফ পাটওয়ারী, রুহুল আমিন, শাহজাহান কবির বীর প্রতীক, শহীদ হোসেন, সামসুদ্দিন সামু, আঃ হাকিম বীর প্রতীক, আঃ আজিজ খাঁন, সফিকুর রহমান। যুদ্ধে উপনেতা ছিলেন আলী আশরাফ এবং সালাহউদ্দিন বীর উত্তম।

অক্টোবর মাসে সাবমেরীনার আমিন উল্লাহ শেখ এর নেতৃত্বে পুনরায় ১২ জন কমাণ্ডো চাঁদপুর বন্দর অভিযানে অংশ নেন। উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মমিনউল্লা পাটওয়ারী বীর প্রতীক, আব্দুল হাকিম (এবি) বীর প্রতীক এবং সালাহ উদ্দিন বীর উত্তম।

১৯৯৭ সালে তিনি এক দূর্ঘটনার পর প্যারালাইসিস অবস্থায় বর্তমানে অসহায় অবস্থায় নিজ বাড়িতে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। তিনি অর্থাভাবে চিকিৎসা পর্যন্ত করতে পারছেন না। চিকিৎসার জন্য সরকার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং সকল সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য কামনা করেন।

(তথ্যঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২২ নভেম্বর ১৯৯৯)

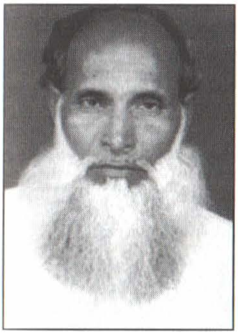


মোঃ কামরুল হুদা, পিতা-মৃত মোঃ খোরশেদ আলী। গ্রাম-লোন অফিস পাড়া, অ্যপ্রচ রোড, চৌরাস্তা, যশোর। বর্তমানঃ প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সরকারী সিটি কলেজ, যশোর। ১৯৭১ সালে ১ম বর্ষ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তখন বয়স মাত্র ১৬ বছর।

কামরুল মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পর নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাঁর অংশ গ্রহনে প্রথম অপারেশন ছিল নগরবাড়ি ঘাট। ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ দাস ১৬ জন নৌকমান্ডো দল নিয়ে শিলিগুড়ি পৌছানোর পর এক মটর দূর্ঘটনায় নিহত হন। তারা সূজা নগর পর্যন্ত যেয়ে ক্যাম্পে পুনরায় ফিরে আসেন। নভেম্বর মাসে রমেন্দ্র নাথের নেতৃত্বে মোল্লার হাট থানা দখলের জন্য ১৬ জন কমান্ডোর একটি দল প্রেরিত হয়। কামরুল হুদা এই দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মোল্লারহাট পৌছনোর মুহুর্তে দেশ স্বাধীন হয়। ১৭ ডিসেম্বর তিনি যশোর নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

স্বাধীনতার পর ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে যশোর সরকারী সিটি কলেজে যোগদান করেন। এখনও এই কলেজে কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ননা, তারিখঃ ২০ এপ্রিল ১৯৯৭)



মোঃ শমসের আলী, পিতা-মৃত আসম উদ্দিন। গ্রাম- বৈদ্যবাড়ী, ডাকঘর- বরুকা বাজার, থানা-ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। জন্ম-১৯৪৫ সালের ১ নভেম্বর। বিএ পাশ করার পর ১৯৬৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস হতে তদানিস্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে মেডিকেল এসিসট্যান্ট হিসাবে যোগদান করেন। পাকিস্তানী যুদ্ধ জাহাজ পিএনএস বখতিয়ার পিএনএস বাহাদুর এবং শিফাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্থানে চাকরি করার পর ১৯৬৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর তিনি চাকরি ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে আসেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ৫ এপ্রিল নিজ এলাকায় ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। বিজয় অর্জন পর্যন্ত তিনি এলাকাতে আত্মগোপন করে থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যার মাঝে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ১১ সেপ্টেম্বর, কিশোরগঞ্জ বাজারের সন্নিকটে শেখ মোজাফফরের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে এল এমজি চালক পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হলে ত্রিশালের ইকবাল তাঁকে টেনে পিছনে সরিয়ে আনেন। এই যুদ্ধে মোঃ শমশের আলি ডান পায়ে দু'টি গুলি বিদ্ধ হয়ে আহত হন। পরদিন ১২ সেপ্টেম্বর, পাকবাহিনী তাঁদের আশ্রয় স্থলে পুনরায় আক্রমন পরিচালনা করে। সে সময় শমসের আলী এবং সরিষাবাড়ীর মুজিবর রহমান একটি গামছাতে কিছু মুড়ি নিয়ে খাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ শত্রুর একটি গুলি মুজিবর রহমান এর পেটে লেগে ভুড়ি বেরিয়ে পড়ে। শমশের আলী ওই গামছা দিয়ে তাঁর পেট বেঁধে দেয়। কিন্তু অল্প সময়ের মাঝেই মুজিবর রহমান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার একমাত্র বোন এবং মাকে দেখার জন্য অনুরোধ জানান। এই মর্মান্তিক দৃশ্য আজও শমসের আলীকে ব্যথিত করে। স্বাধীনতার জন্য যারা নিঃশর্তে জীবন উৎসর্গ করলেন তাঁদের কথা কেউ স্মরন করেনা। পক্ষান্তরে বাঙালি হয়েও যারা পাকিস্তানীদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে তারাই শাসন ক্ষমতা সহ সমাজের সর্বস্তরে প্রভুত্ব করছে। জাতির এ লজ্জা ঢাকার নয়।

(তথ্যঃ শমসের আলী, তারিখঃ- ৮ মার্চ ২০০০)

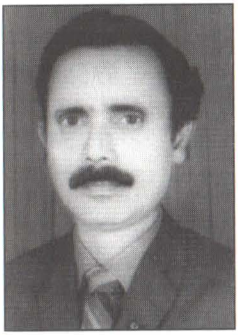


মোঃ ফজলুল করিম, পিতা- মিছির আলী প্রধান। গ্রাম- প্রতাবের চর, থানা- সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ। জন্ম- ৪ জুলাই ১৯৫৫ সাল। তার পিতা এলাকার একজন বিশিষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তি। ৬৬-৬৯ সাল পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের সাথে সক্রিয় ছিলেন।

২৫ মার্চ দেশে গণহত্যা শুরু হলে তিনি নিজ এলাকার ছাত্র যুবকদের নিয়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে প্রতিরোধ এর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আগষ্ট মাসের ২ তারিখ তিনি নিজ গ্রাম ত্যাগ করে ভারতের নশীংঘর ইয়োথ ক্যাম্পে পৌছেন। সেখান থেকে তাঁকে মেঘালয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাঠানো হয়। এখানে ক্যাপ্টেন সুজাত আলী ৪৪০ জন যুবকের মধ্যে সাঁতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাত্র ৩০ জন যুবককে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করেন। তাঁরা বিমান এবং সামরিক ট্রাক যোগে ১০ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে এসে পৌছেন।

দুইমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ তিনি কমাণ্ডো মতিউর রহমান এর নেতৃত্বে ৩০ জন নৌকমাণ্ডো দলের সাথে বরিশাল নদী বন্দর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানে বরিশাল শহর থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দক্ষিণে কির্ত্তনখোলা নদীতে ২টি খাদ্য বোঝাই বার্জ এবং শহরের সন্নিকটে একটি বার্জ লিমপেট মাইনের আঘাতে বিধ্বংস করেন। এই অভিযানে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য মতিউর রহমানকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়। ফজলুল করিম এই অভিযানে অংশ নেন। অভিযানে আরও অংশগ্রহণ করেন, হাবিবুল্লাহ বাহার, আমীর হোসেন, আমীর আলী, মোক্তার হোসেন, সৈয়দ আবুল বাশার। স্বাধীনতার পর ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। মেঘনা ঘাটে তাঁর ব্যবসা কেন্দ্র।

(তথ্যঃ ফজলুল করিম, তারিখঃ ৬ মে ২০০০)



মোঃ হাফিজুর রহমান, পিতা- মোঃ দলিল উদ্দিন। গ্রাম- বদর পাশা, ডাকঘর- রাজৈর, থানা- রাজৈর, জেলা- মাদারীপুর।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। সারা বাংলাদেশ যখন আন্দোলনে প্রকম্পিত। এই সময় এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে তিনি শহীদ সরদার হাফিজের অনুপ্রেরনায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদেন। প্রথমে মাদারীপুর জেলার শত-শত যুবক কলেজ মাঠে সমবেত হয়। এখানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী কর্ণেল শওকত আলী এমপি কিছু যুবককে বাদ দিয়ে বাকীদের ষ্টুয়ার্ড মুজিবের নেতৃত্বে লঞ্চ যোগে ভারতের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। তারা নোয়াখালী জেলার নীলকমল হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অম্পিনগর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌছেন। এখানে কিছুদিন অবস্থানের পর কর্ণেল শওকত মাত্র ১৯ জনকে বাছাই করে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য পলাশীতে পাঠান। এর মাঝে হাফিজ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

পলাশীতে তিনমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আগষ্ট মাসে 'অপারেশন জ্যাকপটের' অধীন তিনি চট্রগ্রাম বন্দর অপারেশনে উপস্থিত হনঞ্চঞ্চ। ৬০ জন কমান্ডোকে ৩টি উপদলে ভাগ করা হয়। তাঁর দলের লীডার ছিলেন ডাঃ শাহ আলম। হাফিজের মুখে ভরা চাপ দাঁড়ি। তাঁকে দেখে চট্রগ্রামে পাহারারত রাজাকাররা ভাবল এ আমাদের দলের লোক যার ফলে বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি। খেয়া পার হতে এক পাকিস্তানী সিপাহী উর্দুতে জিজ্ঞাসা করলো ''তোম কাহাসে যারা রাহে?'' হাফিজের সঙ্গী কমান্ডো বদী জবাব দিল, ''ভাই পাকিস্তান বাজারসে যারারাহে''। পাকিস্তানী হারামজাদা পুলিশ মহাখুশী, পাকিস্তানী বাজারে যাচ্ছে শুনে। কিন্তু তারা যে যাচ্ছিল জীবন বাজি রেখে পাকিস্তানের পিন্ডী চটকাতে তা ওই মুর্খ বুঝলনা। বুঝতে পারল ১৫ আগষ্ট ভোররাত থেকে। এদিন রাতেই দলনেতা এবং উপদলনেতা বাদে ৩৭ জন কমান্ডো বুকে মাইন নিয়ে কর্নফুলী নদীতে বিদেশী জাহাজ, বার্জ, গানবোট, পল্টুনসহ দশটি টার্গেট সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। পরদিন সকাল হতেই বিভিন্ন পথে পুনরায় তারা ভারতের পথে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করেন।

এরপর হাফিজ পালং থানার কমান্ডো আঃ সামাদ এবং কাশিয়ানী থানার হুমায়ূন কবীর সহ টেকের হাট ফেরীঘাট অপারেশনের জন্য আসেন। এখানে ফেরীতে মাইন লাগানোর সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা কবীরকে দেখে ফেলে। এল এম জি'র ব্রাশ ফায়ারে কবীরের মাথা গুড়িয়ে যায়। তিনি শহীদ হন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার এই বীর নৌকমান্ডোকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করেন। হাফিজ এবং সামাদ এর মাঝেই ফেরীতে মাইন স্থাপন করে

ফিরে আসেন। বিধ্বস্ত হয় টেকের হাট ফেরী। কিছুদিন পর দেশ স্বাধীন হয়। হাফিজ দুঃখ জানিয়ে বলেন কবিরের যায়গায় সে শহীদ হলে ভাল হতো। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এত অবহেলা প্রত্যক্ষ করতে হতোনা। তিনি এখন রাজৈর কলেজের অফিসের ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত আছেন।

(তথ্য সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ১৩ মার্চ ১৯৯৫)

কাজী মাহবুব আহমেদ মিলন, পিতা- কাজী মমিন উদ্দিন তালুকদার, নতুন শহর মাদারীপুর, জন্ম- ১৯৫০ সাল। ১৯৭১ সালে মাদারীপুর কলেজে বিএ সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্রলীগ করতেন। ১৯৬৬ থেকে ৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মাদারীপুর শহরে ছাত্র ও গণআন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাতেই পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাধারন মানুষের ক্ষোভ এবং ধিক্কার পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। পরবর্তীতে ২৫ মার্চ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনায় নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সংবাদ পৌঁছনোর পর মাদারীপুর এলাকার মানুষ ক্ষোভ ও উত্তেজনায় ফেঁটে পড়ে। প্রতিহিংসার আগুন মানুষের মাঝে এক নতুন চেতনার আবির্ভাব ঘটনায়। সকলের মনে প্রাণে এক ধরনের প্রস্তুতি চলে কিভাবে পাক সেনাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা যায়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ষ্টুয়ার্ড মুজিবের নেতৃত্বে মাদারীপুর কলেজ মাঠে এলাকার ছাত্র যুবকদের লাঠির সাহায্যে সামরিক প্রশিক্ষণ দান শুরু করেন। লক্ষ্য পাকবাহিনীর অগ্রাভিযান ঠেকানো কিন্তু লাঠি আর বন্দুকের সাহায্যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মোকাবেলা সম্ভব নয়। এমন হটকারী সিদ্ধান্তে সম্মুখসারীর বিদ্রোহী সাহসী তরুণ সমাজকে হারাতে হবে চিন্তা করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ষ্টুয়াড মুজিবের নেতৃত্বে ২৬০ জন ছাত্র যুবককে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল, লঞ্চযোগে ভারতের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। মাহবুব আহমেদ সতীর্থদের সাথে যুদ্ধ যাত্রায় অংশ নেন।

একই দিন সন্ধ্যায় তাঁরা নোয়াখালী জেলার এক বিরান চরে (নীলকমল) লঞ্চ ভিড়িয়ে নেমে পড়েন। রাতের অন্ধকারে পায়ে হেটে ভোরবেলা ফেনীর

এক প্রত্যন্ত গ্রামে এসে পৌঁছেন। সেখান থেকে ভারতের হরিনা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছে ২৫ দিন যাবত সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মে মাসের শেষ দিকে কর্ণেল শওকত আলী ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসারসহ ক্যাম্পে উপস্থিত হন। নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যুবক মনোনীত করতে। মাহবুব আহমদ মিলন সেই দলে মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে চলে আসেন।

এখানে আড়াইমাস কঠিন নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় ৬০ জন নৌকমাণ্ডো দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দর অভিযানে অংশ নেন। ঝুকিপূর্ণ এই যুদ্ধে অসামান্য সফলতা অর্জনের পর তিনি কয়েকজন সাথীসহ ভারতে ফিরে আগরতলায় নৌ-কমাণ্ডোদের জন্য প্রস্তুতকৃত নিউ ক্যাম্পে অবস্থান করতে থাকেন। পরে ভিন্ন একটি মিশনে পাঠানোর জন্য তাঁদের কয়েকজন কমাণ্ডোকে কলকাতা নেয়া হয় কিন্তু ভারতের যুদ্ধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ফলে উক্ত মিশন স্থগিত রাখা হয়। মাহবুব আহমেদ এবং সাথীরা কলকাতাতে অবস্থান কালে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। তাঁরা স্বাধীন স্বদেশ ভূমিতে ফিরে আসেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৯০ সালে তিনি মাদারীপুর সদর আসন থেকে জাতীয়তাবাদী দলের মনোনীত এমপি নির্বাচিত হন। এখনও মাদারীপুর জেলা জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি। এর পাশাপাশি তিনি ঢাকাতে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন।



মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, (১-১-১৯৫৪), পিতা- মৃত মৌঃ জমির উদ্দিন আহমেদ। গ্রাম- পোড়াকান্দী, ডাক- জাহাপুর, জেলা- কুমিল্লা। বর্তমান- ব্যবস্থাপক, ফ্লোরেন্স ফ্যাবরিক্স লিঃ, ১০০ রেমন ভবন, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এ পাশ।

১৯৭১ সালের ৪ মে, আগরতলা মেঘালয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখান থেকে নৌকমাণ্ডো ট্রেনিং গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী চলে যান। ট্রেনিং সমাপ্তির পর সাবমেরীনার এ.আর. মিয়ার নেতৃত্বে ফুলছড়ি ঘাটে জাহাজ ডোবানোর জন্য অভিযান পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত হন।

১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। দীর্ঘদিন নৌবাহিনীতে চাকরি করার পর ১৯৯০ সালে পেটি অফিসার কমিউনিকেশন ইউমেন (P.O.C.Y.) হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে ঢাকাতে একটি রপ্তানীযোগ্য পোষাক প্রস্তুত কারখানায় ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

(তথ্যঃ লিখিত বর্ণনা (অসম্পুর্ণ), তারিখ ঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ৯৯)



পঞ্চানন সরকার, পিতা-নগেন্দ্র নাথ সরকার। গ্রাম-আলগী, থানা-ভাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। ১৯৫২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি পাশ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। পঞ্চানন তখন বাড়িতে পড়াশুনায় নিমগ্ন। ইতিমধ্যে পাকবাহিনী তাদের গ্রামে প্রবেশ করে। হানাদার বাহিনী পঞ্চাননের পাশ্ববর্তী আসফরদী গ্রামে ঢুকে মসজিদে নামাজ আদায়রত ৯ জন লোককে গুলি করে হত্যা করে। সেই সময় ওই গ্রামের দুইজন যুবতী মেয়েকে ধরে জঘন্য অত্যাচার করে। ফলে তারা মৃত্যুবরণ করে। পাকবাহিনী মকসুদপুর এবং নগরকান্দা থানায় ক্যাম্প করে রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানী জান্তা এলাকায় নারী নির্যাতন এবং গণহত্যা শুরু করে। তখন বাংলা জ্যৈষ্ঠ্য মাস। মকসুদপুর থানা এবং নগরকান্দা থানার মাঝখানে বিরাট ধান পাটের ক্ষেত। উভয় স্থানের দূরত্ব

৩ কিলোমিটার। পাটগুলি ৫/৬ হাত লম্বা। ক্ষেতের মধ্য দিয়ে একটি সরু পথ মকসুদপুর থেকে নগরকান্দা থানা পর্যন্ত গিয়েছে। ঐ পথ দিয়ে পাকবাহিনী যাতায়াত করে।

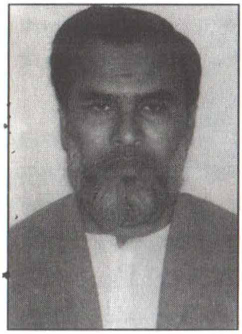
পাকবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনে জনগণ অতিষ্ট। একদিন এলাকার কয়েকজন যুবক গোপন সূত্রে জানতে পারে যে কয়েকজন পাকিস্তান সৈন্য মকসুদপুর থেকে নগরকান্দা থানায় যাবে। যুবকরা এলাকার আরও কিছু সংখ্যক সাহসী লোককে সাথে নিয়ে গ্রাম্য অস্ত্র, ঢাল, সড়কী, রামদা এবং খেজুর গাছ কাটা ছ্যানা প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে পাট ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যা ৭টায়, ১৫/২০ জন পাকিস্তানী সৈন্য ঐ পথ দিয়ে নগরকান্দা থানার দিকে আসতে থাকে। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এই সুযোগে যুবকরা কুপিয়ে ২০ জন মিলিটারীকে হত্যা করে। তারা গুলি করার কোন সুযোগ পায়নি। যুবকরা পাকবাহিনীর মৃত দেহগুলি বস্তায় ভরে ইট ঢুকিয়ে ঘোড়ামারা বিলের মাঝখানে ৬/৭ ফুট পানির নীচে বাঁশ পুতে তার সাথে বেঁধে রাখে। এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দুই তিন দিন পর এক থেকে দেড় হাজার মিলিটারী এলাকায় ঢুকে পাশাপাশি তিনটি গ্রাম সম্পুর্ণ জ্বালিয়ে দেয়। রাজাকাররা এলাকায় যুবকদের একটা তালিকা পূর্বেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিকট দিয়েছিল। তালিকায় ৪০/৫০ জন যুবকের নাম ছিল। জানতে পেরে যুবকরা পিতা মাতার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ৫/৬ দিন পায়ে হেঁটে তারা ভারতের টাকী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌছেন। এই দলে পঞ্চানন ছিলেন। এখান থেকে চাকুলিয়াতে একমাস গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যেদিন কল্যানীতে ফেরেন একই দিনে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী চলে যান। এখানে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর যখন তাঁদের একটি গ্রুপকে অপারেশনে পাঠানোর প্রস্তুতি নিতে থাকে এসময় দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর তিনি চাকরি গ্রহণ করেন। বর্তমানে ফরিদপুর প্রধান ডাকঘরের পোষ্টাল অপারেটর।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা. তারিখঃ ১৫ জুন ১৯৯৯)



মোঃ শাহজাহান কবির, পিতা- মোঃ ইব্রাহিম। ১৯৫১ সালের ১৫ নভেম্বর বর্তমান চাঁদপুর জেলার দাশাদী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে সফরমালি হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি পাশ করে ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬৯ সালে এইচ.এস.সি পাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। বাবা জনাব ইব্রাহিম, ১৯৩৫ সাল থেকে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বৃটিশ এবং পাকিস্তানী শাসনামলের পুরটা সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। আইয়ুব খানের বেসিক ডেমক্রেসির নিয়ন্ত্রনাধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনকালেও তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। এর পাশাপাশি শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন।

শাহজাহান কবির ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ছিলেন। ২৬ মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় থেকে তিনি হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছেন। ২৭ মার্চ সকালে কার্ফু শিথিল হলে তিনি পরিবারসহ গ্রামে চলে যান। চাঁদপুর শহর থেকে ২০ কিঃমিঃ দক্ষিণে তাঁর গ্রাম হওয়াতে এলাকাটি বেশ নিরাপদ ছিল।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পাকিস্তান সেনাবাহিনী চাঁদপুরের দখল গ্রহণের জন্য বিমান থেকে বোমা বর্ষন শুরু করে ফলে শহরের মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোজে গ্রামে চলে আসে। শাহজাহান কবির এবং তাঁর বন্ধুরা স্থানীয় সংগ্রাম কমিটির সাথে গ্রামে আগত শহরবাসীর জন্য অস্থায়ী ক্যাম্প খোলেন। কিন্তু এক সময় তাঁর গ্রামও নিরাপদহীন হয়ে ওঠায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত গমন করেন।

সীমান্ত পার হয়ে বক্সনগর ক্যাম্পে উঠেন। সেখান থেকে হাতীমারা ক্যাম্পে পৌছেন এবং ট্রেনিং নিতে থাকেন। ইতিমধ্যে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়নের জন্য টিম আসে হাতীমারা ক্যাম্পে। সাঁতার জানা যুবকদের লাইনে দাঁড়াতে বলেন। শাহজাহানসহ অনেকে দাঁড়ান। নৌকমান্ডো হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীর প্রান্তরে জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে উপস্থিত হন। দেড় মাস পূর্ব থেকে ২০০ যুবক এই ক্যাম্পে কমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলেন।

পলাশীর প্রান্তরে শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ দেখে বিমোহিত হন শাহজাহান কবির। পরম যত্নে এর রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি মুগ্ধ করে তাঁকে। স্মৃতিস্তম্ভের পাশেই রয়েছে মিউজিয়াম। তাতে রয়েছে পলাশী যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের কিছু। নিদর্শণ পলাশী মাঠে যুদ্ধের সময় কামানের গোলা পড়ে বেশ কিছু বড় বড়

গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। পুকুর সমান এসব গর্ত আজও সযত্নে রক্ষিত দেখতে পান শাহজাহান। এ সব গর্তের পাশে জমে উঠেছে ঝাউ ও বাবলা গাছের সমারোহ। এতে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় সাপ। ট্রেনিং চলত সকাল হতে রাত ১০টা পর্যন্ত। স্রোতস্বিনী নদীতে ফিন্স পায়ে সাতার কাটা জুডো, কারাত, হালকা অস্ত্র চালনার ট্রেনিংসহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের ট্রেনিং নেন শাহজাহান। এর সাথে শিখেন লিমপেট মাইন লাগানো সহ বিস্ফোরনের পদ্ধতি। বিস্ফোরক দিয়ে ব্রীজ, কালভার্ট ধ্বংসের নিয়মও শেখানো হয় তাকে। এভাবে শাহজাহান পরিনত হন একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নৌ কমাণ্ডোতে। নৌ কমাণ্ডোরা সব দিক হতে অপেক্ষাকৃত আরামে থাকতেন। খাবার দাবার ছিল উন্নতমানের। প্রায়ই রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক কর্মকর্তারা আসতেন। যোদ্ধাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। জুলাই মাসের শেষ দিকে প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং শেষ হয়। এরপর শুরু হয় গ্রুপ গঠনের পালা। কমাণ্ডোদের শারিরীক সামর্থ এবং এলাকার নদ নদীর ধারনার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গ্রুপ গঠিত হয়। প্রতি গ্রুপের পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় ফ্রান্স হতে পালিয়ে আসা নৌ যোদ্ধাদের। উল্লেখ্য, ফ্রান্স হতে পাক নৌবাহিনীর ৮ জন সদস্য পালিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ৪ আগষ্ট বদিউল আলম বীর উত্তম এর নেতৃত্বে নৌ-কমাণ্ডোদের ২০ জনের একটি গ্রুপ চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। দলের ডেপুটি লিডার ছিলেন আলী আশরাফ এবং মমিনউল্লা পাটওয়ারী বীর প্রতীক, সালাহউদ্দিন বীর উত্তম। এ গ্রুপের সাথে যুক্ত হন শাহজাহান। টার্গেট দেয়া হয় চাঁদপুর নদী-বন্দর। প্রয়োজনীয় লিমপেট মাইন, বিস্ফোরক, হালকা অস্ত্র, রেডিও ইত্যাদি নিয়ে ট্রাকযোগে দলনেতা রওয়ানা দেন। সোনাইমুড়ি, মেলাঘর, বক্সনগর হয়ে সীমান্তে এসে পৌঁছেন। প্রশিক্ষকদের কেউ কেউ সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দেন দলটিকে।

নৌ-কমাণ্ডোরা সারারাত যতদূর সম্ভব পায়ে হেটে এগোন। সকালে এক বাড়িতে আশ্রয় নেন। এভাবে তিন রাত হেঁটে শাহজাহান কমাণ্ডোদের সাথে নিজের বাড়িতে পৌঁছে দলের সবাইকে নিয়ে খাওয়া -দাওয়া করেন। বিশ্রাম নেন কিছুক্ষণ। দূরবর্তী হওয়াতে তাঁর বাড়ি হতে বন্দরে অপারেশন চালানো কষ্টকর হবে। এ কথা তিনি দলনেতাকে জানান। সাথে সাথে দলের সব কমাণ্ডোকে নিয়ে চাঁদপুরের কাছে চলে আসেন। উঠেন করিম খানের বাড়ীতে। ১৫ আগষ্ট সন্ধ্যা বেলায় দলনেতা বদিউল আলম তার কমাণ্ডোদের তৈরী হতে নির্দেশ দেন। এক একজন গ্রুপ লীডারের অধীনে অন্যান্যের মত শাহজাহানও লিমপেট মাইন পেটে বেঁধে নেন। ছুরি ও ফিন্স নেন সাথে। সুইমিং কসটিউম পরে রওয়ানা দেন নদীর উদ্দেশ্যে। পরিকল্পনা মত দলের সকলে ডাকাতিয়া নদীর তীরে পৌঁছেন। তখন রাত ১২টা। পায়ে ফিন্স পরে নেন শাহজাহানসহ সবাই। পানিতে নামেন। নিঃশব্দে সাতার কেটে জাহাজের উদ্দেশ্যে এগোতে

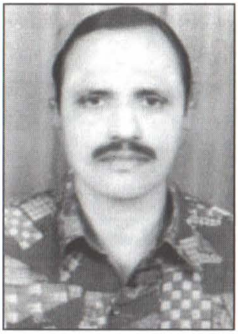
থাকেন কমাণ্ডো দল। জাহাজের তিন স্থানে তিন জন তাঁদের মাইন লাগান। সেফটি পিন খুলে দিয়ে মেঘনা নদীর দিকে সাঁতার কাটতে থাকেন। শাহজাহানরা নদীর কিনার বেয়ে সাতার কাটতে থাকেন আরো দ্রুত। কমান্ডোদের একটি অংশ বহরী বাজারে গিয়ে উঠেন। এখানে তাদের নেয়ার জন্য লোক থাকার কথা ছিল। কিন্তু উদ্ধারকরী দলের কাউকে দেখতে না পেয়ে তারা চিন্তিত হয়ে পড়েন।

শাহজাহান এরপর আশ্রয় কেন্দ্রের দিকে রওয়ানা দেন একাই। কিছু দুর যাওয়ার পর সাক্ষাৎ পান ছোট ভাইসহ ৪ জন কমাণ্ডোর। ধান ক্ষেতে লুকিয়ে বসে আছেন সবাই। নদীতে গান বোটের আনাগোনা ও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। বেশ কয়েকটি জাহাজ ডুবে গেছে বন্দরে। ক্ষিপ্ত হানাদাররা কমান্ডোদের খুজছে। ঘুরা পথ দিয়ে নৌকাতে নিরাপদে সবাই পৌঁছে যান আশ্রয়স্থলে।

১৮ আগষ্ট রাতে নৌ-কমাণ্ডো এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের সাথে শাহজাহান ভারত চলে যান। শাহজাহানের ভাষায় চাঁদপুরের এ সফল অপারেশনে মূল কৃতিত্ব ছিল আলম দাদুর।

অক্টোবর মাসে শাহজাহান কবীর আবার আসেন চাঁদপুর এলাকায়। প্রায় ১৫ জন নৌ কমাণ্ডোর সাথে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু অপারেশনে অংশ নেন। এবার দলনেতা হলেন শেখ আমানুল্লাহ বীর বিক্রম। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ শাহজাহানকে বীর প্রতীক খেতাব প্রদান করা হয়। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা নৌকমাণ্ডো এসোসিয়েশন এর মহাসচিব।

(সূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধ ও নৌকমাণ্ডো অভিযান, বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ এবং লেখকের নিকট প্রদত্ত বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত।)



এস. এম. নূরুল ইসলাম, পিতা- মৃত ফজলে করিম সরদার। গ্রাম-পলাশ পোল, সাতক্ষীরা। জন্ম ২১ জুলাই ১৯৫৫। পাতাখালী নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। উক্ত গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৭৪ সালে সাতক্ষীরা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন।

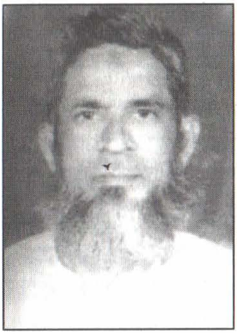
১৯৭১ সালে স্কুলের ছাত্র হয়েও পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এলাকার বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্থান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে তিনি পশ্চিমবঙ্গ জেলার ধলচিতা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। জুন মাসে নৌ কমান্ডোতে ভর্তির জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। দু'টিতে টিকে যাওয়ায় তিনি নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করেন। সেদিন ৫০০ জন যুবকের মধ্য থেকে মাত্র ৩০ জন যুবককে মনোনীত করা হয়।

তিনমাস প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ১৫ই আগষ্ট হিরণ পয়েন্ট অভিযানে অংশ নেন। অক্টোবর মাসে গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ বীর প্রতীকের নেতৃত্বে মংলা এবং চালনা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তার সহযোদ্ধা ছিলেন ডাঃ মাহফুজুল হক, আজিজুল আলম, আব্দুর রহিম, জালালউদ্দিন বীরোত্তম, আব্দুল গাফফার, হুমায়ুন কবীর, মজিবর রহমান, শমসের আলী প্রমুখ।

স্বাধীনতার পর শিক্ষা জীবনে ফিরে যান। ১৯৮৫ সালে সাতক্ষীরা টেক্সটাইল মিলে চাকরি গ্রহণ করেন। বর্তমানে একই মিলে কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা. তারিখঃ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯)



আলহাজ্ব কাজী আব্দুর রব (অব:), পিতা- মরহুম কাজী সরু মিয়া, গ্রাম-বানাবাড়িয়া, পোঃ- রামগঞ্জ, থানা- বেগমগঞ্জ, জেলা- নোয়াখালী। ১৯৪৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। মেট্রিক পাশ করার পর ১৯৬৪ সালের ১১ জুন ডিই/ইউ সি হিসেবে তদানিন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। প্রাথমিক এবং বেসিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে পিএনএস বাহাদুর, পিএনএস কারসাজ, পিএনএস বখতিয়ায় পিএনএস আলমগীরে চাকরি করেন।

চাকরি জীবনে তিনি ইউ কে, শ্রীলংকা, তানজানিয়া, কেনিয়া, আলজেরিয়া, মিশর, যুগোস্লাভিয়া, সৌদী আরব, মালয়েশিয়া এবং ভারত ভ্রমন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নৌ বাহিনী থেকে তিনি উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তিনি মুক্তিযুদ্ধে ৩নং সেক্টরের অধীন কোম্পানী কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান এর নেতৃত্বে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীর কমডোর লুদি জনাব আব্দুর রবকে তমঘায়ে সুজ্জাত পদক প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু সেই সময়ে তা কার্যকর হয়নি।

১৯৭০ সালের ২৯ মে তিনি পিএনএস যশোর জাহাজে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি খরস্রোতা কর্ণফুলি নদীতে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে একটি পাঁচ বছরের ছেলেকে উদ্ধার করেন। উক্ত দুঃসাহসী কাজের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে তমঘায় ই-সুজ্জাত খেতাব একইসাথে এককালীন ৫০০০/-টাকা আর্থিক পুরস্কার, ভাতা, খাস জমি বরাদ্দ প্রাপ্য ছিল। অফিসার ইনচার্জ কমডোর লোদী এই পদক এবং পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশও করেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়াতে আব্দুর রব-এর কোন কিছু পাননি। খেতাবের জন্য তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এর পরিবর্তে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যাবস্থাপনায় ১৯৯০ সালে তিনি হজ্বব্রত পালন করার আবেদন জানান কিন্তু তাও মঞ্জুর হয়নি।

যুদ্ধকালীন সময়ে এই কর্ণফুলি নদীতেই বাঙালি যুবকরা রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী শত্রুর মধ্য দিয়ে তাদের অসংখ্য জাহাজ ধ্বংস করেছেন। কিন্তু তাঁদের দুঃসাহসিকতার জন্য কোন খেতাব পাননি। আলহাজ্ব কাজী আব্দুর রব বর্তমানে নিজবাড়ীতে অবসর জীবন যাপন করছেন।

(সূত্রঃ সাক্ষাৎকার, তারিখঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০)



মোঃ শওকত আলী, পিতা- মোঃ মামদার বিশ্বাস, গ্রাম- নওয়াগ্রাম, ডাক- মহেশপুর, ঝিনাইদহ। ১৯৭১ সালে কলেজের ছাত্র থাকাকালীন মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। জনাব শওকত আলী ছাত্রজীবন পরিত্যাগ করে সতীর্থদের সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের টালিখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন।

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাঙালি সাবমেরীনার গাজী মোঃ রহমতউল্লা এবং সৈয়দ মোশাররফ হোসেন টালিখোলা ক্যাম্পে আসেন নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য যুবক মনোনীত করতে তিনি সকল রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে চলে আসেন। এখানে তিনমাস কঠোর পরিশ্রম করার পর একজন দক্ষ কমান্ডো হিসাবে তৈরি হন। এক্সপ্লোসিভের এবং লিমপেড মাইন এর ব্যবহার রপ্ত করেন।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর অভিযানে ৬০ জন নৌ কমান্ডোকে পাঠানো হয়। এরমাঝে জনাব শওকত আলী একজন চৌকস নৌকমান্ডো হিসেবে মনোনীত হন। ১৫ই আগষ্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিযান শেষে তিনি পুণরায় পলাশী ক্যাম্পে ফিরে আসেন।

স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে একজন নাবিক হিসেবে যোগদান করেন। এখনও তিনি নৌবাহিনীতে কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ ১৯৭১ সালের তালিকা এবং ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৫ সালে প্রদত্ত বর্ণনানুসারে)



মোঃ আব্দুল কাদের, পিতা-মৃত কালা মিয়া, গ্রাম-চিকনছড়া, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম। কনস্টেবল নং ১০১২। জন্ম- ২ মে, ১৯৫৪ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা-নবম শ্রেণী পাশ।

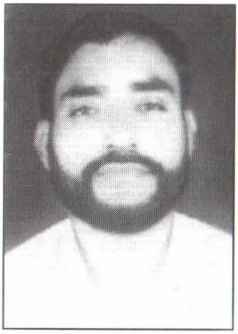
১৯৬৯ গণআন্দোলনে ছাত্রাবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এপ্রিল মাসের মাঝমাঝি সময়ে ভারতের মতিনগর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখানে মেজর হায়দার সাহেবের অধীনে কিছুদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

এরপর নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী চলে যান। পলাশী ক্যাম্পে তিনমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অক্টোবর মাসে সাবমেরীনার বদিউল আলম বীর উত্তম এর নেতৃত্বে মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ৪০ জনের কমান্ডো গ্রুপ এ অভিযানে ৫টি জাহাজ সম্পুর্ণ ধ্বংস করতে সমর্থ হন। ধ্বংসকৃত জাহাজ এর মাঝে 'দ্বারকা' নামের একটি কোষ্টার, ২টি বার্জ, ১টি টাগ ছিল। এস.এস. লাইটনিং এর উপর দ্বিতীয় দফায় মাইন লাগিয়ে নিমজ্জিত করেন।

নভেম্বর মাসে তিনি দ্বিতীয়বার একই বন্দরে ২৪ জন কমান্ডোসহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং পশুর নদীতে সেন্ট আলমাস নামক একটি বৃটিশ জাহাজ, ক্রাইনো ভেলান্দু নামে অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি গ্রীক জাহাজ সম্পুর্ণভাবে ডুবিয়ে দেন এবং 'টনি ম্যাগোস তে মোস' নামে আরও একটি গ্রীক জাহাজ লিমপেট মাইনের সাহায্যে ধ্বংস করতে সমর্থ হন।

নভেম্বর মাসের শেষ দিকে তিনি বরিশাল নৌবন্দর অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। এখানে দু'টি খাদ্যবাহী জাহাজ ডোবাতে সক্ষম হন। একাত্তরে মৃত্যুঞ্জয়ী কমান্ডো আজও পুলিশের কনস্টেবল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের গর্বকে জীবনে সবচেয়ে বড় অর্জন বলে মনে করেন।

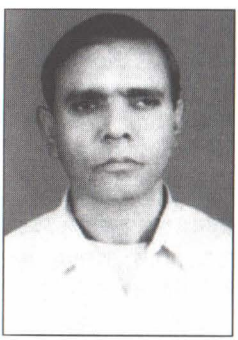
(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



মোঃ খোরশেদ আলম, (২১-০৫-১৯৫০)। পিতা- ছায়েদ আলী সরকার। গ্রাম-দিঘীর পাড়, ডাক- রায়পুর, থানা- দাউদকান্দী, জেলা- কুমিল্লা। এস.এস.সি পাশ।

পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মোঃ কফিলউদ্দিন এর নেতৃত্বে নরসিংদী এবং দাউদকান্দী এলাকায় বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সহাযোদ্ধা ছিলেন কফিলউদ্দিন, তোফাজ্জল হোসেন, আরব আলী, মোস্তাক সহ ৮জন।

(সূত্র ঃ যুদ্ধের বর্ণনা অসম্পুর্ণ, তারিখ ঃ ২৫শে আগষ্ট ১৯৯৯)

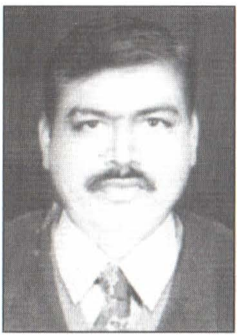


মোঃ জহুরুল হক, পিতা-মরহুম মোঃ সেলিম উদ্দিন ফকির। ২২, হাজী মহসীন রোড, খুলনা সদর, খুলনা। নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১২ অক্টোবর হরিনগর পাকিস্তানী গানবোটের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। এই অপারেশনে কমাণ্ডার ছিলেন স্থল বাহিনীর আফজাল ও আনোয়ার।

১৮ অক্টোবর, গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ এবং খিজীর আলী বীর বিক্রম এর নেতৃত্বে পাইকগাছা থানা শত্রুমুক্ত করেন। ২৯ নভেম্বর বিনয় সরকার এবং গাজী রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে বারআড়িয়া যুদ্ধে অংশ নেন এবং বিজয় লাভ করেন। ৬ ডিসেম্বর কপিলমুনি যুদ্ধে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হন। ফলে তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। কপিলমুনি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ এবং কামরুজ্জামান টুকু। ৪ দিন অবিরাম যুদ্ধের পর শত্রু সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। এখানে ১৫০ জন রাজাকার ও মিলিশিয়া আত্মসমর্পন করে। শত্রুর বাঙ্কার থেকে ২০ জন যুবতীকে উদ্ধার করে গোপনে তাদের নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের নিকট পৌছে দেয়া হয়। জহুরুল হক আহত হলে তাকে চিকিৎসার

জন্য ভারত পাঠিয়ে দেয়া হয়। স্বাধীনতার পর চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে আসেন। তখন থেকে ক্রেচের সাহায্য নিয়ে হাঁটাচলা করেন। মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাষ্ট থেকে ভাতা পান।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



শ্রী সুবোধ কুমার বিশ্বাস, ১৯৫১ সালের ৭ জুন বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার চড়িয়ার বিল এলাকার মির্জাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা- ব্রজমোহন বিশ্বাস ছিলেন। গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ। গ্রামের পাঠশালা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে এস.এস.সি এবং ১৯৬৯ সালে ঝিনাইদহ কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। '৭১ সালে বিএ ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সুবোধ '৬৬ সাল থেকে ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহে আগ্রাসন পরিচালনা করে। তৎকালীন ইপিআর, পুলিশ, ছাত্র জনতা, ডিএসপি মাহবুব উদ্দিন আহম্মদ বীর বিক্রম, তৌফিক ই ইলাহী বীর বিক্রম এবং ইপিআর এর উইং কমাণ্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সামিল হয়। সুবোধ ছাত্র যুবকদের সাথে নিয়ে বাঙালির প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে সামিল হয়।

২৯ মার্চ, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সমগ্র এলাকায় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে নিরীহ জনগণের উপর অত্যাচার, হত্যা, অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষন শুরু করলে তিনি স্বপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারত গমন করেন এবং ধনগাঁ টালিখোলা ক্যাম্পে যোগদেন। ১৩ মে, ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সাবমেরীনার গাজী মোঃ রহমতউল্লা বীর প্রতীক ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কিছু সংখ্যক যুবক মনোনীত করেন।

সুবোধ কুমার এই দলে মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে বন্ধুদের সাথে চলে যান। এখানে তিনমাস প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ১৫ আগষ্ট অপারেশন জ্যাকপটের অধীন মংলা বন্দর অভিযানে সাবমেরীনার আহসান উল্লাহ বীর প্রতীকের নেতৃত্বে অংশ নেন। এই অভিযানটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ এবং দুঃসাহসীকতাপূর্ণ। অভিযান সমাপ্ত করতে তাঁদের মাসাধিক কাল সুন্দর বনের জংগলের অভ্যন্তরে অবস্থান করতে হয়।

১৫ আগষ্ট মংলা সমুদ্র বন্দরে তারা বৃহৎ আকারের ৬টি বিদেশী জাহাজ মাইন লাগিয়ে ডুবিয়ে দেন। অতঃপর তাঁরা পুনরায় পলাশী ক্যাম্পে ফিরে যান।

অক্টোবর মাসে সৈয়দ মোশারফ হোসেনের নেতৃত্বে টেকেরহাট এবং মাগুরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নভেম্বর মাসে কমাণ্ডো মতিউর রহমান এর নেতৃত্বে বরিশাল নদী বন্দর অভিযানে অংশ নেন। এখানে তাঁরা দু'টি খাদ্যবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন।

স্বাধীনতার পর তিনি ছাত্র জীবনে ফিরে যান। বর্তমানে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ননা. তারিখঃ ২০ মার্চ ১৯৯৯)



সামছুর রহমান, পিতা- মোঃ হায়দার আলি সরদার, গ্রাম- সাতপাকিয়া, থানা-তালা, জেলা- সাতক্ষীরা। জন্ম- ২ মে, ১৯৫১ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা- এস.এস.সি এবং সি.ইন.এড। বর্তমানে সাতপাকিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

সংসারে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নাই। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বিমান বাহিনীতে ভর্তির জন্য ঢাকায় আগমন করেন। কিন্তু মনোনীত হতে ব্যর্থ হন। দেশে ফিরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন। পাশাপাশি অন্য কোন চাকরি জোটানোর জন্য ঢাকা শহরের পরিচিত জনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই সময় শহরের সকল দেওয়ালে একটি পোষ্টার তাঁর নজরে পড়ে। পোষ্টারটি ছিল ৭ই মার্চ, রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর জনসভায় ভাষন দিবেন। তিনি সেদিন রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জনসভায় যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষন শোনার পর তিনি তাকে প্রাণপ্রিয় নেতা হিসেবে গ্রহণ করেন।

দেশে ফিরে আওয়ামীলীগের সংগঠনে যোগদান করেন এবং এলাকায় স্থানীয় নেতা সালাউদ্দিন ইউসুফ এবং এডভোকেট আলাউদ্দিন এর সাথী হিসেবে সকল মিটিং মিছিলে অংশ নিতে থাকেন।

এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাতক্ষীরা শহর দখল করলে তিনি

নেতৃবৃন্দের সাথে ভারত চলে যান। ২৪ পরগণা জেলার তকীপুরে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প গঠিত হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহরের জন্য এই ক্যাম্পে যোগ দেন।

মে মাস থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অপারেশনে অংশ নেন। দ্বিতীয়বার অক্টোবর মাসে গাজী মোঃ রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে মংলা ও চালনা বন্দর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিভিন্ন থানা সদরে অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

বিজয়ের পূর্বমুহুর্তে খুলনা শহর থেকে ৭ মাইল দক্ষিণে জয়নগর নামক স্থানে পাকিস্তানী গানবোট এর সাহায্যে জলপথ অবরোধ করে রেখেছিল। যাতে মুক্তিবাহিনী শহরে প্রবেশ করতে না পারে। নদীর তীরে ও পাক সেনাদের সুরক্ষিত বাঙ্কার ছিল। গাজী মোঃ রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে ৪ জন নৌকমাণ্ডো, শেখ শাহাদাত হোসেন, সামছুর রহমান, খলিলুল্লাহ এবং বশির আহমদ মাইন দ্বারা গানবোটটি ডুবিয়ে দেন।

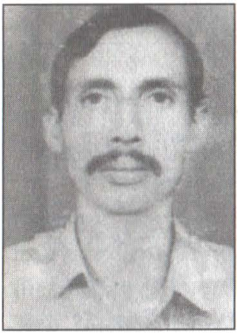
সামান্য উপার্জনে স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পিতা- মাতাসহ মানবেতর জীবন কাঁটাচ্ছেন। সামান্য বেতনে সংসার নির্বাহ হয়না। তিনি দুঃখের সাথে বলেন, ''যুদ্ধে লক্ষ যুবক শহীদ হয়েছেন, তিনি কেন বেঁচে থাকলেন? যদি অন্যদের মত তিনিও শহীদ হতেন তাহলে আজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কারো কাছে স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধারা কষ্টে আছে কেন এর জবাব দিতে হতোনা।''

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২৫ জুলাই ১৯৯৯)



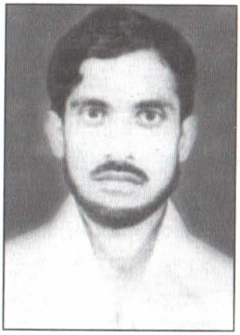
সুশীল কুমার মণ্ডল, পিতা- মৃত দূর্গাপদ মণ্ডল। গ্রাম- জোড়সিং, থানা- কয়রা, জেলা- খুলনা। জন্ম- ২০ এপ্রিল ১৯৫২। শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি পাশ। ৬৯ ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর খুলনা জেলার অধীন হিরনপয়েন্ট, মংলা, আশাশুনি, চাপড়া, কপিলমনি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। আশাশুনি থানা আক্রমনের পর শত্রুবাহিনী পালিয়ে সাতক্ষীরা শহরে আশ্রয় নেয়। এরপরদিন পাকিস্থানী জংগী হেলিকপ্টার থেকে মুক্তিবাহিনীর অবস্হানের উপর ষ্ট্রাফিং শুরু করে। ফলে নৌকমাণ্ডোসহ মুক্তিবাহিনীর বিশাল বাহিনী পিছুহটে সুন্দরবনে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নভেম্বর মাসে খুলনা, যশোর এর মধ্যবর্তী ফুলতলাতে রেল লাইন কাটার জন্য ১২ জন কমাণ্ডো দলের সাথে যোগদেন। যশোর জেলার বয়রা সীমান্ত অতিক্রম করে ফুলতলা উপস্হিত হন। পথ প্রদর্শক ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মসলেম উদ্দিন। অপারেশন শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তন কালে গাইড মসলেম উদ্দিন শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তাঁর ভাগ্যে কি পরিনতি ঘটেছিল জানা যায়নি। এই অপারেশনে তাঁরা একটি ষ্টেনগান হারিয়ে ফেলেন। একারণে ক্যাম্প কমাণ্ডার তাঁদের শাস্তি প্রদান করেন। শাস্তি লঘু ছিল কানধরে উঠবস করা। স্বাধীনতার পর তিনি বেকার অবস্হায় নিজ গ্রামে বসবাস করছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



বিশ্বানাথ পালিত, পিতা- ঈশ্বর সুরেন্দ্র নাথ পালিত। গ্রাম- ঘলঘলিয়া, ডাকঘর- ভাতশালা, থানা- দেবহাটা, জেলা-সাতক্ষীরা। ১৯৫২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। দশম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পলাশীতে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট, ৬০ জন কমাণ্ডো দলের সাথে মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তার দলনেতা ছিলেন সাবমেরীনার আহসানউল্লা বীর প্রতীক। এবং উপ দলনেতা ছিলেন খলিলুর রহমান। তিনি খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এদিন দিবালোকে অভিযান পরিচালনা করতে বেশ বেগ পেতে হয়। বিপদেরও সমূহ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু দলনেতা এবং উপদল নেতাদের তীক্ষ্ণ বিচক্ষনতা এবং দুঃসাহসীকতার জন্য ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দরে অভিযান পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল। এদিন তাঁরা ৬টি সমুদ্র গামী জাহাজ মাইন লাগিয়ে ডুবিয়ে দেন। এই অভিযানে অংশ নেন শেখ মহসীন আলী, আলফাজ উদ্দিন, আ: সেলিম, আ: কাদের, মুজিবর রহমান, ইমদাদুল হকসহ ৪৮জন নৌ-কমান্ডো।

অক্টোবর মাসে পুনরায় বদিউল আলম বীর উওমের নেতৃত্বে মংলা বন্দর অভিযানে আসেন। এক সপ্তাহের ব্যবধানে গাজী মোঃ রহমতউল্লা আরও ৪০জন কমাণ্ডো সহ পাইকগাছা এসে পৌঁছেন। তখন থেকে উভয় দলনেতা পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে অপারেশন পরিচালনা করতে থাকেন। নভেম্বর মাস পর্যন্ত বদিউল আলম এবং গাজী মোঃ রহমতউল্লা বন্দরে ১০/১২টি অভিযান পরিচালনা করেন। এছাড়া স্থলে ১২/১৪টি বৃহৎ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বিশ্বনাথ এরমাঝে অধিকাংশ যুদ্ধে অংশ নেন। নভেম্বর মাসের শেষে বদিউল আলম পলাশী ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু গাজী মোঃ রহমতউল্লা ৪ ডিসেম্বর মংলা বন্দরে আরও একটি জাহাজ অপারেশন করেন। খুলনা শহর দখলের জন্য ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মরনপন যুদ্ধে লিপ্ত হন। বিশ্বনাথ পালিতের এই সকল ভয়াবহ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। এই দু:সাহসী যোদ্ধা বর্তমানে বেকার এবং মানবেতর জীবন যাপন করছেন।



মোঃ খায়রুল আনাম, পিতা-সৈয়দুর রহমান। গ্রাম-কিশোর নগর, থানা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা। জন্ম-১ জুলাই ১৯৫৩। '৬৯ সালের গণআন্দোলনে যোগ দেন।

এপ্রিল মাস অবধি নিজ গ্রামে অবস্থান করেন। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও দালাল-রাজাকারদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মতিনগর ক্যাম্পে যোগ দেন। পরে তাঁদের মেঘালয় ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

জুন মাসে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী ক্যাম্পে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে হিরন পয়েন্ট অপারেশনের জন্য কমাণ্ডো দলের সাথে প্রেরিত হন। কিন্তু সুন্দরবনের মাঝে মেজর জিয়াউদ্দিন এর ক্যাম্পে প্রায় একমাস অবস্থানের পর ফিরে আসেন। কোন অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেননি বলে আজও বেদনা অনুভব করেন। সাথী কমাণ্ডোদের মাঝে ফরিদপুরের আবিউর রহমান এর কথা তিনি স্মরণ করতে পারেন।

স্থল বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন জিয়াউদ্দিন। অন্যান্যের মাঝে লেঃ বেগ, হাবিলদার মধু এইসব নামে সম্বোধন করতে শুনেছেন।

স্বাধীনতার পর শিক্ষকতা শুরু করেন। বর্তমানে গোপীনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (বুড়িচং) প্রধান শিক্ষক।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



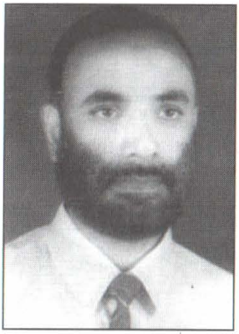
ওসমান গনি, পিতা-আব্বাস উদ্দিন মল্লিক। গ্রাম-বারীনদীয়া, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ। বর্তমানেঃ কোটচাঁদপুর বাসষ্টান্ড পাড়া, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।

১৯৭১ সালে আই এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ২৫ মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত গমন করেন। পলাশী ক্যাম্পে তিনমাস নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ৬০ জন কমান্ডো দলের সাথে চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ নেন। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে ৬০ জন কমান্ডো দলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। তিনি একটি গ্রুপের লীডার ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দরে ৬০ জন কমান্ডো প্রেরিত হলেও ২০ জন কমান্ডো সীতাকুন্ড থানার এক জেলেপাড়ায় থেকে যায়। তাঁরা সম্মুখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান এবং তাদের নির্মম হত্যাকান্ডের বর্ণনা শুনে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারেননি। এই দলের লীডার ছিলেন আব্দুর রশীদ। অন্যান্য কমান্ডোরা হলেন, দেলোয়ার হোসেন, আবু তাহের, মূসা চৌধুরী, অনিল বরন, সাইদুর রহমান, মনোজ দত্ত প্রমুখ। এই ব্যর্থতার জন্য লেঃ কমান্ডার মার্টিস আঃ রশিদকে পুনরায় নৌযুদ্ধে পাঠাননি। ডিসেম্বর মাসে তিনি স্থল বাহিনীরি গেরিলার সাথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন।

ওসমান গনি স্বাধীনতার পর ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে ব্যাংকের চাকরি গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি সোনালী ব্যাংক মোবারকগঞ্জ সুগার মিল, ঝিনাইদহ শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ননা, তারিখঃ ১০ জুন ২০০০)



মোঃ শফিউল্লাহ, পিতা-আবদুর রব পাটওয়ারী। গ্রাম-চরহাজির, ডাক-মাঝিরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী। জন্ম-১৯৫২ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি পাশ।

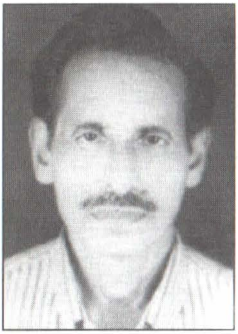
১৯৭১ এর মার্চ মাসে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে যুবক শফিউল্লাহ এলাকার ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করে প্রতিদিন মিটিং মিছিল করতে থাকেন। এরমাঝে চলে আসে ২৫ মার্চ। সেদিন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা শুরু করলে তা বিদ্যুতের মত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ২৬ মার্চ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে তিনি সহ এলাকার ছাত্র-যুবক সশস্ত্র প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এপ্রিল মাসে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী তাঁর এলাকায় ঢুকে নির্মমভাবে অত্যাচার শুরু করে তখন তিনি বাড়ি ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

প্রথমে ভারতের আগরতলা ক্যাম্পে যোগ দেন। এখানে কিছুদিন অবস্থান গ্রহণের পর নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী উপস্থিত হন। এখানে তিনমাস কঠোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিস্ফোরক এবং লিমপেট মাইনের ব্যবহার এবং বিশেষ পদ্ধতির সাঁতার রপ্ত করাই ছিল মূল প্রশিক্ষণ। নভেম্বর মাসে তিনি বরিশাল নদী বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। পরবর্তীতে নৌবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে নিজ গ্রামে অবস্থান করছেন এবং বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। তার এলাকায় স্বাধীনতা বিরোধীদের মাঝে অন্যতম প্রফেসর আঃ আউয়াল, আঃ রহিম (জামাতের থানা নেতা), আবু নাসের (জামাতের কেন্দ্রীয় নেতা), ফজলুল হক (জামাতের রোকন)।

(তথ্যঃ লিখিত বর্ণনা এবং অডিও রেকর্ডিং, তারিখঃ ২০ জুলাই ২০০০)



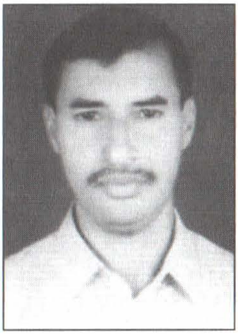
মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ মিয়া, পিতা-মোঃ আতাহার আলী মিয়া, গ্রাম- চালিতাবুনিয়া, থানা-মোরলগঞ্জ, জেলা-বাগেরহাট। জন্ম-১৫ই জুন ১৯৫১। শিক্ষাগত যোগ্যতা-এস.এস.সি পাশ।

১৯৭১ সালে দৌলতপুর বি.এল. কলেজের ছাত্র ছিলেন। '৭১ সালের ২৫ মার্চ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে ৪ এপ্রিল তিনি ডাঃ আব্দুস সালাম (বারডেম, ঢাকা) সহ সীমান্ত অতিক্রম করে ১০ এপ্রিল ভারতের তকিপুর ক্যাম্পে যোগদান করেন।

এখানে একমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১২ মে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী চলে যান। ডাঃ সালাম স্থল বাহিনীর গেরিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য চাকুলিয়া চলে যান।

নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অক্টোবর মাসে মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণের প্রেরিত হন। কিন্তু কমাণ্ডার আফজাল এবং আনোয়ার মংলা বন্দর না যেয়ে সাতক্ষীরা জেলার অধীন শ্যামনগর থানার হরিনগর নামক স্থানে পাকিস্তানী গানবোটের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। পাকিস্তান নৌবাহিনীর গানবোটের ভারী অস্ত্রের মুখে তাঁরা টিকতে না পেরে নৌকমান্ডো দল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ভারতে ফিরে যায়। এখানে তাঁরা ৮০টি মাইন, অনেকগুলি অস্ত্র, ফিন্স সহ যাবতীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম ফেলে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা জানার পর মেজর জলিল আফজাল এবং আনোয়ারকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেন। নৌ কমান্ডোরা পলাশী ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আব্দুল ওয়াদুদ ও ফিরে যান।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২৬ আগষ্ট ১৯৯৯)



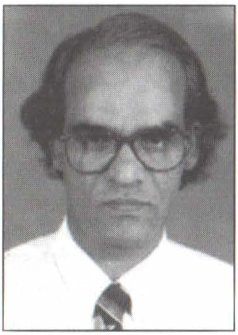
অমল চন্দ্র নট্ট, পিতা-মৃত নারায়ন চন্দ্র নট্ট। ১৬ কাঠপট্টি রোড, ঝালকাঠি। জন্ম-২২ অক্টোবর ১৯৪৮।

ছাত্র জীবনে ৬ দফা আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন সহ ৬৯ এর ১১ দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ২৫ মার্চের পর তিনি সহ একদল যুবক এলাকাতে একজন সামরিক বাহিনীর সদস্যের (বাচ্চু মিয়া) নিকট সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অত্র এলাকায় তখন সিরাজ শিকদারের দলের শক্ত ঘাঁটি ছিল। তারা হানাদার বাহিনীর আগ্রাসন প্রতিহত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ফলে শত্রু বাহিনী ঝালকাঠিতে সকল হিন্দু বাড়ি পোড়ায়ে দেয়। অসংখ্য মানুষকে হত্যা এবং নির্যাতন চালায়। এখানে সিরাজ শিকদারের দলের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের অমিল থাকায় দুইদলের মাঝেও যুদ্ধ হতো। এমতাবস্থায় নিরাপদ না মনে করায় অমল নট্ট জুন মাসে বন্ধুদের সাথে নিয়ে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রের জন্য ভারত গমন করেন। সেখানে প্রথমে বিহারের চাকুলিয়াতে প্রশিক্ষণ নেন। পরে অক্টোবর মাসে মুর্শিদাবাদের পলাশীতে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।নভেম্বর মাসের শেষ দিকে জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাসের নেতৃত্বে ৩০ জন নৌ কমাণ্ডোর একটি দল মংলা বন্দরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ তিনি সহযোদ্ধাদের সাথে মংলা বন্দরে একটি জাহাজ ডোবাতে সক্ষম হন।

তাঁর এলাকার স্বাধীনতা বিরোধীদের মাঝে ব্যারিষ্টার আক্তার, শুক্কুর ফারুকী, ডাঃ ফজলুল হক, বারেক আলতাফ, আলী চেয়রম্যান, জেবালুল ইসলাম, রাজ্জাক চেয়ারম্যান, মজিদ খলিফা, মালেক খলিফা, আতাহার আকন্দ, আজহার চেয়ারম্যান, ছাত্তার সর্দার, ফজলুল শিকদার এর মাঝে আলী চেয়ারম্যান অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যায় সহযোগিতা করেছে এবং জেবালুল ইসলাম (জেবল) পাকিস্তানীদের দ্বারা বহু নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করিয়েছে।

জেবল কাঠপট্টির সন্ধ্যারানী বণিকের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। কল্পনা নামের এক মেয়েকে সে তার বাড়িতে এনে রেখেছিল। পরে কল্পনা মারা যায়। ফজলু ডাক্তার, সভাপতি জামাত, ঝালকাঠি। সে মহেন্দ্র রায় এবং অমূল্য রায়ের বাড়ি ভেঙ্গে নিয়ে নিজের ঘর তৈরি করে। ঝালকাঠি হিন্দু অধ্যুসিত এলাকা হওয়ায় পাকবাহিনী এখানে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়। এসে সহযোগিতা যোগায় স্বাধীনতা বিরোধীরা। যারা আজ বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতার স্বপ্ন দেখছে।

(সূত্রঃ অমল চন্দ্র নট্ট এই লিখিত বর্ণনা দিয়েছেন, তারিখঃ ২৩ আগষ্ট ১৯৯৯)



মোঃ দীন ইসলাম, (২-২-১৯৫৩), পিতা-মৃত মোঃ আজিজুর রহমান। ১৭৮/৯ পশ্চিম দেওভোগ, নারায়নগঞ্জ। বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল অফিসার, পূবালী ব্যাংক লিঃ নিতাইগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, ১৯৬৯ সালে নারায়ণগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, তোলারাম কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কয়েকজন বন্ধুসহ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বক্স নগর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদেন। জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন ভারতীয় নৌবাহিনীর রিক্রুটিং টিম কর্তৃক মনোনীত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে উপস্থিত হন। একই সাথে অন্যান্য ইয়োথ ক্যাম্প থেকে শতাধিক যুবক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদেন।

অক্টোবর মাসে সাবমেরীনার বদিউল আলমের নেতৃত্বে মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। সকল অভিযান শেষে ভারত ফিরে যান। ডিসেম্বর মাসে মোল্লারহাট থানা অপারেশনের জন্য যখন তাঁরা বাগের হাট এলাকায় পৌছেন,এইসময় পাকবাহিনী আত্মসমর্পন করে। দেশ স্বাধীন হয়।

১৯৭৩ সালে পূবালী ব্যাংকে চাকরি গ্রহণ করেন এখনও কর্মরত আছেন।

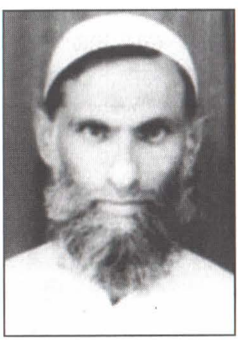
(তথ্যঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২৬ মে ২০০০)



মোঃ মতিউর রহমান, বীর প্রতীক, পিতা-আব্দুল আলী শেখ। গ্রাম-সাতঘরিয়া, পোষ্ট- হলদিয়া, থানা-লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ। জন্ম-২৮ আগষ্ট ১৯৫৭। শিক্ষাগত যোগ্যতা- এইচ.এস.সি।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ফরিদপুর এবং যশোর হয়ে পায়ে হেঁটে ৪ জন যুবক বাগদা বর্ডার দিয়ে ভারতে টালিখোলা ক্যাম্পে যোগদান করেন। এসময় তার বয়স মাত্র ১৪ বছর। নৌ কমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর গাইডের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ বন্দরে অপারেশনে ৩টি জাহাজ ডুবিয়ে দেন। এরপর আরও দুইবার নারায়ণগঞ্জের পাশ্ববর্তী নদীতে আবেদুর রহমানের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশ নেন। অক্টোবর মাসে কমান্ডো আবু তাহেরের নেতৃত্বে কাঁচপুর ফেরী ডুবিয়ে দেন। এজন্য তাঁকে বীরত্ব সূচক বীর প্রতীক খেতাব পদক প্রদান করা হয়। এই যুদ্ধে গ্রুপ লীডারকে পদক প্রদান করা হয়নি। মোঃ মতিউর রহমান বর্তমানে ঢাকার উত্তরাতে পলমল গার্মেন্টস কারখানার পরিদর্শক হিসাবে চাকরিরত আছেন।

(সূত্রঃ মতিউর রহমান বীর প্রতীক, তারিখঃ ৬ আগষ্ট ১৯৯৯)



মোঃ রইসউদ্দিন, পিতা-নওশের আলি সরদার, গ্রাম-দক্ষিণ গদাইপুর, থানা-আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা। ১৯৭১ সালে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে এবং অক্টোবর মাসে বটিয়াঘাটা থানার সম্মুখে ল্যান্ড ক্রাফট ও লঞ্চ ডোবানোর জন্য এক দুঃসাহসীক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানে দলনেতা ছিলেন শেখ আঃ কাদের।

স্বাধীনতার পর শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেন। বর্তমানে দক্ষিণ গদাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।



মোঃ শাখাওয়াত হোসেন (শওকত), পিতা-বন্দে আলী পাটওয়ারী। গ্রাম-অশ্বিনপুর, থানা-মতলব, জেলা-চাঁদপুর। ১৯৫১ সালের ২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। বর্তমানে ১৮নং ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর কমাণ্ডার।

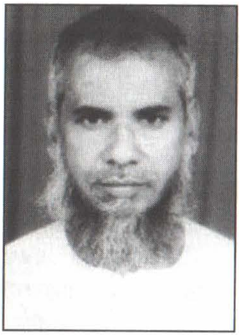
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি বক্সনগর ট্রানজিট ক্যাম্পে যোগদান করেন। ক্যাম্প পরিচালক ছিলেন প্রফেসর আব্দুর রউফ। এখান থেকে ৯১ বিএসএফ ক্যাম্পে তাকে পাঠিয়ে দেয়। এখান থেকে বাংলাদেশের নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী চলে যান। ট্রেনিং শেষে নৌবাহিনীর (মেড) মোঃ ফজলুল হক এর নেতৃত্বে ৭ জন নৌকমাণ্ডো দল পাঠানো হয় নারায়ণগঞ্জ বন্দর অভিযানে। প্রথমে তারা মনতলা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে নৌকাযোগে কসবা পৌছে। কিন্তু এই পথ দিয়ে প্রধান সড়ক অতিক্রম করে সামনে এগুনো সম্ভব নয় বিধায় তারা পুনরায় ভারত ফিরে যান। সেখান থেকে মেলাগড় ক্যাম্পে চলে আসেন। মেজর হায়দার দু'জন ছাত্র গাইড এর সাহায্যে পুনরায় তাঁদের নারায়ণগঞ্জ রওয়ানা করে দেন। নৌকাযোগে মন্দাভাগ হয়ে দুলালপুর বাজার, সেখান থেকে দেবীদ্বার থানার পোনারকালী বাড়িতে আসেন। এখানে তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এ্যাম্বুশে পড়েন। তুলারাম কলেজের দু'জন ছাত্র যারা গাইড হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন তারা পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হয়। শত্রুরা তাঁদের দু'জনকে গুলি করে হত্যা করে। দলনেতা ফজলুল হকের ডান হাত গুলি বিদ্ধ হয়। সকল কমাণ্ডো পানিতে ঝাঁপিয়ে আত্নরক্ষা করতে সমর্থন হন। ছাত্র দু'জন হলেন আবু বক্কর ছিদ্দিক ও আবুল হোসেন। এই দলে ছিলেন কালু, হেদায়েত, সিরাজুল ইসলাম, বোরহান আহমদ প্রমুখ। তাদের সকল অস্ত্রশস্ত্র হারিয়ে ফেলেন।

মেলাঘর পৌঁছানো মাত্র মেজর হায়দার দূর্ঘটনার কথা শুনে সব কয়জনকে একটি তাবুতে আটকে রাখেন। পরে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর মেজর হায়দার বোরহান উদ্দিন আহমদকে গ্রুপ লীডার করে পুনরায় চাঁদপুর বন্দরে নতুন একটি দলকে পাঠান। এই দলে ছিলেন শাখাওয়াত, মনীর হোসেন, শফিকুল ইসলাম, আমিন, আবুল কাসেম, সেলিম, ফজলুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। তারা মতলব থানার এখলাসপুর ঢালী বাড়ীর নসু মিঞার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাড়িটি ছিল মেঘনা নদীর তীরবর্তী। নসুমিয়া ছিলেন সংগ্রাম কমিটির সভাপতি। এখানে থেকে তাঁরা কয়েকটি অপারেশন করেন। এছাড়া চান্দ্রা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প কমাণ্ডার জহুরুল

হক পাঠান এর নেতৃত্বে প্রায় ৩০০ জন গেরিলা যোদ্ধা চাঁদপুর রেল ষ্টেশনের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত বার্মা ইষ্টানের তেলের ডিপো এবং পাওয়ার জেনারেটর ধ্বাস করেন। জহুরুল হক পাঠান এর ক্যাম্প ছিল ডাকাতিয়া নদীর উত্তর পাড়ে। নৌকমাণ্ডোদের মাঝে শাখাওয়াত হোসেন একমাত্র এই দুঃসাহসিক যুদ্ধে অংশ নেন।

শাখাওয়াত হোসেন আর্শ্চাযান্বিত হয়ে বলেন যে সব কমাণ্ডো অসুস্থতার জন্য পানিতে নেমে ট্রেনিং পর্যন্ত নিতে পারেনি তারা পরবর্তীতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অন্যের যুদ্ধকে নিজের বলে বর্ণনা করেন। বার্মা ইষ্টার্ন ডিপো এবং পাওয়ার হাউজ ধ্বংস করতে কোন নৌকমাণ্ডো অংশগ্রহণ করেনি অথচ একজন নৌকমাণ্ডো প্রতিটি মিটিংয়ে এই যুদ্ধটি তিনি করেছিলেন বলে বর্ণনা করতে শুনে থাকেন। এজন্য বীরত্ব সূচক খেতাব ও তিনি পেয়েছেন। শহর কেন্দ্রীক শিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারাই গ্রামের অশিক্ষিত, কম শিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। নাহলে যুদ্ধের সময় সামনের কাতারে যাদের দেখিনি তারাই বীরত্বের খেতাব পেল কিভাবে? তিনি আক্ষেপের সাথে বলেন কোন অশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাকে খেতাব দেয়া হয়নি। অথচ গ্রামের ৯৫ ভাগ মুক্তিযোদ্ধা ছিল অশিক্ষিত। তারা সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছেন।

(তথ্য সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা ও অডিও রেকর্ডিং. তারিখঃ ১৮ আগষ্ট ১৯৯৯)

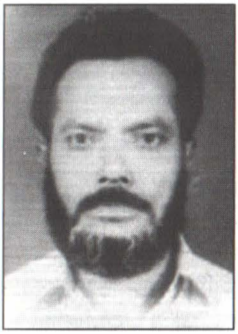


মোঃ আব্দুল গফফার, পিতা-মৃত সৈয়দ আলী গাজী। গ্রাম-কুলিয়া, থানা-দেবহাটা, জেলা-সাতক্ষীরা। জন্ম তারিখ ১৯৫৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি পাশ।

নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট, আহসানউল্লাহ বীর প্রতীকের নেতৃত্বে হীরন পয়েন্ট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ১২জন কমাণ্ডো হীরন পয়েন্ট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। দলনেতা ছিলেন কমাণ্ডো হুমায়ুন কবির। আঃ গফফার এই দলের উপদলনেতা ছিলেন। মেজর জিয়া উদ্দিনকে এই নৌকমাণ্ডো গ্রুপটির নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব দেন মেজর জলিল কিন্তু মেজর জিয়াউদ্দিন এই গ্রুপটিকে হীরন পয়েন্টে না নিয়ে উজিরপুর তার ক্যাম্পে নিয়ে একমাস বন্ধ করে রাখেন। তার লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতার পর ক্ষমতা দখলের জন্য অস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলা।

নৌকমাণ্ডো দল একমাস নিস্ক্রিয়ভাবে বসে থাকার পর মেজর জিয়া উদ্দিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্যাম্প ত্যাগ করে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। সাতক্ষীরা জেলার হরিনগর নামক স্থানে পৌছলে তাঁদের সাথে পাকবাহিনীর দুঞ্চটি গানবোটের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। অতঃপর তারা ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

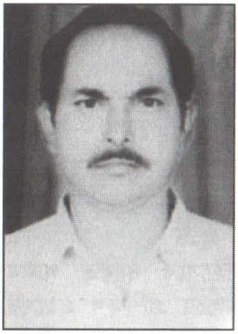
অক্টোবর মাসে গাজী রহমতউল্লা বীর প্রতীক এর নেতৃত্বে পুনরায় খুলনার দক্ষিণ এলাকায় অভিযানে যান এবং মংলা ও চালনা বন্দরসহ, আশাশুনি, পাইকগাছা, দাকোপ, কপিলমুনি, বার আড়িয়া, বড়দল, বটিয়াঘাটা, এবং খুলনা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। আঃ গফফার ৮ বার জলযুদ্ধে এবং ৮ বার স্থলে শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আজও তাকে বিচলিত করে। দুঃসাহসী যোদ্ধা আব্দুল গফফার এর বেদনা। বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে শত্রু সৈন্যকে পরাজিত করে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তাকে বীরত্ব সূচক খেতাব দেয়া হয়নি। নৌযুদ্ধে অংশ নেয়নি এমন কমাণ্ডো খেতাব পেয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন বীরত্ব সূচক খেতাব প্রদানের নীতিমালা কি? চোখের সম্মুখে দেখেছেন যারা যুদ্ধ না করেও খেতাব পেয়ে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন। অথচ তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেও এই সম্মান থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে তিনি দিনহীনভাবে ক্ষুদ্র একটি ব্যবসা পরিচালনা করছেন। আঃ গফফার তার ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমাণ্ডার।



মোঃ আব্দুল মুন্নাফ পাটওয়ারী, পিতা-মৃত হাশেম পাটওয়ারী। গ্রাম- দায়চারা, থানা- ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর। বর্তমান- ৩২৭, মানিকদী, মাদ্রাসা রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ।

গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ২৫ মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের স্থলবাহিনীর প্রশিক্ষণ নিয়ে একমাস যাবত যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যের সাহায্যকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মধ্য জুনে তিনি নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে চলে যান। এখানে ৪৫ দিন নৌযুদ্ধের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৫ আগষ্ট সাবমেরীনার বদিউল আলম বীর উত্তমের নেতৃত্বে চাঁদপুর বন্দর অভিযানে অংশ নেন। এই অভিযানে উপ দলনেতা পালন করেন সালাহউদ্দিন বীর উত্তম, মমিনউল্লা পাটোয়ারী বীর প্রতীক, আঃ হাকিম বীর প্রতীক, আলি আশরাফ, যশোশরের আব্দুস গফুর। তারা চাঁদপুর শহরের দক্ষিণে করেগো দোকানের কাছে ছোট একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন। এরপর তিনি আর কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। ১৬ ডিসেম্বর তিনি ভারতের কল্যানীতে ছিলেন। এখানে সাবমেরীনার এ.ডব্লিউ চৌধুরী সহ বেশ কিছু নৌযোদ্ধার সাথে ছিলেন। স্বাধীনার পর থেকে বেকার। এখন তাঁর ছেলেকে কোথাও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলে তিনি বেঁচে থাকার একটি অবলম্বন পান। বর্তমানে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।

(সূত্রঃ তিনি এই তথ্য প্রদান করেন, তারিখঃ ২৯ জুলাই ১৯৯৯)

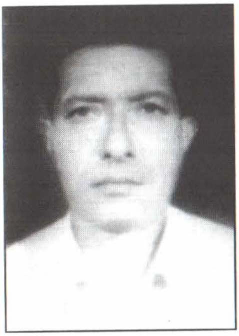


মোঃ ইমদাদুল হক, পিতা- মরহুম আবুল কাশেম সরদার। গ্রাম- কুলিয়া, ডাকঘর- গুরুগ্রাম, থানা- দেবহাটা, জেলা- সাতক্ষীরা। জন্ম তারিখ ১৯৫২। এইচ.এস.সি পাশ।

নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ৬০ জন কমান্ডো সাবমেরীনার আহসানউল্লার নেতৃত্বে অভিযানে অংশ নেয়। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে ১২জন কমান্ডোর এক একটি গ্রুপ সৃষ্টি হয়। ১২ জনকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য একজন গ্রুপ কমান্ডার বা উপনেতা নির্বাচিত হয়। ইমদাদুল হকের গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন মুজিবুর রহমান। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহীতে কর্মরত।

১৫ আগষ্ট, মংলা বন্দর অভিযান শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে তারা পাকিস্তান বাহিনীর এ্যামবুশে পড়ে যান। উভয় পক্ষের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধে সিরাজুল এবং আফতাব উদ্দিন শহীদ হন। ৪জন বন্দি হয়। তারমাঝে ইমদাদুল ছিলেন। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন। কমান্ডাদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য যে সব স্থলবাহিনীর গেরিলাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সিরাজুল এবং আফতাবকে জীবন দিতে হয়েছে। স্থল বাহিনীর গেরিলাদের নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে যেয়ে মতভেদ ঘটে। এছাড়া তাদের নিজেদের মাঝেও অনৈক্য সৃষ্টি হয়। খিজীর আলী পুনরায় ভারত ফিরতে চাননি কিন্তু আফজাল এবং আনোয়ার বনবিভাগের দুটি লঞ্চ নিয়ে প্রত্যেকটি ফরেষ্ট অফিসে হানা দিতে শুরু করে। পথিমধ্যে তাঁরা পাকবাহিনীর এ্যামবুশে পড়ে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বান্দ হন। এই নিয়ে গ্রুপ কমান্ডারদের সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এবং অবস্থা তাদের মূলদল ত্যাগ করে পৃথক ভাবে ফিরে যাওয়ায় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। একমাস যশোর সেনানিবাসে অমানবিক নির্যাতন সয্য করার পর ১৮ সেপ্টেম্বর, পালিয়ে পুনরায় যুদ্ধে অংশ নেন। সেপ্টেম্বর থেকে ইমদাদুল হক পারুলিয়া ব্রিজ ও কুলিয়া ব্রিজ ধ্বংস, এল্লাচর যুদ্ধ এবং গল্লামারীতে ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে একটানা যুদ্ধ করেন। বর্তমানে তিনি এবং বর্ণনাতীত কষ্টে দিনাতিপাত করছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত র্বনা, তারিখঃ ২০ জুন ১৯৯৬)

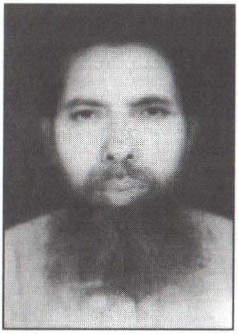


শেখ শামছুল আলম, পিতা-শেখ সামছুল হক। বর্তমান ঠিকানাঃ রোড নং-৫/ক, বাসা নং ১৩ ও নং-৬ মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পর নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনমাস প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ আগষ্ট, সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ বীর প্রতীকের নেতৃত্বে মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

অক্টোবর মাসে পুনরায় সাবমেরীনার বদিউল আলম বীর উত্তম এর নেতৃত্বে মংলা বন্দরে আসেন এবং নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনেকগুলি অপারেশনে দুঃসাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি আশাশুনি থানা দখল অপারেশনে অংশ নেন। অতঃপর ভারত প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন আঃ কাদের, মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবুর রহমান, শহীদ আফতাব উদ্দিন, শহীদ সিরাজুল ইসলাম, খলিলুর রহমান, প্রফুল্ল কুমার মিস্ত্রী, অনিল কুমার, মহেন্দ্র, অরুণ মুখার্জি, দিলীপ কুমার, আঃ গফফার,জি এম, এ রহিম, মহসীন আলী, শেখ আঃ সেলিম, বজলুর রহমান, আলফাজউদ্দিন, ডাঃ মাহফুজুল হক, শফিক আহমদ, নুরুল ইসলাম, ইমদাদুল হক, বিশ্বনাথ, মুজিবুর রহমান, শমসের আলি, দলনেতা আহসানউল্লা বীর প্রতীক। উপ দলনেতা মুজিবর রহমান, মহসীন আলী, আলফাজউদ্দিন, খলিলুর রহমান, আব্দুল গফুর, মাহফুজুল হক, হুমায়ুন কবির, শেখ আঃ সেলিম।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ১০ নভেম্বর ১৯৯৯)



মোঃ এখলাছুর রহমান, পিতা-মোঃ এহছান উদ্দিন। গ্রাম-ছোট মহেশপুর, ডাক-নবাবগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর। ১৯৫৪ সালের ১০ জুন জন্মগ্রহণ করেন। এইচ.এস.সি পাশ।

১৯৭০ সালে দিনাজপুর আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। স্কুল জীবন থেকেই তিনি ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮ সালে নবাবগঞ্জ থানা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ছিলেন। ৬ দফা এবং ১১ দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ২রা মে, তিনি আওয়ামীলীগ নেতা কিউ.এম. আজিজুল হক ও শাহ জলিলুর রহমান এর নেতৃত্বে নবাবগঞ্জ স্কুল মাঠে প্রথম বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন এবং সকল পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে দেন।

ব্যাপারীটোলা গ্রামে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে এখলাসুর রহমান সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১লা এপ্রিল, সকালে ঘোড়াঘাট ক্যান্টনমেন্ট থেকে একজন ক্যাপ্টেন তিনজন সিপাহী সহ একটি জীপ গাড়ীতে বিরামপুর (চরকাই) অভিমুখে যাচ্ছিল। রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড থাকায় গাড়ির গতিবেগ ছিল কম। ২৫/৩০ জন ইপিআর, পুলিশ, সেনাসদস্য সহ ২/৩ হাজার জনতা তাদের ঘেরাও করে ধরে ফেলে। তিনজন সিপাহী ছিল বাঙালি। ক্যাপ্টেন ছিল অবাঙালি তার চোখ বেঁধে গ্রামের এক বৈঠক খানায় বন্দি করে রাখে। পরে জনতা পিটিয়ে হত্যা করে। এরফলে সেদিনই ঘোড়াঘাট ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত সকল বাঙালি সৈনিক, পাকিস্তানী অফিসার ও সৈনিকদের হত্যা করে ৩রা এপ্রিল ১৪/১৫ টি ভ্যান অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি করে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে বিরামপুর অভিমুখে রওনা হয়।

এমপি মোঃ ওয়াকিলউদ্দিন এই সৈন্য এবং ছাত্র জনতার সাহায্য নিয়ে সৈয়দপুর সেনানিবাস আক্রমনের পরিকল্পনা করেন। সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণে এখলাসুর রহমান যোগ দেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট অভিযান অন্যতম বৃহৎ যুদ্ধ বলে স্বীকৃত।

জুলাই মাসে তিনি ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা রাজগঞ্জ যুব ক্যাম্প থেকে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী চলে যান। ট্রেনিং শেষে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সন্দ্বীপ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। হাতিয়া ও রামগতি দ্বীপে তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে রাজাকারদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সন্দ্বীপে অভিযানে মাজহারউল্লা বীর উত্তমের নেতৃত্বে অংশ নেন। সহযোদ্ধা ছিলেন বদিউজ্জামান, একরামুল হক, মজিবর রহমান, মুজিবুল হক, অনিল বরণ রায় এবং দেলোয়ার হোসেন সহ আরও অনেকে। বর্তমানে কৃষিজীবি।

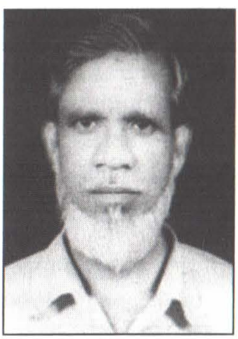
(সূত্রঃ সাক্ষাতকার প্রদান করেছেন. তারিখঃ ১ জুলাই ১৯৯৯)



মোঃ মহিবুল্লাহ, পিতা-মৃত আব্দুল করিম, মাতা-মঞ্জুরা খাতুন। গ্রাম-দক্ষিণ মেখল, ডাকঘর-পূর্বমেখল, থানা- হাটহাজারী, জেলা-চট্টগ্রাম। জন্ম- ১ জানুয়ারি ১৯৫৫ সাল। ঘরদুয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি এবং নাজিরহাট কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। তাঁর পিতা একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিক এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন।

২৫ মার্চের পর ভারতে যেয়ে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট চট্টগ্রাম বন্দরে 'অপারেশন জ্যাকপটের' অধীন সমন্বিত নৌঅভিযানে অংশগ্রণ করেন। এদিন বন্দরে ১০টি জাহাজ বিধ্বস্ত হয়। অভিডান শেষে ভারতে ফিরে যান। স্বাধীনতা উত্তর তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন। রকিবউল্লাহ, সকিবউল্লাহ এবং উম্মে সায়েম সুমী এই তিন সন্তানের জনক।

(অসমাপ্ত তথ্যঃ মহিবুল্লাহ. তারিখঃ ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০০)



সৈয়দ মোঃ আকরাম, পিতা- ডাঃ আব্দুল করিম। গ্রাম-নাটিংগী, থানা-চান্দিনা, জেলা-কুমিল্লা। জন্ম-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা-এস.এস.সি পাশ।

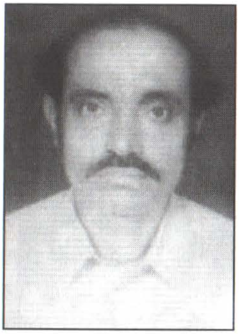
১৯৭১ সালের প্রথম দিকে তিনি ঢাকায় থেকে গণআন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ৭ মার্চ, রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জনসভায় যোগদান করেন। ২৫ মার্চ, ঢাকাতে পাকিস্থান সেনাবাহিনী গনহত্যা শুরু করলে তিনি পালিয়ে ঢাকা ত্যাগ করে নিজ বাড়িতে চলে যান।

৯ এপ্রিল, ১৫ জন বিডিআর এবং ১০ জন সেনাবাহিনীর সদস্য সহ প্রথম সোনামোড়া যান। এখানে রশিদ ইঞ্জিনিয়ারসহ ৭০ জন ছাত্র যুবক তাদের সাথে যোগ দেন। রশিদ ইঞ্জিনিয়ার এই দলসহ ভারতের কাঠালিয়া নামক স্থানে পৌছে প্রথম ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ১ মাস যাবত প্রশিক্ষণ গ্রহণ

করেন। এক মাসের ভিতর ক্যাম্পে সমবেত যুবকের সংখ্যা দাঁড়ায় কয়েক হাজার। স্থান সংকুলান না হওয়াতে অনেককে মেঘালয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সৈয়দ আকরাম ও মেঘালয় ক্যাম্পে চলে আসেন। মে মাসে তিনি নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী চলে যান। তিনমাস যাবত কঠিন প্রশিক্ষণ রপ্ত করে ১৫ আগষ্ট মংলা সমুদ্র বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। অভিযান সফল হয়। এই অপারেশনে দলনেতা ছিলেন সবমেরীনার আহসানউল্লাহ বীর প্রতীক।

অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় অভিযানে সাবমেরীনার বদিউল আলমের নেতৃত্বে পুণরায় মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। একই সময় সাবমেরীনার গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ্ আরও একটি কমাণ্ডো গ্রুপের নেতৃত্ব নিয়ে অত্র এলাকায় আগমন করেন। তিনি আশাশুনি থানার হাতিরডাঙ্গা নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে মংলা, চালনা সহ বিভিন্ন জলপথে নৌকমাণ্ডো অপারেশন চালাতে থাকেন। মূলত তখন থেকে উভয় গ্রুপের কমাণ্ডোরা সমন্বিতভাবে সকল অভিযানে অংশ নেন। সৈয়দ আকরাম অনেকগুলি অপারেশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি আশাশুনি থানা, পাইকগাছা, দাকোপ, কপিলমুনিতে অবস্থনরত শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। আশাশুনি থানা থেকে শত্রু বিতাড়ন করতে তিনি শত্রু বাঙ্কারের মধ্যে ১৬টি হ্যাণ্ড গ্রেনেড চার্জ করেন। মংলা বন্দরে তিনি কলম্বিয়া ট্রেডার্স নামে একটি জাহাজে মাইন স্থাপন করেন। তার সাথে ছিলেন জি এম এ রহিম, খলিলউল্লাহ, মোস্তাফিজুর রহমান, মাহফুজুল হক, আলফাজ উদ্দিন, বশির আহমদ, আব্দুল কাদের, আঃ সেলিম ককিল, আঃ গফফার, বিশ্বনাথ পালিত, নুরুল ইসলাম, এবাদুল, আলী আশরাফ, প্রফুল্ল কুমার মিস্ত্রী, খলিলুর রহমান, মুজিবুর রহমান।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



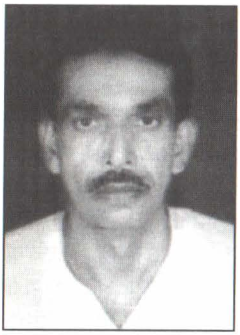
মোঃ মারফত আলী, পিতা-মোঃ ফরিদ উদ্দিন। মাতা-কদর বানু, গ্রাম-যাদুয়াখাল, ডাকঘর-খিদিরপুর, থানা- মতলব, চাদপুর, ১৯৪৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পুটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

১৯৬৩ সালে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির আহসানউল্লা হলে ক্যান্টিন বয় হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনেক আন্দোলন বিপ্লবের তিনি স্বাক্ষী। ক্যান্টিন বয় হলেও তিনি প্রতিটি মিছিলে অংশ নিতেন। দেশের অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিকে কেন্টিন বয় মারফত আলি হাতে চায়ের কাঠ উঠিয়ে দিয়েছেন। ৭ই মার্চ, রেসকোর্সে বংগবন্ধুর ঐতিহাসিক জনসভায় যোগদান করেন। ২৫ মার্চের গনহত্যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

এরপর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তিনি ভারতের কাঠালিয়া এবং মেলাঘয় ক্যাম্পে যোগদান করেন। সেখান থেকে পলাশীতে একমাস নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে মার্টিস সাহেব নভেম্বর মাসে ৭ জন কমাণ্ডোকে বাহাদুরাবাদ ঘাট অপারেশনের জন্য মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে পাঠানো হয়। দলনেতা ছিলেন আব্দুল কাদের। এখানে তারা একটা ষ্টিমার মাইন লাগিয়ে ডুবিয়ে দেন। অপারেশন শেষে তিনি মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে ফিরে আসেন। এখানে কিছুদিন থাকার পর পাকবাহিনী কামালপুরে আত্মসমর্পন করে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাহাড়ী পথ ধরে ময়মনসিংহ এসে পৌছেন। তার সাথে ছিলেন অন্যান্যের মাঝে কমাণ্ডো লুৎফর। আর কারো নাম স্মরন করতে পারেন না। এরপর তিনি নিজ বাড়িতে চলে যান।

এখন অপরের বাড়িতে বদলা (মজুর) দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি বলেন আমার জন্য দেশের স্বাধীনতা মূল্যহীন। বরঞ্চ মুক্তিযুদ্ধে যেয়ে চাকরি হারিয়েছি। এখন স্ত্রী পুত্রের কথা শুনতে হয়। স্বাধীনতার পর পুনরায় চাকরিতে ফিরে যাননি কেন? জানতে চাইলে বলেন অনেক বড় আশা নিয়ে যুদ্ধে জীবন দিতে গিয়েছিলাম কিন্তু ত্রিশ বছর ধরে দেখছি সব ফাঁকি। রাজনীতিবীদদের শঠতা এবং মিথ্যা আশ্বাসে মুক্তিযোদ্ধারা দুঃখে জীবন কাটাচ্ছেন। এর চেয়ে অন্যান্য দেশে যেমন স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের যুদ্ধের পর মেরে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্যও সেটিই উত্তম ছিল। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সবসময় সরকারের লেজুড়বৃত্তি থেকেছে। এটিকে তিনি বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নের মতো নিম্নমানের সংগঠন বলে বিবেচনা করেন। তারাই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বেশি প্রবঞ্চনা করেছে। পঞ্চাশোর্ধ অকুতোভয় নৌকমাণ্ডো মারফর আলিকে বীরত্ব সূচক খেতাব না দিয়ে সরকার তাঁর প্রতি অবিচার করেছে। এখন তিনি তার ছেলের জন্য একটা চাকরি চান।

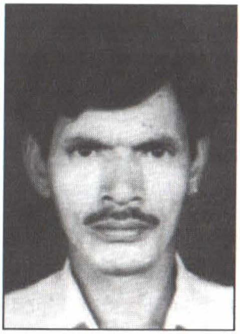
(তথ্যঃ মারফত আলী, তারিখঃ ৫ মে ২০০০)



মোঃ শাহজাহান আলম, পিতা- মৃত পাচু সরদার। গ্রাম-দোহার, ডাকঘর-আটুলিয়া বাজার, থানা-তালা, সাতক্ষীরা। জন্ম- ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল। এস.এস.সি পাশ।

২৪ পরগনা জেলার তকীপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। সেখান থেকে নৌ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পলাশী চলে যান। তিন মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। সফল অভিযান শেষে ফেরার পর ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ দাশ ফুলছড়ি মধুমতি ঘাট অপারেশনের জন্য ৪ জন নৌ কমাণ্ডোকে নিয়ে যান। শিলিগুড়ি পৌছানোর পর দাশ বাবু গাজী দূর্ঘটনায় শহীদ হলে তাদের অপারেশন স্থগিত থাকে। এখানে সি সিং এসে তাঁদের নিয়ে চিলমারী রংপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছেন। তাঁর সাথে ছিলেন কমাণ্ডো আঃ কাদের, মফিজ উদ্দিন এবং আর একজন নৌ কমাণ্ডো। ফুলছড়ি ঘাট (বাহাদুরাবাদ) অপারেশন শেষে তিনি হারিয়ে যান। দু'দিন পর ক্যাম্পে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছে শাহজাহান আলম যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এই ভেবে মনে করে অন্যরা আগেই পলাশী ক্যাম্পে ফিরে যান। ইতিপূর্বে এখানে অপারেশন করতে যেয়ে সাবমেরীনার আঃ রকীব মিয়া সহ আঃ সামাদ ও আবুল হাশেম নামে দুইজন নৌকমাণ্ডো শহীদ হয়েছিলেন।

(তথ্যঃ শাহজাহান আলম, তারিখঃ ২৪ আগস্ট ১৯৯৯)



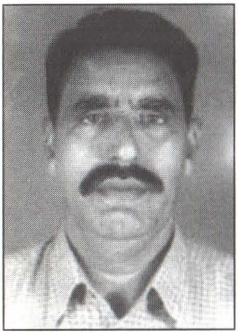
আবুল হোসেন সিরাজ, পিতা- মৃত সোনা মিয়া মল্লিক। গ্রাম-সখিপুর মল্লিককান্দী, থানা-ভেদরগঞ্জ, জেলা-শরীয়তপুর। অষ্টম শ্রেণী পাশ।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তায় হাতিমায়া ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন আলমের নেতৃত্বে ট্রেনিং গ্রহণ করেন। যুবককে অর্ন্তভূক্ত করে কমাণ্ডার মনির এর নেতৃত্বে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে জংগল বাড়িয়া, গাজীপুর, কুমিল্লার রসুলপুর এবং রাজাপুর আখাউড়া এবং বুড়িচং থানা দুইবার অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। বুড়িচং থানা দ্বিতীয়বার আক্রমণ কালে কমাণ্ডার মনির শহীদ হন এবং সিপাহী তাহের মারাত্মক ভাবে আহত হন। বুড়িচং থানা ২য় বার আক্রমনের জন্য রেকী করার সময় আবুল হোসেন পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে এক সপ্তাহ ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট আটক থাকেন। এসময় তার উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। পাকবাহিনীর একজন মেজর আবুল হোসেনকে বয়স্ক দেখে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। মুক্তি পেয়ে পুনরায় তাঁর বাহিনীর সাথে যোগদেন এবং অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তায় নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী ক্যাম্পে যোগদেন। এখানে দেড়মাস ট্রেনিং গ্রহণের পর সাবমেরীনার আবেদুর রহমান এর নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর অপারেশনে অংশ নেন। এখানে তারা নবীগঞ্জ বাজারের পাশে মাসুদ কনট্রাক্টরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন।

অক্টোবর মাসে পুনরায় নারায়ণগঞ্জ বন্দর অভিযানে আসেন। মুছার চর আশ্রয় কেন্দ্র থেকে কাঁচপুর এবং শীতলক্ষ্যায় তুরাগ জাহাজ ধ্বংস করেন। বর্তমানে কৃষিকাজে নিয়োজিত।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ননা, তারিখঃ ২০ জুন ১৯৯৫)



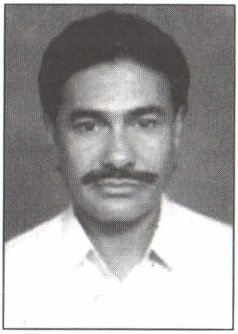
মোঃ নূরুল গণি, পিতা-মৃত মোঃ ইলিয়াছ মাষ্টার। গ্রাম- হাতীলোঠা, ডাকঘর- বারবকুন্ড, থানা-সীতাকুন্ড, জেলা- চট্টগ্রাম।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ চট্টগ্রাম প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। মেজর রফিক তাঁর ইপিআর বাহিনী নিয়ে পিছিয়ে গেলে পাকবাহিনী তাঁর এলাকায় বনর্বিচারে হত্যা লুন্ঠন অগ্নি সংযোগ করতে থাকে। বিশেষ করে যুবক ছেলেদের দেখামাত্র গুলি করে হত্যা অথবা সামরিক ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করে। এসময় যুবক নূরুল গণি প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারতে চলে যান।

মে মাসে তিনি হরিনা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। সেখান থেকে পলাশী। এখানে নৌকমাণ্ডো হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৫ আগষ্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিানে অংশগ্রহণ করেন এবং বহ্নিনোঙ্গর অপারেশনেও অংশ নেন। এই অপারেশনটি দলনেতার ভূলের কারনে ব্যর্থ হয়। অতঃপর অক্টোবর মাসে তিনি নারায়ণগঞ্জ নৌবন্দরে অপারেশনে চলে আসেন। এখানে সাবমেরীনার আবেদুর রহমান এর নেতৃত্বে ডেমরা ফেরীঘাট অপারেশনে অংশ নেন।

স্বাধীনতার পর তিনি চট্টগ্রামের প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি বেকার হয়ে পড়েন। বর্তমানে সীতাকুন্ড থানা সদরে কলেজ রোডে ব্যাক্তি মালিকানাধীন হাজী ইস্রাফিল কোম্পানিতে কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত তথ্যানুসারে, তারিখঃ ২১ নভেম্বর ১৯৯৯)



রমেন্দ্র সরকার, পিতা- মৃত বলাই কৃষ্ণ সরকার, গ্রাম-গোবিন্দকাঠী, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা। ১৯৭১ সালে সাতক্ষীরা কলেজে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ৬৯ এর গণআন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এই সময় নিজ এলাকায় ছাত্র ও জনগনকে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে বলিষ্ট ভূমিকা রাখেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করলে তিনি স্থানীয় ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করে প্রতিরোধ এর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ ছাড়া একটা নিয়মিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্ভব নয় উপলব্ধি করে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ভারতের তকিপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। ক্যাম্প কমাণ্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন শাহজাহান আলী। সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল।

১২ মে, তিনি এই ক্যাম্প থেকে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী চলে যান। তিন মাস প্রশিক্ষণ লাভের পর ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। নভেম্বর মাসে বাগেরহাট জেলার অধীন ফকিরহাট থানা দখল করার জন্য অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন এবং থানা শত্রু মুক্ত করেন।

(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা. তারিখঃ ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬)



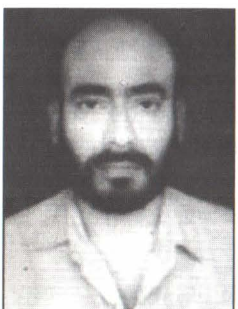
মোঃ ছাদেক হোসেন, পিতা- সেকেন্দার আহমেদ ভুঁইয়া। গ্রাম- জগতপুর, ডাকঘর- নতুন মুন্সীরহাট, থানা- ফুলগাজী, জেলা- ফেনী। ১৯৫২ সালের ৫ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এ ফেল।

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ চট্টগ্রাম ছিলেন। এরপর সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে যেয়ে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণে অংশ নেন। ১৫ আগষ্ট তিনি মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। এখানে পশুর নদীতে একটি তেলবাহী জাহাজে মাইন স্থাপন করে জাহাজটি ডুবিয়ে দেন। অক্টোবর মাসে সাবমেরীনার আব্দুর রকীব মিয়ার নেতৃত্বে ফুলছড়ি ঘাট অভিযানে অংশ নেন। উইং কমাণ্ডার

হামিদুল্লাহ খান তাঁর স্মৃতিচারনে বলেছেন ৬/৮ জনের নৌকমাণ্ডো দলটি রৌমারীতে অবস্থানরত তার ক্যাম্পে আসেন। তিনি গাইড দিয়ে রেকী করিয়ে অপারেশনে সার্বিক সহযোগিতা করেন। নৌকমাণ্ডোরা জাহাজে মাইন লাগাতে দু'টি জাহাজের মধ্যবর্তী অবস্থানে প্রবেশ করেন। এখানে বাধাগ্রস্ত হয়ে স্রোতের বেগ থাকে প্রবল। কমাণ্ডোরা প্রবল ঘূর্ণায়মান স্রোতের মুখে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরমাঝে জাহাজের নোঙ্গর দু'জনের পেটে ঢুকে যায় এবং এখানেই শহীদ হন। ফুলছড়ি ঘাটে ৩ জন নৌকমাণ্ডো শহীদ হন। ছাদেক হোসেন ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যান এবং কোনভাবে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন।

স্বাধীনতার পর থেকে আজও বেকার এবং মানবেতর জীবন যাপন করছেন। স্থানীয় আওয়ামীলীগের একনিষ্ঠ নেতা এবং কর্মী। বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আদর্শ নেতা। অত্যন্ত জেদী নৌযোদ্ধা ছাদেক হোসেন অত্যন্ত কষ্টে জীবন কাটালেও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। একইসাথে তাঁর প্রিয় সংগঠন আওয়ামীলীগ থেকে কখনও সরে যাননি।

(তথ্যঃ লিখিত বর্ণনা প্রদান করেন, তারিখঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



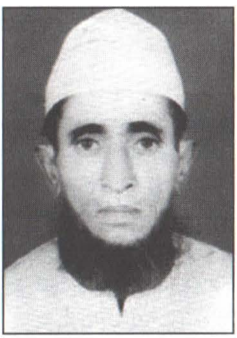
মোঃ মোক্তার হোসেন, পিতা-মৃত হাতেম আলী, গ্রাম- গকুলনগর ফার্ম, পোঃ দওনগর বাজার, ঝিনাইদহ। নবম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিজ গ্রাম ত্যাগ করে ১২ এপ্রিল ভারতের বনগাঁ ৫নং টালিখোলা ক্যাম্পে যোগদেন। এখানে কিছুদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মে মাসের ১২ তারিখ নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে উপস্থিত হন।

তিনমাস কঠোর কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। সেপ্টেম্বর মাসে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার অধীন হরিনগর পাকিস্তান নৌবাহিনীর গানবোটের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে নেতৃত্বদেন স্থল বাহিনীর যোদ্ধা আফজাল হোসেন এবং আনোয়ার। যুদ্ধটি ছিল সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত এবং হটকারীমুলক। যে কারণে পাকিস্তান নৌবাহিনীর দু'টি গানবোটের ভারী

কামানের শেলিং এ বহু নিরীহ মানুষের জীবন হানী ঘটে। নৌ কমাণ্ডোরা বিপুল পরিমান অস্ত্র, গোলা-বারুদ, মাইন সাঁতার কাটার সরঞ্জাম ফেলে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

স্বাধীনতার পর তিনি কৃষি বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। এখনও একই সংস্থায় কর্মরত আছেন।

(তথ্য সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯)



মোঃ ফজলুল হক ভূঁইয়া, পিতা-একিন আলী ভূঁহয়া, গ্রাম-কোড্ডা, পোঃ-আখাউড়া, জেলা-ব্রাক্ষন বাড়িয়া।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৩ মে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী আম্রকাননে সুসাইডাল স্কোয়াডে নাম লিখিয়েছিলেন। তিন মাস এই ঝুকি পূর্ণ ট্রেনিং নিয়ে নিজেকে একজন চৌকস নৌকমাণ্ডো হিসেবে প্রস্তুত করতে সমর্থ হন।

এর আগে ২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য ২৭ মার্চ সকালে আখাউড়া ইপিআর ক্যাম্প দখল করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ফজলুল হক একজন মুজাহিদ সদস্য ছিলেন। অস্ত্র পরিচালনায় পরিদর্শিতা পূর্ব থেকেই ছিল। সেই অস্ত্র বিদ্যা এই সময় শক্রর বিরুদ্ধে প্রয়োগের সুযোগ লাভ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন ইপিআর হাবিলদার, জনাব মোঃ ইসহাক বর্তমানে আখাউড়া কলেজের অধ্যক্ষ, হাবিলদার আঃ আজিজ, মুজাহিদ সদস্য মূছা মিয়া, সানু মিয়া, ফজলু, দৌলত সহ ৫০ জন সদস্য। অবাঙালি ইপিআর সদস্যরা গনহত্যা শুরু করলে তারা সামান্য কয়েকটি অস্ত্র নিয়ে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ে ইপিআর ক্যাম্প দখল করেন।

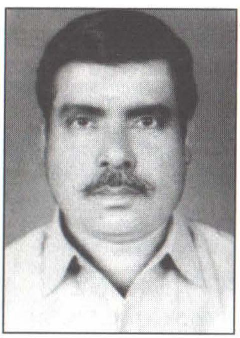
এরপর তিনি চুনারুঘাট যুদ্ধ, বাল্লা যুদ্ধে অংশ নেন। দুটি যুদ্ধ ছিল ভয়াবহ এবং কয়েকদিন ব্যাপী বিরতিহীন ভাবে চলে। অতঃপর মেজর শফিউল্লা তাঁকে নৌকমাডো প্রশিক্ষণের জন্য পলাশি পাঠিয়ে দেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি সাবমেরীনার আবেদুর রহমান এর নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর অপারেশনে অংশ নেন। এরপর জামালপুর ফেরীঘাট অভিযানে অংশ নেন। ভারতে

প্রত্যাবর্তনের পর মিত্রবাহিনীর সাথে হোসেনপুর একটি বড় ব্রিজ ধ্বংস করেন।

তার এলাকার রাধানগর গ্রামের সাদনা বেগম নামে এক মহিলাকে পাকবাহিনী উঠিয়ে নিয়ে যায়। ১৫ দিন পর সে ফিরে আসে। কিন্তু তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানোর ফলে অল্প দিনের মাঝেই মৃত্যু বরণ করে।

এক সময়ের অসমসাহসী সৈনিক ফজলুল হক। যার রক্ত-ঘামে এদেশ শত্রুমুক্ত। তিনি এখন আখাউড়া রেল ষ্টেশনে ঠেলাগাজী টেনে জীবন নির্বাহ করছেন। পত্রিকায় তার সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হলেও এই অন্ধ সমাজের কেউ আজও এগিয়ে আসেনি তাকে সাহায্য করতে। ফজলুল হক কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে আজও টেনে চলেছেন তাঁর দুই চাকার ঠেলা গাড়ি। এটিকে তিনি পুত্রসম সোহাগ করেন। কারণ সেটি তাঁর পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাঁর এলাকায় কুখ্যাত স্বাধীনতা বিরোধী ছিল জমসেদ ভুঁইয়া, আহাম্মদ ভুঁইয়া, রহমান ভুঁইয়া, শাহাদৎ হোসেন প্রমুখ।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



মোঃ আরজ মিয়া, (১-০৪-১৯৫৩), পিতা- মোঃ আব্দুল আজিজ। মাতা-মোছাঃ আমেনা খাতুন। গ্রাম-বাহাদুরপুর, থানা-আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মনবাড়ীয়া। দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

১৯৭১ সালে গণআন্দোলনে অংশ নেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের জঙ্গী বিমান আশুগঞ্জ ও ভৈরব এলাকায় ব্যাপক বোমাবর্ষন করে। এখানে সেনাবাহিনীর অনেক বাঙালি সদস্য এবং নিরীহ জনগণ প্রাণ হারায়।

এরপর পাকবাহিনী এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে নির্মম হত্যাযজ্ঞ, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ এবং নারী ধর্ষন শুরু করে। যুবক ছেলেদের দেখামাত্র গুলি করতে থাকে। তখন আরজ মিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত গমন করেন। ১৩ এপ্রিল তিনি আগরতলা (লেবুচুড়া) ক্যাম্পে যোগদান করেন। মে মাসের শেষের দিকে ৩০০০ যুবকের মধ্য থেকে মাত্র ২ জন কমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়। তিনি মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে চলে যান। এখানে তিনমাস প্রশিক্ষণ লাভের পর আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তায় সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ বীর

প্রতীক এর নেতৃত্বে মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন।

অক্টোবর মাসে পুণরায় বদিউল আলম, বীর উত্তম এর নেতৃত্বে মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। এই সময় নৌকমান্ডোদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য লেঃ সামছুল আরেফিন কমান্ডো দলের সাথে মংলা উপস্থিত হন। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি অত্র বন্দরে ৩টি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি নেন। এখনও একই কর্মস্থলে নিয়োজিত আছেন।

(তিনি ১৯৯৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর এই তথ্য প্রদান করেন)



মীর আজিজ হোসেন, পিতা- মৃত মীর আব্দুল ওয়াহাব। গ্রাম-বাহের কুশিয়া, পোঃ- ঘড়িসার, থানা- নড়িয়া, জেলা- শরীয়তপুর। ১৯৫২ সালের ১ মার্চ নিজ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর মোঃ নূরুল হকের নেতৃত্বে অক্টোবর মাসে ভাটিয়া পাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর বাকুন্দিয়া ব্রিজ অপারেশন, যশোর ঝিনাইদহ সড়কের মাঝে সিএন্ডবি ব্রিজ অপারেশন এবং বোয়ালমারী থানা দখল অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। এই সকল যুদ্ধে তিনি উপদলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সহযোগী যোদ্ধা ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান, মহিউদ্দিন, আবুল হোসেন, মহম্মদ আলী প্রমুখ। মাদারীপুর এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অপারেশনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। যুদ্ধে শহীদ হন এফ এফ মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া, মহিশখালী গ্রামের হাজী মোঃ ইব্রাহিম সহ অনেকে তার এলাকায় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এবং পাকবাহিনীর সহযোগী ছিলেন ডাঃ শাহজাহান মৌলভী। বর্তমানে তিনি ব্যবসায় নিয়োজিত।

(তথ্যঃ- লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ৩০ জুলাই ২০০০)



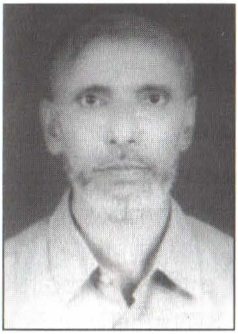
মোঃ আব্দুল মালেক, পিতা-মৃত আফতাব উদ্দিন, মাতা-মৃত সাহেরা খাতুন। গ্রাম-বড়নওপাড়া, পো-লৌহজং, থানা-লৌহজং, জেলা-মুন্সিগঞ্জ। বর্তমান-১২৬ রায়ের বাজার, ধনমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯। জন্ম-১৫ অক্টোবর ১৯৫২ সাল। লৌহজং হাইস্কুল থেকে ১৯৭২ সালে এস.এস.সি পাশ করেন।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের দুঃশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর আহবানে গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২৫ মার্চ দেশব্যাপী গণহত্যা শুরু হলে আব্দুল মালেক বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পরিকল্পনামত একদিন কাউকে না জানিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে বাড়ি ত্যাগ করেন। ১৮ এপ্রিল তিনিসহ কয়েকজন ভারতের আগরতলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। এখানে কিছুদিন স্থল বাহিনীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এবং ইপিআরও পুলিশ সদস্যদের সহযোগী হিসেবে সীমান্তে ছোট ছোট অপারেশনে অংশ নিতে থাকেন। কিছুদিন থাকার পর ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসার কতৃক মনোনীত হয়ে পলাশী নৌ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে চলে যান।

প্রশিক্ষণ শেষে আগষ্ট মাসে সাবমেরীনার আবেদুর রহমান এর নেতৃত্বে ২০ জন কমাণ্ডো দলের সাথে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর অপারেশনে অংশ নেন। এই অভিযানে উপদলনেতা ছিলেন আব্দুর রহিম। অপারেশনে তারা ৪টি জাহাজ এবং বার্জ ডুবিয়ে দেন। অভিযান শেষে ভারতে ফিরে যান। অক্টোবর মাসে পুনরায় নারায়ণগঞ্জ বন্দর অভিযানে অংশ নেন। এ সময় দলে নতুন নতুন কমাণ্ডো অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ রাইফেলস্ এ ভর্তি হন। ১৯৮৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী হাসিনা আক্তার একজন গৃহিনী। ১৯৯৯ সালে নায়েব সুবেদার হিসাবে বাংলাদেশ রাইফেলস্ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

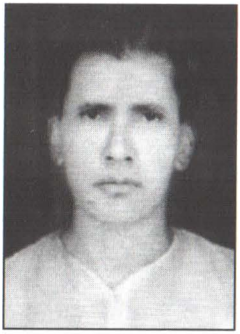
(তথ্য সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২৬ অক্টোবর ১৯৯৯)



মোঃ রফিকউল্লা ভূঁইয়া, পিতা-মোঃ আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, গ্রাম-খালিশপাড়া, থানা-চাটখিল, জেলা-নোয়াখালী, জন্ম- ৩ জুন ১৯৫১। সর্বশেষ বি এড ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। দেশব্যাপী ছাত্র ও গণআন্দোলন শুরু হলে সকল স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। যুবক রফিকউল্লা ভূঁইয়া ছাত্র জীবনেই ৬ দফা এবং ১১ দফা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে, ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে সমগ্র বাঙালি জাতি প্রতিরোধ ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্র রফিকউল্লা ও স্থানীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এলাকার ছাত্র যুবকরা সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। কিন্তু খালি হাতে বিনা অস্ত্রে একটি সসস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই অসম্ভব অনুধাবন করে তিনি বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত চলে যান। এখানে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে ৩০ জন কমান্ডো দলের সাথে বরিশাল নদী বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই গ্রুপের লীডার ছিলেন কমান্ডো মতিউর রহমান। তাঁরা বরিশাল শহরের ২ কিলোমিটার দক্ষিণে কীর্ত্তনখোলা নদীতে দু'টি খাদ্যবাহী বার্জ ডুবিয়ে দেন। এই সফল অভিযানের জন্য কমান্ডো মতিউর রহমানকে বীরত্ব সূচক বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়। কিন্তু মতিউর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার খেতাব প্রাপ্তির কথা জানতে পারেননি। আজও তার পদক মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাষ্টে পড়ে আছে। কেহ কেহ এই পদক অবৈধভাবে গ্রহণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আজও পর্যন্ত সরকার, মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাষ্ট, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জানেনা যে, কে এই মতিউর রহমান? বীর উত্তম মতিউর রহমান, বাড়ীর পাশ্ববর্তী প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দ্বন্দ্বে পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে লালমনিরহাট চলে যান। সেখানেই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এখনও তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানরা জীবিত। তারাও জানেনা তাদের পিতা মুক্তিযুদ্ধে একজন অসামান্য বীর। উল্লেখ্য তার দুইজন স্ত্রী বর্তমান। তার এই তথ্য সংগ্রহ দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

(তথ্য সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



মোঃ আমজাদ হোসেন, পিতা-মৃত এলেম উদ্দিন মিয়া, গ্রাম-কীর্ত্তিপাশা, থানা-ঝালকাঠি, ঝালকাঠি। জন্ম-১ জুলাই ১৯৫২। এইচ.এস.সি পাশ।

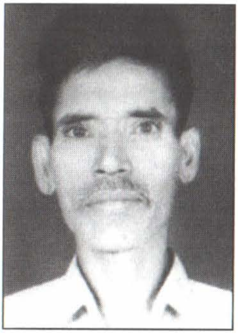
ষাটের দশকের শেষ ভাগে ছাত্রজীবনে তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারনায় বাঙালির মুক্তি আন্দোলন, ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ঝালকাঠি এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় পূর্ব থেকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের আধিপত্ত ছিল। এই সুযোগে সিরাজ শিকদার তার দলের কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে সমর্থ হন।

২৫ মার্চের পর তিনি সতীর্থ এবং এলাকার যুবকদের সংগঠিত করে স্থানীয় একজন সেনা সদস্যের নিকট সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু করেন। মে মাসে তার এলাকায় রাজাকার এবং শান্তি কমিটি গঠিত হলে তিনি প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারত চলে যান। প্রথমে একমাস বিহারের চাকুলিয়াতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবতীর্তে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

নভেম্বর মাসের শেষভাগে তাদের ৩০ জনের একটি দলকে খুলনার মংলা বন্দর অভিযানে পাঠানো হয়। দলনেতা ছিলেন কমাণ্ডো জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস। ৪ ডিসেম্বর তারা গাজী মোঃ রহমতউল্লাহর নেতৃত্বে মংলা বন্দরে একটি মালবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেন।

স্বাধীনতার পর নিজ এলাকায় অবস্থান করেন। বর্তমানে ঝালকাঠি সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে একজন দলিল লেখক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার অবমূল্যায়ন দেখে ব্যথীত হন।

(তথ্য সূত্র ঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখ ২৩ আগষ্ট ১৯৯৯)



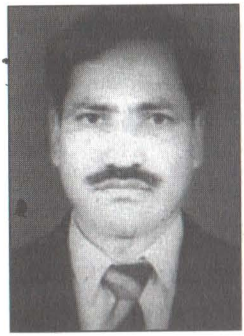
প্রভাত চন্দ্র হালদার, (১৯-৪-১৯৪৯), পিতা- মৃত সতীশ চন্দ্র হালদার, গ্রাম- রাজাপুর, শতদশকাঠী, ঝালকাঠী। বর্তমান-গ্রাম- কুঠারবাড়ী, পোষ্ট- কুড়িয়ালা, থানা-স্বরূপকাঠি, জেলা- পিরোজপুর। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ।

১৯৭১ সালে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ১৯৬৯ সালে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনে যখন সমগ্র বাংলাদেশ আন্দোলনের ভারে প্রকম্পিত তখন প্রভাত চন্দ্র অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত হন। সকল মিটিং ও মিছিলে তিনি থাকতেন সামনের সারিতে।

এরপর ২৫ মার্চ হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে এবং ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষনা দিলে তিনি এলাকার নেতৃবৃন্দের সাথে প্রতিরোধের জন্য সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের অঞ্চলটি হিন্দু জনসংখ্যাধিক্য হওয়াতে এখানে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার বেশি হয়। এক পর্যায়ে এলাকাতে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলে তিনি বন্ধু বান্ধবসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত গমন করেন।

ঝালকাঠি এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক দলের বেশি সমর্থক থাকায় প্রভাত এবং তার বন্ধুদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে বেশ বেগ পেতে হয়। পরে আব্দুর রব সেরনিয়াবাদের নির্দেশে ইচ্ছুক সকল যুবককে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। প্রভাত চন্দ্র প্রথমে চাকুলিয়াতে এবং পরে পলাশীতে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাসের নেতৃত্বে মংলা বন্দরে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। এখানে বন্দরে খাদ্য বোঝাই একটি বিদেশী জাহাজ ডুবিয়ে দেন। সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন গাজী মোঃ রহমতউল্লাহ সাহেব। তিনি ওই সময় খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এরপর ১৭ ডিসেম্বর খুলনা শত্রুমুক্ত হয়। বর্তমানে তিনি নিজ বাড়িতে গৃহস্থলীতে নিয়োজিত।

(১৯৯০ সালের ২০ আগষ্ট তিনি তার যুদ্ধের বর্ণনা দেন)



মোঃ রুহুল আমিন, (১-১-১৯৫০), পিতা- মৃত মোঃ খলিলুর রহমান, মাতা- মোছাঃ ছালেমা খাতুন। গ্রাম- বোয়ালী, ডাক- রূপসা, থানা- ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর। এস.এস.সি পাশ। বর্তমানঃ এ এস আই, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা।

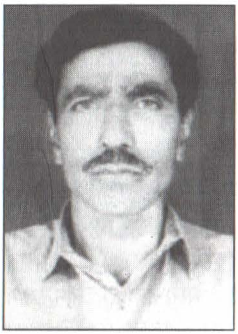
১৯৭১ সালের মার্চ মাসে গণআন্দোলনে যোগদান করেন। এপ্রিল মাসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত চলে যান। এখানে মেঘালয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ভর্তি হন। নৌ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ক্যাম্পে সমবেত যুবকদের মাঝে তিনি প্রথম সারিতে মনোনীত হন।

এরপর পলাশী নৌ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ট্রেনিং সমাপ্ত করে আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখ প্রথম অপারেশনে অংশ নেন। ২০ জন কমান্ডো এই দলভূক্ত ছিল। তারমধ্যে ১৮ জন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দলনেতা ছিলেন সাবমেরীনার বদিউল আলম। উপদলনেতা ছিলেন আলী আশরাফ। এই যুদ্ধে ৬টি পণ্যবাহী জাহাজ, বার্জ, পল্টুন ও ফ্লাট ধ্বংস হয়।

নভেম্বর মাসে তিনি দ্বিতীয়বার মতিউর রহমান, বীর উত্তম এর নেতৃত্বে ৩০ জন কমান্ডোসহ বরিশাল শহরের সন্নিকটে কীর্ত্তনখোলা নদীতে দু'টি খাদ্যবাহী বার্জ ডুবিয়ে দেন। এই অপারেশনের জন্য মতিউর রহমানকে বীর উত্তম খেতাব প্রদান করা হয়।

১৯৭৫ সালে তিনি পুলিশ বিভাগে ভর্তি হন। সাবমেরীনার আমিনউল্লা শেখ বীর বিক্রম এর কন্যার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি পুলিশ বিভাগে এ এস আই হিসেবে কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২০ আগষ্ট ১৯৯৯)



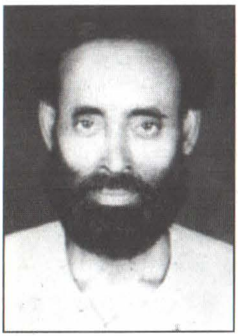
চিন্ময় কান্তি মন্ডল, (৩১-১-১৯৪৮) পিতা- মৃত চৌধুরী নাথ মণ্ডল। গ্রাম- ডুমারিয়া বাজার, থানা- টুঙ্গীপাড়া, জেলা- গোপালগঞ্জ। এস.এস.সি পাশ।

১৯৭১ সালে যখন সমগ্র বাংলাদেশের জনগণ বর্বর পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছিল এই সময় টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে স্থানীয় ছাত্র যুবকরা একটি সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তোলে। ২৬ মার্চ তারা আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গবন্ধুর পিতার বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। যুবক চিন্ময় এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শুরু করেন এবং ২৬ মার্চ, পতাকা উত্তোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

২৭ মার্চ, পাকবাহিনী বঙ্গবন্ধুর পিতার বাড়ি ঘেরাও করে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা ধরে সাথে সাথে গুলি করে হত্যা করে। এরপর চিন্ময় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রের জন্য ভরত গমন করেন।

চাকুলিয়াতে একমাস প্রশিক্ষণ শেষে তিনি কল্যানী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ফিরলে সে দিনই লেঃ কমাণ্ডার মার্টিস শতাধিক যুবককে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ দানের জন্য নিয়ে যান। চিন্ময়ও নৌ যুদ্ধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তখন প্রশিক্ষণ দিতেন ডাঃ শাহ আলম, এমদাদ হোসেন, আবু বক্কর সহ ১২ জন চট্রগ্রামের নৌকমাণ্ডো যারা প্রথম অপারেশনে অংশ নিয়ে ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। নভেম্বর মাসের শেষে তিনি জগদীশ চন্দ্রের নেতৃত্বে খুলনা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। এরপর দেশ স্বাধীন হয়। বর্তমানে কৃষি কাজে নিয়োজিত।

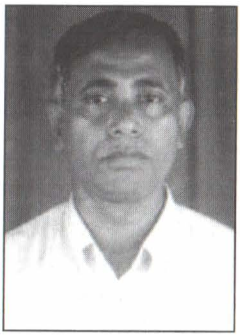
(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ১৫ আগষ্ট ১৯৯৯)



মোঃ সিরাজুল ইসলাম, (২-০৫-১৯৪৭), পিতা- মৃত মোঃ মফিজ উদ্দিন বেপারী। গ্রাম-মাঝিগাছা, থানা- কচুয়া, জেলা- চাঁদপুর। এস.এস.সি পাশ।

অক্টোবর মাসে তিনি সাবমেরীনার সৈয়দ মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে ২৪ পরগনা জেলার বাগুন্দিয়া ক্যাম্প হতে ইছামতি নদী অতিক্রম করে দেবহাটা থানার পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে খুলনার দক্ষিণ অঞ্চল দিয়ে বাগেরহাট হয়ে ফরিদপুর জেলার শাহজাহানপুর স্কুলে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অবস্থান করেন। প্রথমে তারা ভেদরগঞ্জ থানা আক্রমণ এবং দখল করেন। ২৩ অক্টোবর সকাল ১২টায় পাকবাহিনী ৮টি লঞ্চযোগে ডামুড়া বাজার আক্রমণ করেন। রাজাকারদের একটি দল পিছন থেকে জয় বাংলা ধবনী দিতে দিতে তাঁদের নিকটে চলে আসে এবং বাঙ্কারে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলে। এখানে ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। সিরাজুল ইসলাম অন্ধকারের মাঝে খালে ঝাঁপিয়ে আত্মরক্ষা করেন। পাকবাহিনী ডামুড্যা বাজার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এখানে একনাগাড়ে আট ঘন্টা যুদ্ধ হয়। সৈয়দ মোশাররফ হোসেন এই যুদ্ধে অসমসাহসীকতার পরিচয় দেন।

(সূত্রঃ তিনি এই তথ্য প্রদান করেন, তারিখঃ ২ আগষ্ট ১৯৯৯)



শেখ রুহুল আমিন, পিতা- জয়নাল আবেদীন শেখ। গ্রাম- বেতলি, ডাক- বেতলি হাটখোলা, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)। জন্ম তারিখ-১৯-২-৫৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি পাশ। কমাণ্ডো নং ০০৩০। ২১ এপ্রিল ভারতের নন্দী গ্রাম স্কুল ক্যাম্পে যোগ দেন। ১৩ মে, ১৯৭১ তারিখে নৌকমাণ্ডো হিসেবে মনোনীত হয়ে পলাশী চলে যান।

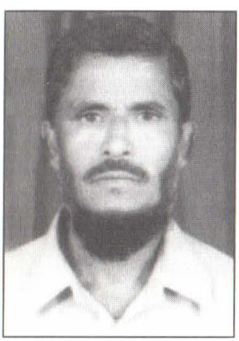
প্রথম অপারেশন চিটাগাং পোর্ট ১৫ আগষ্ট ১৯৭১। দ্বিতীয় অপারেশন অক্টোবর মাসে সিরাজগঞ্জ ঘাটে ফেরী অপারেশনে তাঁরা ৪ জন ছিলেন। রুহুল, সেলিম, জবেদ ও নাইমুল। তারপর চলে যান ভারত। কয়েক দিন পর চলে আসেন ক্যাপ্টেন জিয়ার সাথে নয় জন খুলনা সুন্দরবনের ভিতর। তারপর স্মরণ খোলা ফরেষ্ট অফিসে অবস্থান করি। সেখান থেকে তারা কোন নদীতে অপারেশনের কোন কিছু পায় নাই। শেষের দিকে স্মরণ খোলা থানা অপারেশনে ক্যাপ্টেন জিয়ার সাথে অংশগ্রহণ করেন। সাতদিন যুদ্ধ চলার পর স্মরনখোলা মুক্ত হয়। কয়েক দিন পর ভারত স্বীকৃতি দেয়। ওখান থেকে খুলনার দিকে রওনা করেন। দেশ স্বাধীন হয়। তারপর আবার স্মরনখোলা ক্যাম্পে ফিরে যান। ওখান থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭ দিন পর তারা নয়জন খুলনা শহরে চলে আসেন। তিনি মেজর জলিলের সাথে দেখা করেন। তারপর তারা যাঁর যাঁর বাড়িতে চলে যান।



নিরঞ্জন বিশ্বাস বেপারী, (১৫-১০-১৯৫২), পিতা- ভার্য্যরাম বেপারী, গ্রাম- খোর্দ্দ বড়াহাট, পোষ্ট- কির্ত্তিপাশা, জেলা- ঝালকাঠি। এস.এস.সি পাশ।

ছাত্র জীবনে প্রগতিশীল রাজনীতি চর্চা করতেন। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর নিজ এলাকায় ঢুকে অত্যাচার করতো। এই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিরঞ্জন জুন মাসে ভারতে চলে যান। প্রথমে চাকুলিয়াতে একমাস প্রশিক্ষণ শেষ করে কল্যানী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যেদিন ফিরে আসেন সেইদিনই নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী চলে যান। এখানেও একমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তখন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দিতেন সিনিয়র নৌ কমান্ডোরা। যাঁর মাঝে অধিকাংশ ছিলেন চট্রগ্রামের। ডাঃ শাহ আলম, আবু বক্কর, এমদাদ সহ ১০/১২ জন প্রশিক্ষণ দিতেন। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে মার্টিস সাহেব তাদের ৩০ জনের একটি দলকে খুলনা পাঠিয়ে দেন। এর দলনেতা ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস। বর্তমানে ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁরা ৪ ডিসেম্বর মংলা বন্দরে একটি জাহাজ ডোবান। এরপর দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। বর্তমানে বেকার।

(সূত্রঃ তিনি পত্র যুদ্ধের এই বর্ণনা দেন, তারিখঃ আগষ্ট ১৯৯৪)



মোঃ নূরুন নবী, পিতা- মৃত জাদুরুল হক, গ্রাম- বালিয়াদি, থানা- মিরসরাই, জেলা- চট্রগ্রাম। ১৯৫২ সালের ১ এপ্রিল নিজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এস.এস.সি পাশ করেন।

১৯৭১ সালে তিনি নিজ এলাকায় থেকে গণআন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

(তথ্যঃ অসম্পুর্ণ বর্ণনা, তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ৯৯)



এম. এ. রাজ্জাক, পিতা- ইয়াকুব আলী, গ্রাম- দাসাদী ডাকঘর- সফরমালী, থানা- চাঁদপুর, জেলা-চাঁদপুর। ১৯৫১ সালের ৪ জানুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেন। এইচ.এস.সি পাশ।

১৯৭১ সালে চাঁদপুর কলেজের ছাত্রনেতা হিসেবে ১৫ মার্চ, চাঁদপুরের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, যুবকদের সংগঠিত করে চাঁদপুরের টেকনিকেল স্কুলের মাঠে একটি প্রাথমিক ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা একই সাথে শহর ত্যাজী মানুষের আশ্রয় খাওয়া, চিকিৎসা এবং ভারত অথবা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে সাহায্য করতে থাকেন।

১০ এপ্রিল, পাকবাহিনী চাঁদপুর অগ্রাভিযান শুরু করলে আঃ রাজ্জাক চাঁদপুর ত্যাগ করে সাথী প্রশিক্ষনার্থীসহ প্রায় ৫০ জন ছাত্র যুবক ১২ এপ্রিল ভারতের হাতীমারা ক্যাম্পে পৌঁছেন। এখানে দুই মাসাধিক কাল সশস্ত্র গেরিলা গ্রহণ করে বেংগল রেজিমেন্টের সাথে সীমান্তে বিভিন্ন অপারেশন করতে থাকেন।

জুন মাসের মাঝামাঝি নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী ক্যাম্পে চলে যান। ১৫ আগষ্ট, ডেপুটি লীডার হিসেবে চাঁদপুর অভিযানে অংশ নেন। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে আঃ রাজ্জাক ৩নং সেক্টরে মেজর জেনারেল সি আর দত্ত, কর্ণেল মীর শওকত, মেজর মোতালিব এবং ক্যাপ্টেন হেলাল এর অধীনে সিলেট জেলার ছাতকটু টেংরাটীলা গ্যাস পাইপ লাইন ধ্বংস, শেরপুর ও ডাবরের ফেরীঘাট এবং জাউয়া নামক স্থানে একটা ব্রিজ উড়িয়ে দেন। স্বাধীনতা পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। বর্তমানে ঢাকা সেনানিবাসে রেগুলেটিং স্কুলে ট্রেনিং চীফ হিসেবে বাংবাদেশ নৌজাহাজ হাজী মহসীনে কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ২ অক্টবর ২০০০)

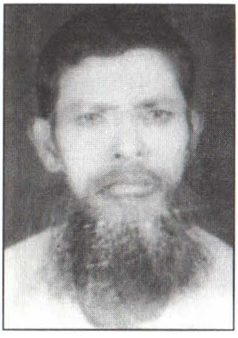


প্রফুল্ল কুমার মিস্ত্রী, পিতা- অন্নদা মিস্ত্রী, গ্রাম- দিগরাজ, থানা- মোংলা, জেলা- বাগেরহাট। ১৯৭১ সালে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী ছিলেন।

মার্চ মাসের পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে চলে যান। এখান থেকে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী ক্যাম্পে যোগদেন। তাঁর প্রথম অপারেশন ছিল ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অপারেশন। এদিন তাঁরা বন্দরে ৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেন।

অক্টোবর মাসে ১৬ জন নৌকমান্ডো এবং আরও ২০ জন পুলিশ, ইপিআরসহ ফকির হাট থানা দখল করার জন্য অভিযানে যান। দলনেতা ছিলেন ইপিআর হাবিলদার মোঃ মোস্তফা। তার বাড়ি বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পাকবাহিনী মোস্তফার পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁরা চরকুলিয়া গ্রামে ক্যাম্প তৈরী করে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৭ ডিসেম্বর খুলনা শত্রু মুক্ত করার জন্য প্রফুল্ল কুমার এবং তার দল একটানা ৩ ঘন্টা যুদ্ধ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন।

(সূত্র প্রদত্ত বর্ণনা। তাং ২০-০৮-৯৯)



মোঃ মজিবর রহমান, পিতা- মৃত আছিম উদ্দিন মণ্ডল। গ্রাম- ছোট মহেশপুর, পোষ্ট- নবাবগঞ্জ, জেলা- দিনাজপুর। জন্ম-১০ই মে ১৯৫৭ সাল। এস.এস.সি পাশ।

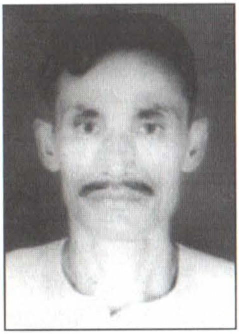
১৯৭০ সালে দিনাজপুর দেওয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি ছাত্রলীগের সহ সভাপতি। ১৯৬৮ সালে নবাবগঞ্জ থানা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ছিলেন। ৬ দফা এবং ১১ দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ২ মে, তিনি আওয়ামীলীগ নেতা কিউ.এম. আজিজুল হক ও শাহ জলিলুর রহমান এর নেতৃত্বে নবাবগঞ্জ স্কুল মাঠে প্রথম বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন এবং সকল পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে দেন।

ব্যাপারীটোলা গ্রামে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে এখলাসুর রহমান সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১ এপ্রিল, সকালে ঘোড়াঘাট ক্যান্টনমেন্ট থেকে একজন ক্যাপ্টেন তিনজন সিপাহী সহ একটি জীপ গাড়িতে বিরামপুর (চরকাই) অভিমুখে যাচ্ছিল। রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড থাকায় গাড়ির গতিবেগ ছিল কম। ২৫/৩০ জন ইপিআর, পুলিশ, সেনাসদস্য সহ ২/৩ হাজার জনতা তাদের ঘেরাও করে ধরে ফেলে। তিনজন সিপাহী ছিল বাঙালি। ক্যাপ্টেন ছিল অবাঙালি। তার চোখ বেঁধে গ্রামের এক বৈঠক খানায় বন্দি করে রাখে। পরে জনতা পিটিয়ে হত্যা করে। এরফলে সেদিনই ঘোড়াঘাট ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত সকল বাঙালি সৈনিক, পাকিস্তানী অফিসার ও সৈনিকদের হত্যা করে। ৩রা এপ্রিল ১৪/১৫টি ভ্যান অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি করে বাঙালি সৈনিকরা জয় বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে বিরামপুর অভিমুখে রওনা হয়।

এমপি. মোঃ ওয়াকিলউদ্দিন এই সৈন্য এবং ছাত্র জনতার সাহায্য নিয়ে সৈয়দপুর সেনানিবাস আক্রমনের পরিকল্পনা করেন। সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণে এখলাসুর রহমান যোগ দেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট অভিযান অন্যতম বৃহৎ যুদ্ধ বলে স্বীকৃত।

জুলাই মাসে তিনি ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা রাজগঞ্জ যুব ক্যাম্প থেকে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী চলে যান। ট্রেনিং শেষে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সন্দ্বীপ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। হাতিয়া ও রামগতি দ্বীপে তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে রাজাকারদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সন্দ্বীপে অনিল বরন রায়ের নেতৃত্বে অংশ নেন বলে উল্লেখ করেন। সহযোদ্ধা ছিলেন বদিউজ্জামান, একরামুল হক, মজিবর রহমান, মুজিবুল হক সহ আরও অনেকে। বর্তমানে কৃষিজীবি।

(সূত্রঃ সাক্ষাতকার প্রদান করেছেন, তারিখঃ ১ জুলাই ১৯৯৯)



শ্রী শশী ভুষণ রায় (১০-৭-১৯৫০), পিতা- মৃত ঝাপুড়া রাম রায়। গ্রাম- সোমনারায়ন, ডাক- নাজিম খান, থানা- রাজারহাট, কুড়িগ্রাম, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ।

১৯৬৬ থেকে ৬৯ এর ছাত্র ও গণআন্দোলনের সক্রিয় কর্মী শশী ভূষন। '৭১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এর জন্য স্থানীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং আওয়ামীলীগ ও স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীর সাথে সক্রিয় ভাবে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু যখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী স্থানীয় বাঙালির সাহায্য নিয়ে রাজাকার এবং শান্তি কমিটি গঠন করে, তখন তাদের অত্যাচারে নিরীহ জনগণ এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়।

যুবক শশী ভূষনও একসময় পৈত্রিক ভিটার মায়া ছেড়ে বাবা মায়ের সাথে ভারতে চলে যান। তিনি প্রথমে ভারতের যুব ক্যাম্পে যোগদান করেন। সেখান থেকে আগস্ট মাসে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় পলাশী চলে যান। এর আগে তিনি স্থানীয় ভাবে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট স্থলযুদ্ধে অংশ নেন।

অক্টোবর মাসের শেষ দিকে প্রশিক্ষণ শেষে তিনি সহ ৪০ জন নৌকমাণ্ডো মহেন্দ্রগঞ্জ সাবসেক্টরে চলে আসেন। এখানে ৬ জনের একটি কমাডোদল বাহাদুরাবাদ ঘাটে একটি ফেরী ডুবিয়ে দেয়। কর্ণেল নুরুন্নবী খান বীর বিক্রম কমাণ্ডো দলের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করেন। স্বাধীনতার পর শশী ভূষন্ শিক্ষাকতা পেশায় নিয়োজিত হন। বর্তমানে তিনি সোমালুর কুঠি উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক।

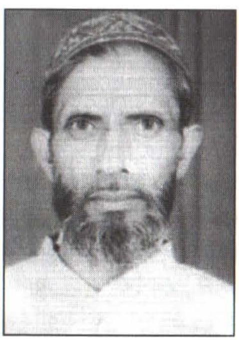
(সূত্রঃ তিনি লিখিত এই বর্ণনা দিয়েছেন, তারিখঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)

বিজয় কুমার দাস, পিতা- প্রকাশ চন্দ্র দাস, গ্রাম- নাহের পুর, ডাক- মহাজনহাট, থানা- মিরশরাই। এস.এস.সি পাশ।

১৯৭১ সালে গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। জোরারগঞ্জ ও চৌধুরী হাট দুই স্থানে ঢাকা চট্রগ্রাম সড়কের উপর গাছ ও পাথর দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। ২৬ এপ্রিল তিনি হরিনা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদেন। সেখান থেকে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী গমন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে আরিচা ঘাট অভিযানে অংশ নেন এখানে তাঁরা ২টি ফেরী ডুবিয়ে দেন। তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন মানিক দাস, হুমায়ুন কবির, প্রফুল্ল দাস, সালে আহম্মদ, এমদাদুল হক, নিজাম সহ মোট ১৭ জন।

তিনি উল্লেখ করেন, ফেরার পথে জনগণের অনুরোধে ফরিদপুর জেলার পাংশা নামক স্থানে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে রেললাইন উড়িয়ে দেন। কারণ এই রেলপথ ধরেই পাকবাহিনী যাতায়াত করত।

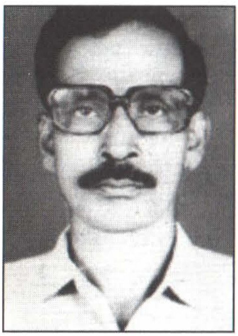
(সূত্রঃ তিনি এই তথ্য প্রদান করেন, তারিখঃ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)



খন্দকার রুহুল আমিন, পিতা- খন্দকার কফিল উদ্দিন, গ্রাম-শিবপুর, পোঃ-দশপাড়া, থানা-দাউদকান্দী, জেলা- কুমিল্লা।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের আগরতলা হাতমিারা ক্যাম্পে যোগদান করেন। সেখান থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে প্রতিষ্ঠিত নৌকমান্ডোদের জন্য প্র.তিষ্ঠিত নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে যোগ দেন। এখানে চারমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অক্টোবর মাসে সাবমেরীনার আঃ রকিব মিয়ার নেতৃত্বে ১১ জন কমান্ডোর একটি দল নিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে চলে আসেন ফুলছড়ি ঘাটে জলযান ডোবানোর জন্য। এই অপারেশনে দলনেতা আঃ রকিব মিয়া, আব্দুস

সামাদ ও আবুল হাশেম শহীদ হন। অভিযানে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্যরা হলেন, মোয়াজ্জেম হোসেন, মোরসেদ সরকার, ছাদেক হোসেন। ব্রহ্মপুত্রে প্রবল স্রোতের মুখে দলের অনেকে নদী অতিক্রম করতে ব্যর্থ হন। আঃ রকিব মিয়াসহ কয়েকজন জাহাজের নিকট পৌঁছেন এবং দূর্ঘটনায় তিনজন শাহাদৎ বরন করেন।

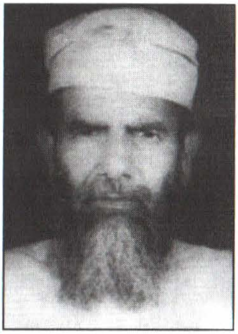


মোঃ আব্দুল মালেক, পিতা- ডেংগর শেখ, গ্রাম- নোলতলি, ডাকঘর- খিজির পাড়া, থানা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ। বর্তমানে, আখাউড়া জেলার কোড্ডা নামক গ্রামে বসবাস করেন। জন্ম তারিখ: ১৯৫৩ সাল।

২৫ মার্চ রাতে কুমিল্লা শহরে তার বড় ভাই ব্যবসাকেন্দ্রে অবস্হান করছিলেন। সেদিন রাতেই পাকবাহিনী কুমিল্লা পুলিশ লাইনের উপর আক্রমণ চালায়। সেনানিবাসের মাঝে বাঙালি সৈনিকদের নির্বিচারে হত্যা করে। তার বড় ভাই সেদিন দোকানের মালামাল নিতে ঢাকা আসেন। রাতে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হলে আঃ মালেক ৩০০ টাকা নিয়ে গোমতি পাড়ি দিয়ে বিবির বাজার সীমান্ত বিত্তপিতে পৌছেন। এখানে ২০/২৫ জন ইপিআর (বাঙালি) কে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে প্রত্যক্ষ করেন। ২৫ এপ্রিল তিনি বক্সনগর যুবক্যাম্পে পৌছে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি হন। জুন মাসে নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য চলে যান।

প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ই আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযান এবং অক্টোবর মাসে আঃ কাদের এর নেতৃত্বে বাহাদুরাবাদ ঘাট যুদ্ধে অংশ নেন।

এরপর চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় নৌযুদ্ধে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর গ্রামে ফিরে আসেন। এরপর প্রমত্ত পদ্মা নদীতে তাদের ঘরবাড়ি, বসত ভিটা ভেংগে নিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধা আঃ মালেক ভাগ্যান্বেষনে ১৯৭৩ সালে আখাউড়া চলে যান। এখনও সেখানে বসবাস করছেন। স্ত্রী মমতাজ বেগম দুই কন্যা এবং এক পুত্রের জনক। ক্ষুদ্র ব্যবসা করে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছেন।



আব্দুল মজিদ মিয়া, পিতা- আব্দুল জব্বার মিয়া, গ্রাম- সুবেদারকান্দী, ডাকঘর- মজুমদার কান্দী, থানা- পালং, জেলা- শরীয়তপুর। জন্ম তারিখ -৭-১-১৯৪২, মেট্রিক পাশ।

মে মাসের প্রথম দিকে পাকবাহিনী আংগারিয়া বাজারে প্রবেশ করে। এই সময় থেকে রাজাকার আলবদর, আল শামস, পিছ কমিটির লোকেরা পাকবাহিনীকে খুশি করার জন্য মুক্তি বাহিনীর নামে নিরীহ লোক ধরে এনে মাদারীপুর এ আর হাওলাদার জুট মিলের গেটে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

মে মাসের শেষ দিকে পাকবাহিনী নিরীহ জনগণকে দিয়ে আংগারিয়া বাজার লুট করায় যে ব্যক্তি লুটে অংশ না নেয় তাকে হত্যা করে। পাকবাহিনী বিদেশীদের দেখানোর জন্য লুটতরাজ রত অবস্থায় ছবি তুলতে থাকে। পাকবাহিনী এদিন কাশাভোগ গ্রামে ঢুকে বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভয়ে জংগলে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণকারী শত শত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে এক নারকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কয়েকজন শিশুসহ একজন বৃদ্ধ পুত্র স্ত্রী কন্যাসহ ঘরের অভ্যন্তরে গলাগলি ধরে লুকিয়ে শুয়েছিল। পাকবাহিনী সেখানে ঢুকে ঐ অবস্থায় তাদের সকলকে হত্যা করে। আরও বহু নরনারী, শিশু, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ কেহই রক্ষা পায়নি।

এই অবস্থা অবলোকনের পর তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৭/১৮ জন যুবক একসাথে দু'টি ছইওয়ালা নৌকা করে ভারতের উদ্দেশে রওয়না দেন। পথিমধ্যে মুক্তিবাহিনী তাদের নৌকা দুগুটি আটক করে। আব্দুল মজিদসহ যুবকরা ভয়ে আতকে উঠে। মুক্তিযোদ্ধাদের রাজাকার ভেবে তারা নৌকা থেকে নামতে সাহস করছিলনা। আব্দুল মজিদ সবার আগে ঘাটে নেমে আসেন এবং বলেন ''ভাই জীবন দিতে এসেছি, জীবন দিচ্ছি ভয় কিসের?'' মুক্তিযোদ্ধারা তাদের নৌকা খোজাখুজি করে চিড়া এবং গুড় ছাড়া কিছু পেলনা। তাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে মুক্তিবাহিনী তাদের ভারতে পৌছতে সাহায্য করে কিন্তু সেদিন থেকে আঃ মজিদকে দেখলে ওই মুক্তিযোদ্ধারা আজও তাঁর ওই উক্তিটি স্মরন করিয়ে,'' ভাই জীবন ভয় কিসের?

বহু কষ্ট এবং বিপদ এড়িয়ে তারা নদীয়া ক্যাম্পে ভর্তি হয়। সেখান থেকে ১ অক্টোবর বিহারের কুচবিহারে ল্যান্ডে একমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ফিরে পুনরায় নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী ক্যাম্পে যোগ দেন। ১৪

ডিসেম্বর তাদের একটি দলকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে লঞ্চে উঠানো হয়। কিন্তু তখন দেশের স্বাধীনতা আসন্ন বুঝে তাদের যুদ্ধ যাত্রা স্থগিত করা হয়। আঃ মজিদ এর পক্ষে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেদিন তিনি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সম্মত হয়েই বণ্ডে স্বাক্ষর করেছিলেন। বর্তমানে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভুলতে পারেননি।



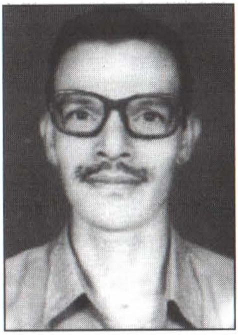
মোঃ রফিকউল্ল্যা, পিতা-মৃত মোঃ দায়েম, মাতা-মৃত মেহেরুন্নেছা, গ্রাম- কালিকাপুর, ডাকঘর- বাংলাবাজার, থানা- বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। জন্ম- ১৯৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর । ১৯৫৫ সালে বেগমগঞ্জ কে. বি হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৫৭ সালে করাচী বোর্ডের অধীন প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে আইকম এবং ১৯৬০ সালে করাচী মুসলিম কলেজ থেকে বি কম পাশ করেন।

১৯৫৫ সালে তদানিন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। এরপর পিএনএস বাহাদুর, ও পিএনএস হিমালয়াতে ৫ বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পিএনএস বাবরে ৭ বৎসর যুদ্ধে প্রশিক্ষণরত ছিলেন। ১৯৬৫ সালে এই জাহাজে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৯৬৬ সালে চাকরি থেকে তাঁকে রিলিজ দেয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারত চলে যান। ১০ ডিসেম্বর পদ্মা ও পলাশ জাহাজ দ্বারা খুলনা অভিযানকালে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এবং বিমান হামলায় আহত হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হলে চিকিৎসার জন্য খুলনা হাসপাতালে ভর্তি হন। এখানে একমাস চিকিৎসা গ্রহণের পর সুস্থ হয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

স্বাধীনতার পর ইনল্যান্ড প্রাইভেট জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসাবে চাকরি গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দিন চাকরি জীবন অতিবাহিত করার পর বর্তমানে বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করছেন। তাঁর সখ রাজনীতি ও গার্ডেনিং।

(তথ্যঃ মোঃ রফিকউল্ল্যা, তারিখঃ ২৭ মার্চ ২০০০)



অতুল কৃষ্ণ মিত্র, বাংলাদেশের ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ একদিনে সংঘটিত হয়নি। বাঙালির ধারাবাহিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ট নেতৃত্বে এক পর্যায়ে পৌছে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষনার পর পাকিস্তানী হায়েনারা নগ্ন হামলা চালায় নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর। প্রাণ হারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ। সম্ভ্রম হারায় অগনিত রমনী। পাকিস্তানী হায়েনাদের উলঙ্গ অত্যাচার থেকে মা-বো, স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করতে, পাকিস্তানী পশুদের দ্বারা মা-বোন,, স্ত্রীর সম্ভ্রম হারানোর প্রতিশোধ নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় এদেশের তরুণ এবং যুব সমাজ। তাদেরই একজন অতুল কৃষ্ণ মিত্র। পিতা-সুরেন্দ্র মিত্র। ১৯৪৬ সালে ঝালকাঠী জেলার, শতদশকাঠীর কাফুরকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্টার মিডিয়েট পাশ করার পর শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নেন।

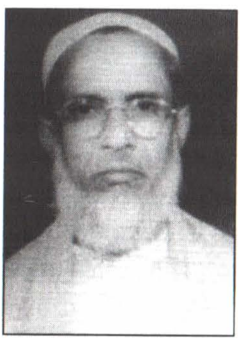
১৯৭১ সালে দেশব্যাপী যখন আন্দোলন এবং অসহযোগ চলছে তারপূর্বে তিনি পিরোজপুরে ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্টে প্রশিক্ষণরত ছিলেন। বংগবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষনের পর তিনি কর্মস্হল ছেড়ে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। এরপর ২৫ মার্চে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষনার পর অতুলের জনা অপেক্ষা করছিল এক গভীর অমানিযা। জ্ঞ৭১ সালে অতুল কৃষ্ণ দুই সন্তানের জনক।

জুন মাসের মাঝামাঝি সময় স্হানীয় রাজাকারদের সহায়তায় নরপশুরা তাঁর পরিবারের উপর যে নির্মম এবং জঘন্য অত্যাচার চালায় তার আংশিক বর্ণনা দিয়েছেনঞ্চ। একদিন ভোরে বাড়ির দরজায় ২/৩টি শব্দ পাইয়া আমরা স্তমিত হয়ে যাই এবং পালাবার চেষ্টা করি কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হয়। বাড়ির চারিদিক পাক হানাদাররা ঘিরে ফেলে এবং আমাদেরকে আটকিয়ে ভীষনভাবে অত্যাচার শুরু করে। আমার মাকেও রেহাই দিলনা। আমার স্ত্রীর উপর অকথ্য দূব্যবহার ও নির্যাতন চালায়। আমার এখন এক ছেলে ও এক মেয়ে তাদেরকেও মারধর করে। আমিও রেহাই পেলামনা। আমি কোনমতে পালাতে সক্ষম হই। কিন্তু পালায়েও রেহাই পেলাম না। কচুরী পানার নীচে পেঁপের ডগা নিয়ে ডুবে থাকি। ঐদিন ছিল পেয়ারা গাছ কাটার নির্দিষ্ট দিন। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে চুলের মুঠি ধরে মুক্তিবাহিনী মনে করে আমার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। পরে আমাকে অন্যান্য লোকদের সাথে লাইনে দাঁড় করে গুলির নির্দেশ দেয়। ইত্যবসরে একটি দল সেখানে উপস্হিত হয়। সেই দলে ছিল আমার একজন ছাত্র। সে আমাকে চিনতে পারে এবং ছাত্রটি বলে ওঠে ''এ আদমী হানার ওস্তাদ হ্যায়'' একথা বলে সে আমাকে তার কাছে টেনে নেয়। ছাত্রটির জন্য সেদিন প্রানে বেঁচে যাই। অন্যরা পাকবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়। ঐ

দিন ঐ অবস্হায় শপথ গ্রহণ করি যে, বাড়িতে আর ফিরে যাবনা। যেদিন দেশকে মুক্ত করতে পারব সেদিন বাড়ি যাব এবং পুনঃ মা ও পরিবার পরিজনদের সাথে মিশব। ওখান থেকেই দীপ্ত শপথ নিয়ে অজানা অচেনা পথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

অতুল কৃষঃ ভারতে পৌঁছে নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখ মংলা বন্দরে একটি দলের সাথে মিলিত ভাবে অভিযানে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর নিজ বাড়িতে ফিরে পুনরায় শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে বরিশাল জেলার বামরিপাড়াস্থ উত্তরকুল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ৩১ মার্চ ১৯৯৭)

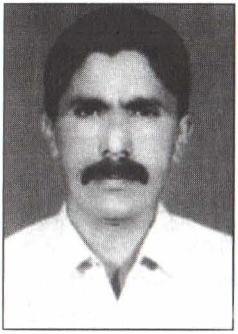


মোঃ আলী হোসেন, পিতা-কালা মিয়া। গ্রাম-বুগা, ডাকঘর- মহেশপুর (অফিস পাড়া), জেলা-ঝিনাইদহ। জন্ম তারিখঃ- ১৯৫২। ১৯৭১ সালে এস.এস.সি পরীক্ষার্থী ছিলেন।

২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র এবং নিরীহ বাঙালি হত্যা শুরু করলে তিনি গ্রাম ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত চলে যান এবং নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ১৫ আগষ্ট অপারেশন জ্যাকপটের অধীন চট্টগ্রাম সমদ্র বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে শিক্ষকতা পেশা বেছে নেন। এখনও তিনি শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন।

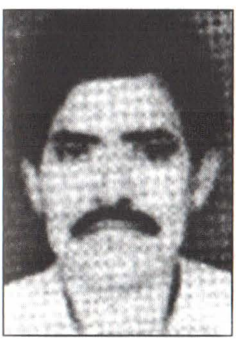
(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ১৩ নভেম্বর ১৯৯৯)



শান্তি মিয়া সরকার, পিতা-আবিদ মিয়া সরকার। গ্রাম- খলিলাবাদ, থানা- দাউদকান্দী, জেলা-কুমিল্লা। জন্ম তারিখ ১৯৫০। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

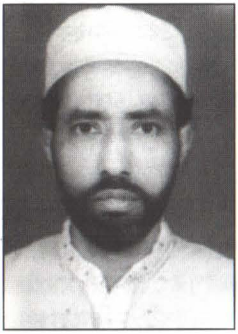
১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের শপথ নেন। ভারতে পৌঁছে নৌকমাণ্ডো ট্রেনিং নিয়ে অক্টোবর মাসে তিনি এবং একদল নৌকমাণ্ডো গ্রুপ জামালপুর ফেরী ঘাটে ফেরী ডোবানোর জন্য আসেন। কামালপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পৌঁছে শান্তি মিয়া একজন গাইডকে সাথে নিয়ে ফেরীঘাট রেকী করতে যেয়ে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। দু'জনকে দিয়ে সারাদিন শত্রুর বাঙ্কার খুড়িয়ে শান্তি মিয়াকে ছেড়ে দেয় কিন্তু গাইড ছেলেটিকে গুলি করে মেরে ফেলে। শান্তি মিয়া ক্যাম্পে ফিরে সেইদিন রাতেই সাথীদেরসহ জামালগঞ্জ ঘাট অপারেশন করেন। তাঁদের পাতা মাইনে দু'টি ফেরী এবং একটি লঞ্চ তলিয়ে যায়। এরপর নভেম্বর মাসে দাউদকান্দী ঘাট অপারেশনে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর ভাগ্যের অন্বেষনে মধ্য প্রাচ্য চলে যান। বর্তমানে ওমানে আছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩ এবং ১৪ মে ১৯৯৪)



মোহাম্মদ আলী, পিতা-মৃত আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা। গ্রাম-মাজহারদিয়া, থানা-নগরকান্দা, জেলা-ফরিদপুর। জন্ম তারিখঃ- ১৯৪৪ সাল। অষ্টম শ্রেণী পাশ।

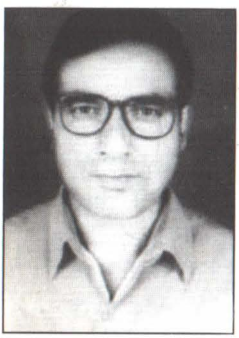
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অক্টোবর মাসে ফরিদপুর জেলার বাথুন্ডিয়া ব্রিজ এক্সপ্লোসিভ উড়িয়ে দেন। এই অপারেশনে সহযোগিতা করে শিক্ষক আব্দুর রশিদ। এরপর তিনি আরও অনেকগুলি যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর এল ডব্লিউ টিএতে চাকরী গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন চাকরি করার পর বিনা নোটিশে তাদের চাকুরীচ্যুত করা হয়। বর্তমান রহমান নেভিগেশন এর কোকো-২ এর মাষ্টার হিসেবে কর্মরত আছেন।



মোঃ শহীদ হোসেন, পিতা- আলতাফ হোসেন। গ্রাম-সান্দ্রা, পামচাই, চাঁদপুর। বর্তমান-৪৫৯/২ উত্তর শাহজাহানপুর (দোতলা), ঢাকা। জন্ম তারিখ- ৩-১-৫৬। আই এ পাশ।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নৌকমাণ্ডো হিসেবে ১৫ আগষ্ট বদিউল আলম বীর উত্তমের নেতৃত্বে চাঁদপুর বন্দর অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। অক্টোবর মাসে আমিনউল্লা শেখ বীর বিক্রমের নেতৃত্বে পুনরায় চাঁদপুর বন্দর অভিযানে আসেন। এবং বিজয় অর্জন পর্যন্ত অনেকগুলি অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর ষ্টোর অফিসার হিসেবে মহাখালী হাসপাতালে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালে চাকরিরত অবস্হায় লিভার সিরোসীসে অকালে মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন।

(সূত্রঃ তাঁর পুত্র সোহরাব হোসেন মিরাজ কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনানুসারে, তারিখঃ ৩০ অক্টবর ১৯৯৯)



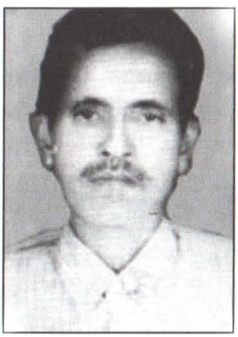
দিলীপ কুমার রায়, পিতা- মৃত মনীন্দ্র লাল রায়। গ্রাম- লস্কর, ডাকঘর-পাইকগাছা, জেলা- খুলনা। জন্ম তারিখ ১৪-৬-১৯৫৩। নবম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

পাকবাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে স্বপরিবারে এবং গ্রামের কয়েকশত নারী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ এক সালে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা থানাধীন বদরতলা নামক স্থানে পৌছলে স্থানীয় শান্তি কমিটির নেতা এবং তার লোকজন তাদের আটক করে সারাদিন বসিয়ে রাখে। চাঁদর বিছিয়ে যার নিকট যা অর্থ, অলঙ্কার ছিল সব জমা দিতে বলে। যুবকদেরকে পৃথক করা হয়। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের পৃথক ভাবে বসিয়ে রাখা হয়। রাজাকাররা কয়েকজন যুবককে গুলিকরে হত্যা করে। কাউকে কাউকে বেয়নেট দিয়ে আহত করে আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখে। দুপুরের পর একদল খানসেনারা আসবে বলে তাদের জানানো হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এরপর হায়েনাদের নির্মম এবং বর্বর অত্যাচার শুরু হয়। যুবতী মেয়েদের সারা রাত্র ব্যাপী পালাক্রমে ধর্ষন করতে থাকে। দিলীপ বেদনায় অস্থির হয়েও নিরুপায়। দুঃখে চোখের পানি ফেলা ছাড়া কিছু করার ছিলনা। চারপাশে বন্দুক

ধারীরা পাহারা দিচ্ছিল। মেয়েদের আত্মচিৎকারে সে নিজের কান চেপে ধরে। সকাল আটটায় একজন ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সকলকে ছেড়ে দেয়।

ভারতের মছলন্দপুর পৌঁছে দিলীপ আত্মীয় স্বজনকে আশ্রয় শিবিরে রেখে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশে তাদের ত্যাগ করে চলে যায়।

এমপি গফুর সাহেব তাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ব্যবস্থা করে দেন। এরপর নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মংলা, হরিনগর, আশাশুনি, পাইকগাছা, দাকোপ, চালনা, কপিলমুনি সহ বিভিন্ন যুদ্ধে দুঃসাহসিকতার সাথে অংশ নেন।



নরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল। গ্রাম- জগদীশপুর, পোঃ শতদশকাঠী, জেলা- ঝালকাঠী। জন্ম তারিখ -৭-৩-১৯৫৩। এইচ.এস.সি পাশ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষনের পর তাদের বিল এলাকা থেকে প্রায় ৩০০০ যুবক স্বাধীনতার শপথ নিয়ে ১৪ মার্চ বাশের লাঠি নিয়ে মিছিল করে শহরে এসে শহরের আন্দোলনকারীদের সাথে একাত্ম ঘোষনা করেন। ২৫ মার্চের পর সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তোফাজ্জল হোসেন, সেলিম আহম্মদ, নুরুল ইসলাম পণ্ডিত এর নেতৃত্বে ট্রেনিং শুরু করেন।

এই ট্রেনিং গ্রহণের সংবাদ পাকবাহিনীর নিকট পৌঁছানোর অপরাধ শতদশকাঠী পোষ্ট অফিসের রানার আলী হোসেনকে জগদীশপুর বিদ্যালয়ের মাঠে গলা কেটে হত্যা করা হয়। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা কুখ্যাত দালালকে অনুরূপ হত্যা করে। অতঃপর আমাদের নবগ্রাম ইউনিয়নের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আখতার উদ্দিন আহম্মেদ ও তাহার সহযোগীদের নির্দেশে বিল এলাকায় অবস্থিত মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি নির্মুল করার জন্য আমাদের অঞ্চলের ঘাটি ও পরে কাউখালী, তথা শেখের হাট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তায় তাঁর এলাকা শত্রুমুক্ত হয়।



মোঃ ইবাদুল ইসলাম, পিতা-মৃত বাছতুল্যা সরদার। গ্রাম-কুলিয়া, থানা-দেবহাটা, জেলা-সাতক্ষীরা। ১৯৪৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। অষ্টম শ্রেণী পাশ।

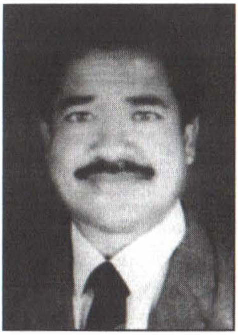
মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের তকীপুর ক্যাম্পে যোগদেন। ১৩ মে, নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী চলে যান। তিনমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন। দলনেতা ছিলেন সাবমেরীনার আহসানউল্লাহ। তিনি একটি গ্রুপের লীডার ছিলেন। এদিন মংলা বন্দরে তিনি সহ) ৪ জন কমাণ্ডো 'পদ্মা' নামের একটি পাকিস্তানী জাহাজ মাইন লাগান। সকল অভিযান শেষে ভারতে ফিরে যান।

অক্টোবর মাসে এবাদুল সহ ৪ জন কমাণ্ডো রাজশাহী জেলার বিড়ালদহ ব্রিজ অপারেশন করার জন্য যান। তাঁদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ক্যাপ্টেন গিয়াস ২০ জন গেরিলা যোদ্ধাকে সাথে দেন। এবাদুলের সাথে ছিলেন আজিজুল আলম, সামছুল হক এবং অপর একজন। নাটোরের বিড়ালদহ পৌছলে স্থানীয় জনগণ ব্রিজটি ধ্বংস না কবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্রিজটি ধ্বংস করা হলে পাকবাহিনী তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে। গেরিলা যোদ্ধারা ছিলেন অত্র এলাকার। তাঁরা গ্রামবাসীর অনুরোধ মেনে ভারতে ফিরে যান। কমাণ্ডোরা পলাশী ক্যাম্পে ফিরে আসেন।

নভেম্বর মাসে তিনি কমাণ্ডো রমেন্দ্র নাথের নেতৃত্বে ১০/১২ জন কমাণ্ডো সহ বাগেরহাট জেলার মোল্লার হাট থানা এবং রাজার ঘাঁটি দখলে অংশগ্রহণ করেন। কমাণ্ডো দলের সাথে ছিলেন ২০/২৫ জন ইপিআর সদস্য। কমাণ্ডার ছিলেন হাবিলদার আবুল হোসেন। চৌগাছা সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে বহু কষ্টে মোল্লাহাট পৌছে এখানকার থানা এবং রাজাকার ঘাটি দখলে আনেন। এরপর খুলনার উপকণ্ঠে ফকির হাট রাজাকার ঘাটি দখল করেন। ফকির হাট থানার ওসি পূর্বেই আত্মসমর্পণ করার জন্য তাঁদের নিকট পত্র পাঠান। ফকিরহাট মুক্ত করে তারা খুলনা উপস্থিত হন।

জীবন বাজি রেখে দেশ শত্রু মুক্ত করলেও এখন রাজাকার এখন ক্ষমতার আসনে। মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে অনৈক্য এবং প্রজ্ঞাহীনতা দেখে তাঁরা কখনই শাসন ক্ষমতার ধারে কাছে যেতে পারবেনা মনে করেন।

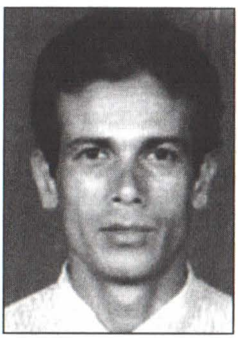
(সূত্র প্রদত্ত বর্ণনা তারিখ ৫-৭-২০০০)



বদিউল আলম শাহ, পিতা-বজলু আহমদ শাহ। গ্রাম-পূর্ব ফরতাদাবাদ, ডাকঘর-নাজির হাট, জেলা-চট্টগ্রাম। শিক্ষাগত যোগ্যতা-এস.এস.সি পাশ।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পর নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৫ আগষ্ট, অপারেশন জ্যাকপটের অধীন ৬০ জন নৌকমাণ্ডো দলের সাথে চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ নেন। তাঁর গ্রুপের কমাণ্ডার ছিলেন মাযহারউল্লা বীরউত্তম। স্বাধীনতার পর তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন। বর্তমানে বাবসা করছেন।

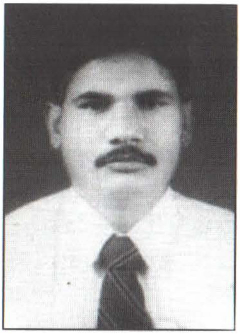
(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫)



মোঃ নূরুল ইসলাম, পিতা-মৃত আহাম্মদ আলী, গ্রাম- মহিচাইল, থানা-চান্দিনা, জেলা-কুমিল্লা। বর্তমান- বাংলাদেশ রেলওয়ে টি এক্স আর অফিস, চট্টগ্রাম।

দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন সময়েই '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগদেন। নৌ-কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৫ আগষ্ট শাহজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রমের নেতৃত্বে দাউদকান্দী ফেরী ডোবানোর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। দাউদকান্দী অভিযানে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য কমাণ্ডোরা হলেন মতিউর রহমান বীরউত্তম, হাসান নূর, শাহ আলম, শান্তি মিয়া সরকার, আব্দুল হামিদ ও আঃ রহমান। মতিউর রহমান বীর উত্তম উপদলনেতা হিসেবে দাউদকান্দী যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ১২-৩-২০০০)।



মোঃ জিন্নাতুল আলম, পিতা-আশরাফুল আলম। গ্রাম-লাংগলমুরা, পীরগঞ্জ, দিনাজপুর। বর্তমান (স্থায়ী)- গ্রাম-ভবানীপুর, ডাকঘর- বৈরচুনা, থানা-পীরগঞ্জ, জেলা- ঠাকুরগাঁও।

নৌকমাণ্ডো হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রাইফেলস এ ভর্তি হন। নায়েব সুবেদার ৪ রাইফেলস্ ব্যাটালিয়ন ফুলবাড়ী, দিনাজপুরে কর্মরত আছেন।

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ৩-২-১৯৯৮)



নিকুঞ্জ লাল বাড়ৈ, পিতা রজনী কান্ত বাড়ৈ। পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালি জাতির উত্থান এক গৌরবোজ্জ্বল অনন্য অধ্যায় রচনা করেছে। সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীতে অনেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও আত্মত্যাগের নজির কোন জাতি করতে পারেনি।

প্রবল পরিক্রমশালী ও শক্তিধর এবং অপরাজেয় হিসেবে খ্যাত পাকিস্তান নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে টিকে থাকার মত পর্যাপ্ত সামরিক সরঞ্জাম, যুদ্ধ জাহাজ এবং সেনাবল ছিলনা বলেই ভারতীয় সামরিক যুদ্ধ বিশারদগন নৌকমাণ্ডো বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর যুদ্ধ ইতিহাসে এমন পরিকল্পনা এবং দৃষ্টান্ত বিরল।

আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধ ব্যবস্থায় উভয় পক্ষ সর্বাত্মক দূরত্ব থেকে একে অন্যের উপর আক্রমণ রচনা করে থাকে। যুদ্ধের আধুনিক কলাকৌশল সেইদিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। সেখানে স্বাধীনতাযুদ্ধে নৌকমাণ্ডোরা সকল রকম নিরাপত্তা ছাড়াই বর্ষায় ভয়াল এবং উন্মত্ত কর্ণফুলী, যমুনা, পশুর, শিবসা, শীতলক্ষ্যা, পদ্মা এবং বঙ্গোপসাগরের বুকে শত্রুর অতি কাছাকাছি পৌঁছে শত্রু জাহাজ ধ্বংস করেছেন। এইসব অভিযানে শত্রু সৈন্য ছাড়াও নদীতে হিংস্র জানোয়ার দ্বারা আক্রমণ এবং প্রবল স্রোতে গভীর সমুদ্রে ভেসে যাওয়া কিংবা তলিয়ে যাওয়ার আশংকা কম ছিলনা। কিন্তু সব ভয় এবং বিপদকে উপেক্ষা করে বাংলার দামাল যুবকরা শত্রুর অহংকার গুড়িয়ে দিয়েছিলেন একের পর এক আঘাত হেনে।

তাঁদেরই একজন নিকুঞ্জ লাল বাড়ৈ। পিতা রজনী কান্ত বাড়ৈ। ১৯৫৪ সালের ২১ জানুয়ারি, ঝালকাঠি জেলার বেত্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে দূর্বার আন্দোলন সৃষ্টি করেছে সেসময়ে নিকুঞ্জ লাল শিক্ষকতা করতেন। ১ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের আহবান জানালে সকল স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। নিকুঞ্জ লাল এই সময়ে এলাকায় ঘুরে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করতে থাকেন।

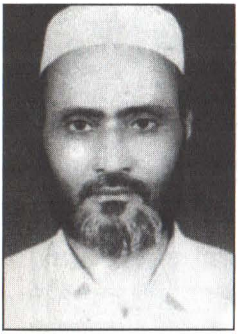
২৫ মার্চের পর এলাকায় থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে থাকেন। এবং বরিশালের সেলিম শাহজাহানের নেতৃত্বে একটি মুক্তিবাহিনীর দল গঠন করেন। এই দলে থাকা অবস্থায় পাকিস্তানীদের দালালী করার জন্য গয়ালকান্দা গ্রামের রাখাল জমাদ্দারকে গুলি করেন। উক্ত দালাল মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং পরে মারা যায়। নিকুঞ্জ লাল মুক্তিবাহিনীর সদস্য জানতে পেরে, থানা পিচ কমিটির চেয়ারম্যান, নবগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেন শরীফ তাঁকে ধরিয়ে দেন। শিক্ষক হিসেবে সে দিন তিনি পিচ কমিটির হাত থেকে মুক্তি পান।

এরপর আর এলাকায় থাকা নিরাপদ নয় ভেবে তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ভারতে পৌঁছে ঝালকাঠির সঞ্জীব কুমার বৈষের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনীতে অর্ন্তভূক্ত হয়ে প্রশিক্ষণের জন্য চাকুলিয়া চলে যান। প্রশিক্ষণ শেষে কল্যানীতে ফিরে আসলে সেই দিনই তিনি নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পলাশী চলে যান। এখানে একমাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তায় জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং তাঁর নেতৃত্বে ২৫/৩০ জন নৌকমাণ্ডোকে মংলা বন্দর অভিযানে পাঠান। এখানে পৌঁছে গাজী মোঃ রহমতউল্লাহর তত্ত্বাবধানে ৪ঠা ডিসেম্বর মংলা বন্দরে 'মাদার অব চায়না' নামের একটি খাদ্যবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেন। অতঃপর দেশ শত্রুমুক্ত হয়।

তাঁর এলাকায় ছোবহান জমাদ্দার ছিল একজন নরখাদক। সে একই দিনে শিমুলিয়া গ্রামের রাখাল চন্দ্র হালদার, কার্তিক চন্দ্র বেপারী, ব্রজবাশী বেপারী, ছোট্র বেপারী, খোকা চরন শীলকে হত্যা করে।

নিকুঞ্জ লাল বর্তমানে সাবাংগল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি অতীব ক্ষোভের সাথে প্রকাশ করেন, ১৯৭১ সালে যে ছিল কুখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা হত্যার অন্যতম সহযোগী সেই এখন ঝালকাঠী মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমাণ্ডার। তাই পরবর্তীর্তে মুক্তিযোদ্ধাদের কি পরিনতি ঘটবে তা নিয়ে তিনি শংকিত।

(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ৩০ আগষ্ট ১৯৯৯)



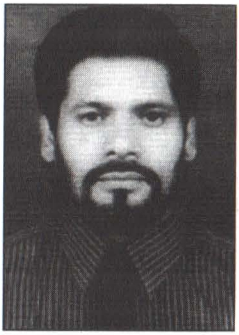
মোঃ খোরশেদ আলম, (১-৫-১৯৫২), পিতা- শহীদ কালা মিয়া, গ্রাম- রছুলপুর, পোষ্ট- পাটারী বাড়ি, থানা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর। বর্তমান ঠিকানা গ্রাম- সোনাপুর মরিছ বাজার, থানা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর।

১৯৭১ সালে থানা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দান সহ জনগনকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্ধুদ্ধ করতে থাকেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত গমন করেন। নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ শেষে তিনি কমান্ডো মতিউর রহমান বীর উওমের নেতৃত্বে বরিশাল- ঝালকাঠী অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। বাগদা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের পর যশোর জেলার কোন এক স্থানে রাজাকার বাহিনী তাদের দলকে ঘিরে ফেলে। ৮নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর নাজমুল এই দলকে গাইড করার জন্য ৫০ জন (মতান্তরে ৩০ জন) গেরিলা যোদ্ধাকে ভারী অস্ত্রসহ গাইড হিসেবে সাথে দিয়েছিলেন। এখানে রাজাকারদের সাথে একটানা ৮ ঘন্টা যুদ্ধ করার পর রাজাকাররা এবং পাকসেনা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরপর তারা পায়ে হেঁটে বরিশাল পৌছে অপারেশন করেন।

মোঃ খোরশেদ আলম মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পাকবাহিনী রাতের অন্ধকারে বাড়ি ঘেরাও করে তার বাবাকে ধরে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পের পাশে তার বাবাকে দিয়ে কবর খুঁড়িয়ে তাবে জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে।

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও রামগঞ্জ থানা শত্রুমুক্ত হতে আরও ১২ দিন সময় লাগেল এখানে পাকবাহিনীর একটি ইউনিট এবং স্থানীয় রাজাকাররা সুরক্ষিত অবস্থানে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। খোরশেদ আলম নৌ যুদ্ধ শেষে আরও ৩ সপ্তাহ যুদ্ধ করে দেশ মুক্ত করেন। তার পিতা শহীদ হলেও অদ্যাবধি স্বীকৃতি এবং কোন প্রকার সহযোগিতা কোন মহল থেকে পাননি।

(সূত্রঃ লিখিত বর্ণনা, তারিখঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



আলী আহমেদ, পিতা- ইসমাইল ফকির, মাতা- জমিরন বিবি, গ্রাম- সরমংগল, ডাক- খালিয়া, জেলা- মাদারীপুর। ১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। এস এস সি পাশ। কলেজে দুঞ্চবছর অধ্যয়ন করেছেন।

তার জীবনের মধুর স্মৃতি হলো ১৯৬৯ সালে আলী আহমদ ঢাকাতে ছিলেন। উচ্চ কণ্ঠ। তখন বয়স খুবই কম। এই যুবক আলী আহম্মদ মিছিলের সম্মুখে থেকে শ্লোগান উঠালে পিছনের হাজার কখনও লাখো জনতা তার জবাব দিতেন। এসময় প্রতিদিনই আলী আহমদকে ঢাকার রাজপথে মিছিলের অগ্রভাগে দেখা যেত। যদিও তখন তাঁর নাম পরিচয় নেতাদের জন্য ছিলনা।

মিছিলে অংশ গ্রহণ কারী আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের নেতারাও ঐ সময় এই দুঃসাহসী যুবকের পিছনে মিছিল করেছেন। সে সব এখন তাঁর কাছে স্মৃতি মাত্র। '৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। বংগবন্ধুর ভাষন শোনার পর তিনি মনে মনে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ১৫ মার্চ তাঁর বড়ভাই তিনি একজন মৌলানা। ঢাকার সার্বিক অবস্থা দেখে আলীকে নিয়ে নিজ গ্রামে চলে যান। ২৫ মার্চ ঢাকাতে গনহত্যার খবর শুনে আলি টেকের হাটে শহীদ সরদার শাহজাহান এর নেতৃত্বে গঠিত গনবাহিনীতে যোগদেন। এই দলের নেতৃত্বে আরও ছিলেন হারুন-উর-রশীদ মোল্লা, মোতালেব মিয়া প্রমুখ। এসব ছিল স্বল্প সময়ের কর্মতৎপরতা।

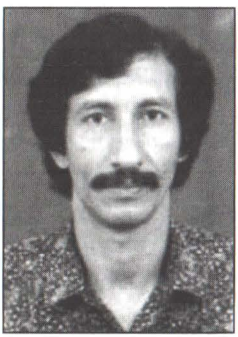
এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে কর্ণেল শওকত আলী এমপি মাদারীপুর এলাকায় সকল ছাত্র, যুবক, পুলিশ, আনসারদের সমবেত হওয়ার আহবান জানান। ষ্টুয়ার্ড মুজিব সংগঠিত করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১০ এপ্রিল তিনি ১৬০ জন যুবককে নিয়ে লঞ্চযোগে যাত্রা শুরু করেন। ১৭ এপ্রিল তারা ভারতের কাঠালিয়া পৌছেন। এখানে ১৮ দিন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর অম্পিনগর চলে যান। সেখান থেকে পলাশী।

পলাশীতে তিনমান প্রশিক্ষণ শেষ করে চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দর অভিযানে অংশ নেন। এরপর ভারতে ফিরে পুনরায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন কুলিয়ারচর থানায় ছয়শত ব্রিজ ধ্বংস করার জন্য তাঁদের ৪জনের একটি দলকে পাঠানো হয়। তারা ছয়শতি ব্রিজ উড়িয়ে দেন এবং পাশে কুলিয়ারচর থানা দখল করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালের ১৭ মে সুবোধ চন্দ্র সরকার এর কন্যা সন্ধ্যারানী সরকারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সন্ধ্যারানী বিয়ের সময়

মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে মঞ্জুয়ারা বেগম নাম ধারন করেন। কর্মজীবনে তিনি রেডক্রসের অধীন ৩ বৎসর কাজ করেন। পরে গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা নামের একটি স্থানীয় এনজিওতে কাজ করেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ সেবা মূলক সংগঠনের সাথে জড়িত। এলাকাতে আলী ভাই নামে পরিচিত এবং সকল স্তরের মানুষের নিকট সমাদৃত।

(তথ্যঃ লিখিত বর্ণনা এবং অডিও রেকর্ডিং থেকে, তারিখঃ ২৬ আগষ্ট ১৯৯৯)

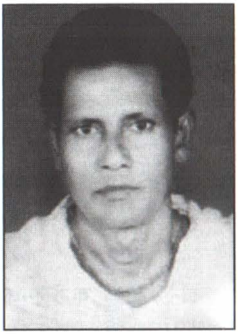


সৈয়দ মাহবুবুল আলম, পিতা- সৈয়দ সামছুল হক। গ্রাম- পাচিজোড়, ডাক-করের হাট, থানা- মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম। শিক্ষাগত যোগ্যতা- উচ্চ মাধ্যমিক পাশ।

১৯৭১ সালে নিজ এলাকায় এমপি বর্তমান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের সাথে যুদ্ধে যোগদান করেন। নৌকমান্ডো প্রশিক্ষণ শেষে নভেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলার চর আলেকজান্দ্রিয়াতে অপারেশনে যান। তার সাথে ছিলেন আবু তাহের খন্দকার ও রাজামিয়া। আগরতলা থেকে রুহুল আমিন ভুঁইয়া তাদের ৩ জনকে গাইড করে নিয়ে আসেন। চর আলেকজান্দ্রিয়ায় কোন জাহাজ না থাকায় অপারেশন হয়নি। এখান থেকে তারা সন্দ্বীপ চলে যান। সন্দ্বীপের শাহবাজপুরের চেয়ারম্যান বাড়িতে থাকতে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন বিদেশ ছিলেন। বর্তমানে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন।

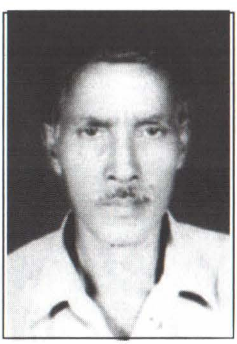
(সূত্রঃ লিখিত বর্ননা, তারিখঃ ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)



শ্রী অনিল কুমার মণ্ডল, পিতা- মৃত রামচন্দ্র মণ্ডল, গ্রাম- কুলিয়া, থানা-দেবহাটা, জেলা-সাতক্ষীরা, বর্তমানে গ্রাম- মাটিয়া কমলাপুর কলোনী, ডাকঘর-মাটিয়া, থানা-ধান্যকুড়িয়া, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা,পশ্চিমবংগ, ভারত।

নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর ১৫ আগষ্ট মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। অভিযান শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বাধীনতার পর আর বাংলাদেশে ফিরে আসেননি। বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক।

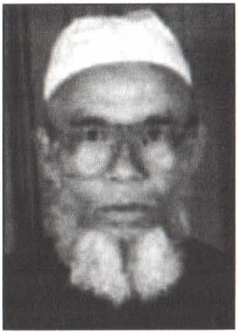
(তথ্যঃ লিখিত বর্ণনা ১৯৯২)



মোঃ আব্দুল জলিল, পিতা- শেখ রজব আলী, গ্রাম- ভাড়ারিয়া, থানা-সিরাজদিখাঁন, জেলা- মুন্সীগঞ্জ। ১৯৫২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ৯ম শ্রেনী।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৫ আগষ্ট, সাবমেরীনার আবদুর রহমানের নেতৃত্বে নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর অপারেশনে অংশ নেন

(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা (অসম্পূর্ণ), তারিখঃ ২৮ আগস্ট ১৯৯৯)



এম. হানিফ সিপিও (অব:), পিতা-শুকুর মাহমুদ মুন্সী, গ্রাম- পাছড়া, ডাক-মান্দারপাড়া, থানা-মুকসুদপুর, জেলা- গোপালগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা- বাড়ী নং-এফ/১ হাউজিং এস্টেট, খালিশপুর, খুলনা-৯০০০। জন্ম তারিখ- ১ জুলাই ১৯৩৮, এইচএসসি পাশ। তিনি ১৯৫৫ সালের ২৭ এপ্রিল বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ভর্তি হন। পিএনএস বাহাদুর (করাচী পাক) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তিনি ছুটি কাটানোর জন্য নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের আহবান জানালে তিনি এলাকার ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত হন। ২৫ এপ্রিল ১৯৭১, ঐদিন হানাদার বাহিনী গোপালগঞ্জ টাউন জ্বালিয়ে দেয় আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাই। ৪-৫-১৯৭১ পুণরায় ফরিদপুর নগরকান্দা থানার হাঃ মেজর আব্দুল আজিজ এর পার্টিতে যোগদান করেন। কিছুদিন পরে ফরিদপুর সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টার কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন বাবুল বিএলএফ (নূর মোহাম্মদ) সাহেব তার টুআইসি হিসেবে তার পার্টিতে নিয়ে যান। ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত ঐ পার্টিতে থেকে ফরিদপুরের নগরকান্দা, দিগনগর, ভাঙ্গা জলিল পাড়, মকসুদপুর, ভাটিয়া পাড়া, ওড়াকান্দি (হেডকোয়ার্টার), ফুকরা, ডামুডিয়া, কোটালী পাড়া, চাঁদের হাট, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও গোয়ালন্দে লড়াই করেন। পরিশেষে ফরিদপুর মিলিশিয়া ক্যাম্প হতে বঙ্গবন্ধুর আদেশ এবং ক্যাপ্টেন বাবুলের নির্দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ তারিখে পুণরায় (এনটিসি) নৌবাহিনীতে যোগদান করেন।

দিগনগর যুদ্ধে পাকবাহিনীর সমস্ত বহর সমূলে বিনষ্ট করে একটি জীপ এবং একটি লরী গোলাবারুদ সহ দখল করেন। জীপে ১ জন ক্যাপ্টেন, ১ জন সুবেদার ও ২ জন গার্ডকে হত্যা করেন। জীপটি শেখ নাসির সাহেবকে উপহার দেয়া হয়।

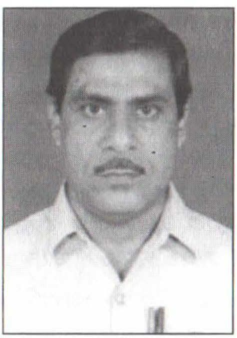
(সূত্রঃ প্রদত্ত বর্ণনা, তারিখঃ ১৫-৬-২০০০)



মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা- মরহুম শামছুদ্দিন বিশ্বাস, গ্রাম- মাছরাঙা, ডাক- পাশাপেলে, থানা- চৌগাছা, জেলা- যশোর। বর্তমান ঠিকানা- জননী কুঞ্জ, পালবাড়ী মোড়, ডাক ও থানা- যশোর, জেলা যশোর। জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে।

১২ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ ৩০ দিনের ছুটি নিয়ে পাকিস্তান থেকে নিজ গ্রামে চলে আসেন। ২৫ মার্চের পর ভারতের বনগাঁ টালিখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়ে পলাশী ক্যাম্পে যোগ দেন। কিন্তু একমাস পর স্থলবাহিনীর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাকে বীর ভূম মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে পাঠানো হয়। অত:পর ৮নং সেক্টরের অধীনে বয়রা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ফিরে এলে মেজর আব্দুল মঞ্জুর ১০ জন মুক্তিযোদ্ধাসহ তাঁকে বাংলাদেশের অভন্তরে ঝিকরগাছা এলাকায় পাঠান। এখানে তিনি ছোট ছোট যুদ্ধে লিপ্ত হন। স্বাধীনতার পর পুনরায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদেন। ২৩ বছর চাকরি জীবন শেষ করে ১২ মার্চ ১৯৯৩ পেটি অফিসার (মিউজ) হিসেবে অবসর গ্রহণ করে।

(সূত্রঃ তথ্য প্রদান, তারিখ: ২৯ অক্টবর ২০০০)



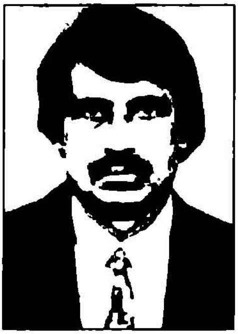
মোঃ সামছুল হক চাকলাদার, পিতা- মোঃ মোজ্জাম্মেল হক চাকলাদার। আদি নিবাস যশোরের মাদঘোপা গ্রাম যেখানে বর্তমানে বিমান বন্দর এবং সেনানিবাসের সিএমএইচ নির্মিত। বর্তমানে যশোর শহরে পুরাতন কসবায় বসবাস করেন। ৬ ভাই এবং ২ বোনের মাঝে সামছুল হক পঞ্চম। স্কুল জীবনে অত্যন্ত চঞ্চল এবং দুর্দান্ত হওয়াতে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়েন। ফলে ১৯৬৮ সালে ভগ্নিপতি আব্দুল খালেক নিজের কাছে নিয়ে রাজগঞ্জ হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন। ভগ্নিপতি ছিলেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কড়া শাসনের ভিতর ১৯৭০ সালে এস এস সি পাশ করেন। সে সময়ে দেশব্যাপী ছাত্র ও গণআন্দোলন চলছিল। তিনি ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

২৫ মার্চ রাত থেকে যশোর শহরে থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে। ২৯ তারিখ পর্যন্ত ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর সদস্যরা যশোর সেনানিবাস ঘেরাও করে রাখেন। ২৯ তারিখ রাতে উভয় পক্ষের মাঝে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। এই সময় লোকজন শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নিতে শুরু করে। সামছুল হকের পরিবারও ৩০ তারিখ সকালে যশোর ত্যাগ করে ৮ মাইল দূরে ফতেপুর গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে তিনি অন্যান্য যুবকের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ভারত গমন করেন এবং বনগাঁস্থ টালিখোলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। এরপর ৩মাস নৌকমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ৬ আগষ্ট মংলা বন্দর অপারেশনের জন্য মনোনীত হয়ে অপর ৬০ জন কমাণ্ডোর সাথে যাত্রা করেন।

১৫ আগষ্ট অপ্যারেশন শেষে ভারত ফিরে আসেন। নভেম্বর মাসে ১০ জন কমাণ্ডো দলকে মেজর জিয়াউদ্দিনের অধীনে পাঠানো হয়। মেজর জিয়াউদ্দিন তাঁদের বগী ক্যাম্পে নিয়ে রাখেন কোন অপারেশন করাননি। তাঁদেরকে বোঝানো হয় স্বাধীনতার পর ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্ম সমর্পন করলে ২১ ডিসেম্বর তিনি বাড়িতে চলে আসেন। স্বাধীনতার পর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগী। ১৯৭৬ সালে ব্যাংকে চাকরি গ্রহণ করেন। এবং ব্যাংকের এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালে ব্যাংক ধর্মঘট করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ছাত্তার ১১ হাজার কর্মচারী ছাটাই করেন। সামছুল হকও এ সময় চাকরি হারান। পরে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে বেসামরিক কর্মচারি হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে একই চাকরিতে রত আছেন। স্ত্রী পারভীন একজন গৃহিনী। ৩ পুত্রের জনক। বড় ছেলে আরিফুল হক ঝিণাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করেন ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করে। দ্বিতীয় পুত্র শাওন একজন সঙ্গীত প্রেমী এবং ভাল তবলা বাদক। মোঃ সামছুল হক খুলনা এবং ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

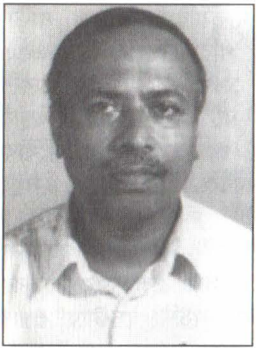
(সূত্রঃ তথ্য প্রদান, তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০০০)



আজাহার হোসেন, গ্রাম- মাতুয়াইল, দক্ষিণ পাড়া, ডেমরা, ঢাকা। এক সমভ্রান্ত পরিবারে ১৫/১২/১৯৫৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সনে সরকারী কবি নজরুল ইসলাম কলেজে ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় কলেজ ছাত্র সংসদে ছাত্রলীগ প্যানেলে বিপুল সংখ্যক ভোটে ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সহ-সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৭-০৫-৭১ ইং তারিখে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে আগরতলা চলে যান এবং কংগ্রেস ভবন হতে তাকে রিক্রুট করে মতিনগর ট্রেনিং সেন্টারে প্রেরণ করা হয়। সেখানে অবস্থানকালে গ্রেনেড, রাইফেল, স্টেনগান ও হাই এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং ক্যাপ্টেন হায়দার এর নেতৃত্বে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং গ্রামের রেল ব্রিজ উড়ায়ে দিতে সক্ষম হন, এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন হায়দার হাতে গুলিবিদ্ধ হন। এর পরপরই মতিনগর ট্রেনিং ক্যাম্প মেলাঘরে স্থানান্তর করা হয়। এর ৩/৪ দিন পর তাকে নৌ-কমাণ্ডো হিসাবে রিক্রুট করে ট্রেনিং গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীতে পাঠানো হয়। এখানে ভাগিরথী নদীর পাড়ে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর তত্ত্বাবধানে নৌ-কমাণ্ডো হিসাবে বিভিন্ন প্রকার ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং ১৫ আগস্ট নারায়ণগঞ্জ পোর্টে আবেদুর রহমান এর নেতৃত্বে গানবোট ও শিপ ডুবিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পরবর্তি সময়ে ১০ সদস্য বিশিষ্ট নৌ-কমাণ্ডো নিয়ে ভারতের নৌ-বাহিনীর ক্যাপ্টেন সমীর কুমার দাস ও মিঃ মার্টিস এর নেতৃত্বাধীনে হার্ডিঞ্জ সেতুর একটি গার্ডার ভাংগার জন্য ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং হার্ডিঞ্জ সেতুর গার্ডার ভাঙ্গার জন্য প্রয়োজনীয় হেরিং চার্জ, মাইন, এক্সপ্লোসিভ, করটেক্স, সেফটি ফিউজ ও আত্মরক্ষার জন্য স্টেসগান, এস.এল.আর. রাইফেল ইত্যাদি নৌকাযোগে ভারতীয় স্পীডবোটের মাধ্যমে পদ্মায় পৌছে দেয়া হয়। এরপর নৌকা দাড় বেয়ে ব্রিজের ১ মাইল দূরে থাকতেই তারা লক্ষ্য করেন যে, ব্রিজের প্রতিটি গার্ডারে চার্জ লাইট ও ছোট ছোট লাইট লাগানো ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। ব্রীজের নীচে গানবোট ভেবে নিজেদের মধ্যে ভয়ভীতির কারণে এবং সেই সময় ব্রিজের নীচে স্রোতের প্রবল বেগের কারণে নৌকা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে ব্রিজের গার্ডারও ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। পরে দলের নৌ-কমাণ্ডো সকলে পাবনার দাদপুর গ্রামের চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং নৌকা ও সমস্ত অস্ত্রসস্ত্র চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীতে রেখে ৪টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পুনরায় ক্যাম্পে ফিরে আসেন। এরমধ্যে ৪ জনের গ্রুপের ২জনকে রাজশাহী আলমবাড়ী থানার পাশে রাজাকার ও পাকিস্থানী আর্মিরা ধরে ফেলে।

স্বাধীনতার পরবর্তি ১৮-০৮-১৯৭২ ইং তারিখে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল দপ্তরে চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭২ সালে আই,এ ও ১৯৮৯ সালে বি,এ পাশ করেন। তিনি বর্তমানে একাউন্টস অফিসার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন। তিনি ৩ ছেলে ও ১ মেয়ের জনক।

(সূত্র লিখিত বর্ণনা। তারিখ ১০-১২-২০০০)



জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস, পিতাঃ শ্রী নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, গ্রাম-চর বালিয়ানী, পো- দক্ষিণ বালিয়ানী, ইউনিয়ন-মাটিভাঙা, থানা- নাজিরপুর, জেলা- পিরোজপুর, রাশিঃ কর্কট, জন্ম তারিখ- ৩১-১২-১৯৫৫।

শিক্ষা এস.এস.সি /১৯৭১ (১৯৭২)- চরবানিয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়, থানাঃচিতলমারী, জেলাঃ বাগেরহাট। এইচ.এস.সি/১৯৭৮(১৯৭৫)- বাগেরহাট সরকারী পি.সি কলেজ। সণাতক/১৯৮১ মাটিভাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ, নাজিরপুর, পিরোজপুর। সণাতকোত্তর ডিপ্লোমা/১৯৮৩- গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এম.এস.সি/১৯৮৫- বাংলাদেশ কলেজ, ঢাকা। বি.সি.এস/১৯৮৪ (যোগদান-১৯৮৬)- সরকারী কমিশনার।

বিবাহ ১৮/১১/১৯৯১, স্ত্রী-শ্রীমতি শক্তিময়ী বিশ্বাস, এস.এস.সি (সমাজ বিজ্ঞান, ঢাঃ বিঃ)।

শ্বশুর শিবনাথ

সন্তান পরীক্ষিত বিশ্বাস-৪র্থ শ্রেণী, বনলতা বিশ্বাস((বৃষ্টি)- ১ম শ্রেণী, পার্থ বিশ্বাস- ২ বছর বয়স।

কর্মকাল সহঃশিক্ষক, বানিয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৭৫-১৯৭৯। সহকারী কমিশনার-নাটর কালেক্টর ১৯৮৬-৮৮, সহকারী কমিশনার (ভুমি) নাটর, ১৯৮৮-১৯৯০, সম্পাদক জেলা রেড ক্রিসেন্ট নাটর ১৯৮৭-১৯৮৯, সহকারী কমিশনার (ভূমি) উলিপুর, কুড়িগ্রাম ১৯৯০-১৯৯১, সহকারী কমিশনার (ভূমি) চিলমারী, কুড়িগ্রাম। একই সময় অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে। জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার, খুলনা কালেক্টরেট-১৯৯২, সহকারী পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা কালেক্টর ১৯৯৩-১৯৯৪ জুন, সহকারী পরিচালক, স্থানীয় সরকার, লক্ষীপুর, থানা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর, বগুড়া, থানা নির্বাহী অফিসার, গাইবান্ধা ১৯৯৮ এর জুন পর্যন্ত, উপ-পরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা, ১৯৯৯-২০০০। ৭ভাই-বোন, ৫ভাই, ২ বোন, সবার চেয়ে বড়।

(সূত্র লিখিত বর্ণনা। তারিখ ২৫-১২-২০০০)



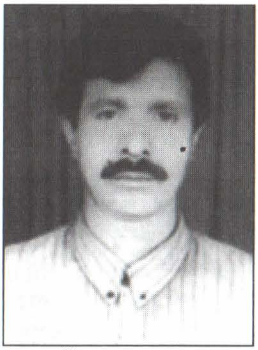
ডা: শাহ আলম বীর উত্তম, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার করমোল্লাপুর গ্রামে ১৯৪৯ সালের ১৩ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলী আহম্মদ চৌধুরী ও মাতা জমিলা খাতুনের সাত সন্তানের মাঝে ডা: শাহ আলম ছিলেন জ্যেষ্ঠ। ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামের কাপ্তাইস্থ চন্দ্রঘোনা হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৬৯ সালে রাঙ্গুনিয়া কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাস করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। আয়ুবের স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামকালে তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় যোদ্ধা। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র থাকাকালে ডা: শাহ আলম স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজকে নিয়োজিত করেন। ছাত্রাবস্থাই ডা: শাহ আলম সমাজতান্ত্রিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ গড়ার কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান যখন তার কাছে আসে তখন তিনি সবে মাত্র মেডিকেলের ২য় বর্ষের ছাত্র। লেখা-পড়ার পাঠ অসমাপ্ত রেখেই গণ মানুষের সাথে হাত মিলিয়ে যোগদান করেন মুক্তিযুদ্ধে।

নৌ-কামাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ নেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সফলতার পরে আবার তিনি ছাত্র জীবনে ফিরে আসেন। ১৯৭৫ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এমবিবিএস পাস করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ডা: শাহ আলম চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি ছাত্রাবস্থায়ই রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের (জাসদ সমর্থিত) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি চট্টগ্রাম জেলা ছাত্রলীগের একজন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা হিসাবে এবং ১৯৮০ সাল থেকে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদের চট্টগ্রাম জেলা শাখার সদস্য ছিলেন। ডা: শাহ আলম রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়াও একাধিক সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮১ সালে বি.এম.এ চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৭৯ সালের ৩১ সেপ্টেম্বর তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী মিসেস নাছিরা আলম। তিনি একমাত্র কন্যা শম্পাকে রেখে দূরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যু বরণ করেন। ১৯৮৫ সালের ২৬শে মার্চ তিনি মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব সূচক পদক হাতে পান। চিকিৎসার জন্য তিনি সরকারী খরচে লন্ডন যান। এর আগে দেশের অভ্যন্তরেই তিনবার অপারেশন করা হয়। ফিরে তিনি অধিক দুর্বল হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত মরণব্যাধির হাত থেকে তিনি রক্ষা পাননি। অকালেই ঝরে গেল সম্ভাবনাময় একটি জীবন। বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ আলম বীর উত্তম সকলকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি গরীবউল্লাহ শাহ (রা:) মাজারে তাকে সমাধিস্থ করার অন্তিম ইচ্ছা জানিয়ে যান। কন্যা শম্পার আঠারো বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পরিবার মেডিকেল কলেজের বাসায় অবস্থান করতে পারবেন। শাহ আলমের চিকিৎসার ব্যয় বহন করে স্ত্রী মিসেস নাছিরা আলম কন্যা শম্পাকে নিয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছেন।

নিপুণ ১২ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-১৯৮৫।



মোঃ নূরুল ইসলাম, পিতা- মৃত গহর আলী মোল্লা, গ্রাম- নকিপুর, থানা- শ্যামনগর, জেলা- সাতক্ষীরা। জন্ম- ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ সাল। শিক্ষাগত যোগ্যতা- এস.এস.সি পাশ। বর্তমান ঠিকানা- নিরাপত্তা বিভাগ রি শিল্পী অফিস, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা, কর্মরত।

'৭১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের তকীপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করেন। ১২ মে নৌ-কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী নৌ-কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান দেন। এখানে তিনমাস কঠিন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ১২জন কমাণ্ডো দলের সাথে একোণী অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে প্রবল স্রোতের মুখে অপারেশন ব্যর্থ হলে পুনরায় ভারত ফিরে আসেন।

তাঁর অংশগ্রহণে দ্বিতীয় অভিযান ছিল চুনকুড়ি নদীতে পাকিস্তানী গানবোটের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধ। কমাণ্ডার ছিলেন স্থল বাহিনীর কমাণ্ডার আফজাল এবং আনোয়ার। দু'টি গানবোট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরপর তিনি সুন্দর বনের অভ্যন্তরে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর চিকিৎসা ও উদ্ধারকারী জাহাজ 'নালশিরা' অপারেশনে অংশ নেন। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন।

স্বাধীনতার পর তিনি সাতক্ষীরা টেক্সটাইল মিলে নিরাপত্তা হাবিলদার হিসেবে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু অজানা কারণে তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। এরপর জীবন ধারণের জন্য সাতক্ষীরাতে হেলিকপ্টার (স্থানীয় নাম) চালাতে শুরু করেন। যার সচিত্র প্রতিবেদন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু দেশের কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা সংগঠন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। বর্তমানে তিনি একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের সহস্র মুক্তিযোদ্ধার ন্যায় হত দরিদ্র নৌ-কমাণ্ডো নূরুল ইসলামকে গ্রাস করে রেখেছে। অর্থাভাবে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান এই সান্ত্বনা নিয়ে তিনি আজও বেঁচে আছেন।

পরিশিষ্ট ''খ''

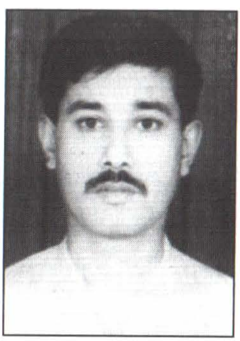
নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নাবিক ও কমাণ্ডোবৃন্দ, যাঁদের জীবনী লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। নিচে তাঁদের ছবিসহ ঠিকানা প্রদত্ত হল।



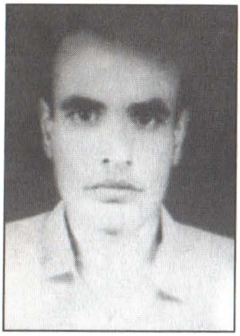
১. আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী, বীর উত্তম**,** সাব লেঃ. পিএ-নং **৬৭৯৮১**
সাবমেরীনার আব্দুল ডব্লিউ চৌধুরী বীর বিক্রম
১ নং সেক্টর। (নাম্বার উল্লেখ নাই)
উভয় ঠিকনা
গ্রামঃ উত্তর শ্রীপুর, ডাকঘরঃ মুন্সীরহাট
থানাঃ ফেনী, জেলাঃ ফেনী
১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশনেন।



২. মোঃ আব্দুল রহমান বীর বিক্রম,
স্টুয়াড-**১**, **নম্বর-৬৬০৪৪৯**
গ্রামঃ ছালিমাবাদ
ডাকঘরঃ ছালিমাবাদ
থানাঃ নাগরপুর
জেলাঃ টাঙ্গাইল
১৫ আগস্ট নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর এবং অক্টবর মাসে ঢাকার পাশ্ববর্তী নদীতে বিভিন্ন অভিযানে অংশনেন।



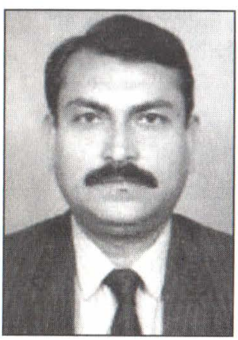
৩. মেজর কাজী এমদাদুল হক
পিতাঃ কাজী আহমেদ হোসেন
গ্রামঃ চৌগাছী
পোষ্টঃ কুটি চৌগাছী
থানাঃ শ্রীপুর
জেলাঃ মাগুরা
১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম এবং অক্টোবর মাসে নারায়নগঞ্জ নদী বন্দরে বিভিন্ন অভিযানে অংশনেন।



৪. মনছুর আহমদ মাঝি
পিতাঃ পবন আলী মাঝি
গ্রামঃ ভাইজোড়া
পোষ্টঃ সোমাদ্দার খালী
থানাঃ মোরলগঞ্জ
জেলাঃ বাগেরহাট
মংলা বন্দরে এবং খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।



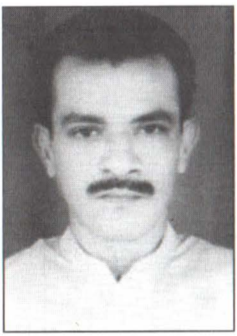
৫. রুহুল আমিন
পিতাঃ জামাত আলী মন্ডল
গ্রামঃ চৌগাছা
পোষ্টঃ চৌগাছা
থানাঃ ঝিনাইদহ
জেলাঃ ঝিনাইদহ
মংলা বন্দর এবং খুলনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অভিযানে অংশনেন। তিনি আহত হন।



৬. এম এনামুল হক
পিতাঃ বজলুল হক
গ্রামঃ জয়নগর
পোষ্টঃ পিরীজকান্দী
থানাঃ রায়পুরা
জেলাঃ নরসিংদী
ভৈরব যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে গোয়ালন্দ বন্দর অভিযানে অংশ নেন। বর্তমানে ইতালীতে অবস্থান করছেন।



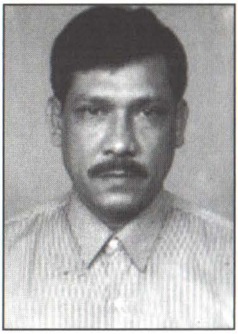
৭. মোঃ সালাহ উদ্দিন আহমেদ, বীর উত্তম
পিতা- সৈয়দ উদ্দিন আহমেদ
গ্রাম- দাশাদী
ডাক- সফরমালি
জেলা- চাঁদপুর
চাঁদপুর নদী বন্দরে বিভিন্ন অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ১৯৯৫ সালে লিভার সিরোসিসে মৃত্যুবরণ করেন।



৮. খায়রুল আলম চৌধুরী
পিতা- মুজিবুল হক
গ্রাম- দূর্গাহাট
ডাক- ভুমাইনচান্দা
মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম এবং সন্দীপে নৌযুদ্ধে অংশনেন।



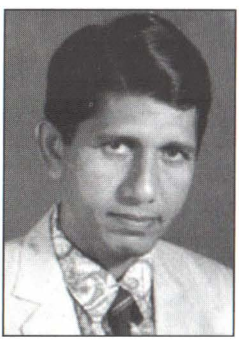
৯. ডাঃ শাহ আলম, বীর উত্তম
পিতাঃ এম আলী আহমদ চৌধুরী
গ্রামঃ করমুল্লাপুর
ডাকঃ জিরতালী বাজার
থানাঃ বেগমগঞ্জ
জেলাঃ নোয়াখালী
১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। '৮০ দশকে ক্যান্সারে শাহাদত বরণ করেন।



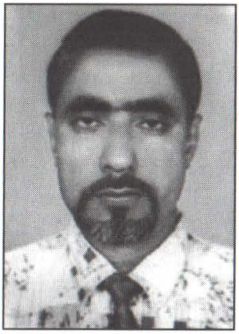
১০. রেজাউল করিম চৌধুরী
পিতা- মজিবুল হক চৌধুরী
গ্রাম- বামন সুন্দর
থানা- মিরশরাই
জেলা- চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম এবং সন্দীপ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।



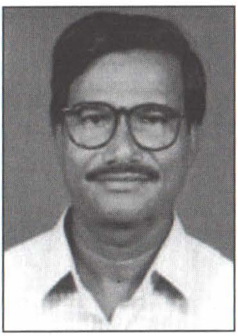
১১. আবুল বাশার
পিতা- মোখলেসুর রহমান
গ্রাম- পরাগলপুর
থানা- মিরশরাই, চট্টগ্রাম
১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।



১২. মোঃ শমসের আলী
পিতাঃ খোশলাল সরদার
গ্রামঃ মিরগীডাংগা
পোষ্টঃ ঘোনা
থানাঃ সাতক্ষীরা
জেলাঃ সাতক্ষীরা
১৫ আগস্ট হিরনপয়েন্ট অভিযানে অংশ নেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে হরিনগর গানবোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহত হন।



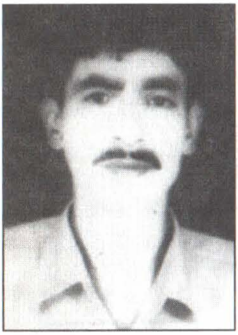
১৩. আবু বক্কর
পিতা- আব্দুস সাত্তার
গ্রাম- নয়াগ্রাম
ডাক- বিয়ানীবাজার
জেলা- সিলেট।



১৪. দুলাল কৃষ্ণ দাস
পিতাঃ রাধাকান্ত দাস
গ্রাম- পিরোজপুর টাউন
জেলা- পিরোজপুর
বর্তমান-১ ধর্মসভা ক্রস রোড, খুলনা।



১৫. মোঃ জয়নাল আবেদীন
পিতাঃ নাদেরুজ্জামান
গ্রামঃ পরাগলপুর
পোষ্টঃ মহাজনহাট
থানাঃ মিরশরাই
জেলাঃ চট্টগ্রাম
১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ নেন।



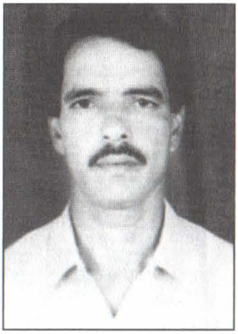
১৬. গফুর খাঁন
পিতাঃ মৃত সাত্তার খান
গ্রামঃ চর মুগুরিয়া
ডাকঃ চর মুগুরিয়া
থানাঃ মাদারীপুর
জেলাঃ মাদারীপুর
১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।



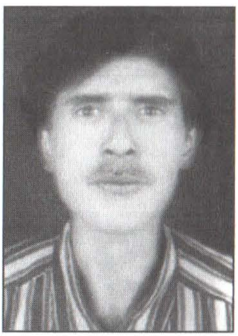
১৭. আবিউর রহমান
পিতাঃ মজিবুর রহমান
গ্রামঃ শিরগ্রাম
পোষ্টঃ শরগ্রাম
থানাঃ বোয়ালমারী
জেলাঃ ফরিদপুর
বর্তমান- মেশিন হাউজ, কর্নফুলি কাগজ কল, চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।
মংলা বন্দর অভিযানে অংশনেন।



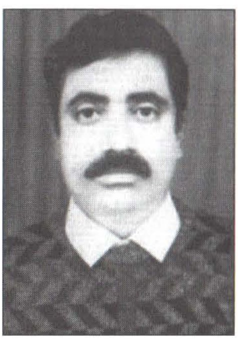
১৮. বিল্লাল হোসেন মৃধা
পিতা- আলহাজ্ব গোলাম হোসেন
গ্রাম- আলীমাবাদ
থানা- মূলাদী
জেলা- বরিশাল
মংলা বন্দর এবং বরিশাল অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।



১৯. মোঃ আবুল হাশেম
পিতাঃ আব্দুল জব্বার
গ্রামঃ ঢালাই,
ডাকঃ কাটিরহাট
ফটিকছড়ি, হাটহাজারী চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বহ্হিনোংড় অভিযান কালে পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হন। নির্মম অত্যাচারে বাধির এবং ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।



২০. আব্দুল খালেক
পিতাঃ হোসেন আলী সরদার
গ্রামঃ মিরশাপুর
পোষ্টঃ কসবা
থানাঃ কসবা
জেলাঃ ব্রাহ্মানবাড়ীয়া।



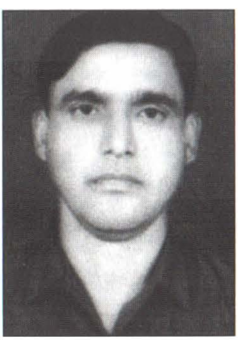
২১. এস এম মুজিবুর রহমান
পিতাঃ মরহুম হাজী কোরবান আলী সরদার
গ্রামঃ ঘুমনতলী
ডাকঘরঃ নকীপুর
থানাঃ শ্যামনগর
জেলাঃ সাতক্ষীরা
হিরণ পয়েন্ট এবং খুলনার বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।



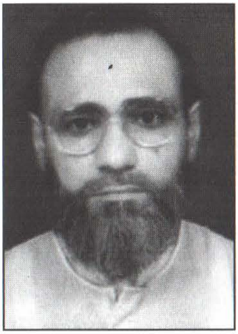
২২. শেখ শাহাদৎ হোসেন
পিতাঃ শেখ কেরামত আলী
গ্রামঃ চৌগাছা
পোষ্টঃ পাটকেলঘাটা
থানাঃ তালা
জেলাঃ সাতক্ষীরা।



২৩. মোঃ শাহ্ আলম
পিতাঃ মৃত মোবারক আলী হাওলাদার
গ্রামঃ তুলিগাতী
পোষ্টঃ তুলিগাতী
থানাঃ মোরলগঞ্জ
জেলাঃ বাগেরহাট
বর্তমান- টি,ট,বাংলাদেশ রেলওয়ে ইশ্বরদী; পাবনা।
মংলা বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।



২৪. এস এম মোস্তাফিজুর রহমান
পিতাঃ গাজী মোঃ মোস্তফা মূসা
গ্রামঃ পাতাখালী
পোষ্টঃ পাতাখালী
থানাঃ শ্যামনগর
জেলাঃ সাতক্ষীরা
মংলা বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।



২৫. আবু নেছার ছিদ্দিক
পিতাঃ মৃত হারুনূর রশীদ সরদার
গ্রামঃ পাতাখালী
ডাকঃ পাতাখালী
থানাঃ শ্যামনগর
জেলাঃ সাতক্ষীরা
সিলেট অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।



২৬. মোঃ আবুল ফয়েজ
পিতা- মোঃ আব্দুল মজিদ
গ্রাম- সাতমোড়া
থানা- নবীনগর
জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সিলেট অপারেশনে অংশ গ্রহণ করেন।



২৭. আব্দুল ওয়াহিদ
পিতাঃ সিরাজ আলী
গ্রামঃ চান্দ্রালা
ডাকঃ চান্দ্রালা বাজার
থানাঃ কোঠির বাজার
জেলাঃ কুমিল্লা
চট্টগ্রাম বন্দর অপারেশনে অংশ নেন।



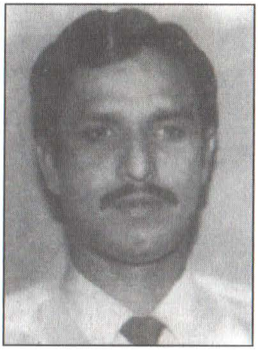
২৮. সালেহ আহমদ (নায়েক বি.ডি.আর)
পিতাঃ মোঃ আলি ইউসুফ
গ্রাম+পোষ্টঃ পরাগলপুর
থানাঃ মিরশরাই
জেলাঃ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর অপারেশনে অংশ গ্রহন করেন।



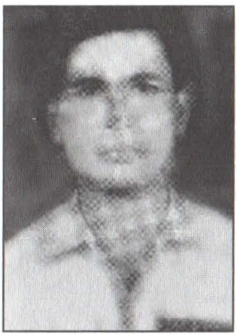
২৯. সেলিম বাঙালী
পিতাঃ ইয়াকুব আলী
গ্রামঃ মাইনি
পোষ্টঃ আবু তোরাব
থানাঃ মিরসরাই
জেলাঃ চট্রগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।



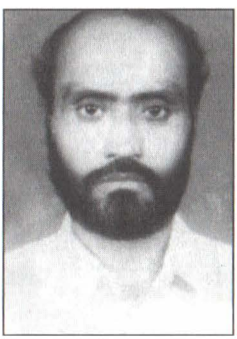
৩০. মাহমুদুল হক
পিতা- আব্দুল হক
গ্রাম- হরনি
হাতিয়া টাউন
জেলাঃ নোয়াখালি।



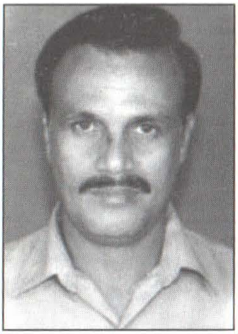
৩১. এমদাদ হোসেন মতিন
পিতাঃ শফিউল্লাহ
গ্রামঃ পশ্চিম মিঠানালা
ডাকঃ সুফিয়া মাদ্রাসা
থানাঃ মিরশরাই
জেলাঃ চট্টগ্রাম
বর্তমান ৪৮ সবুজবাগ, ঢাকা
১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহণ করে অত:পর ক্যাম্পে ফিরে নতুন নিয়োগকৃত ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেন।



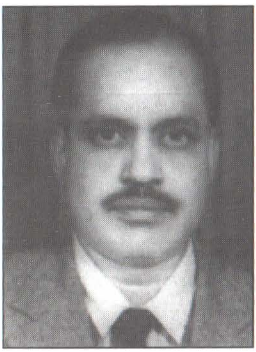
৩২. আমির হোসেন, বীর প্রতীক
পিতাঃ দলিলুর রহমান
গ্রামঃ নৈরাজপুর
ডাকঃ কে.এম.হাট
থানাঃ ফাজিলপুর
জেলাঃ ফেনী
১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে চট্টগ্রাম বহ্নিনোঙর অভিযানে শত্রুর হাতে বন্দি হন। নির্মম অত্যাচার এর পর পাকবাহিনী ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি করে রাখে। স্বাধীনতার পর মুক্ত হন।



৩৩. মোঃ মোরশেদ আলম
পিতাঃ এম.এ সামাদ সরদার
গ্রামঃ সুন্দুলপুর
পোষ্টঃ দাউদকান্দি
থানাঃ দাউদকান্দি
জেলাঃ কুমিল্লা
দাউদকান্দী অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।



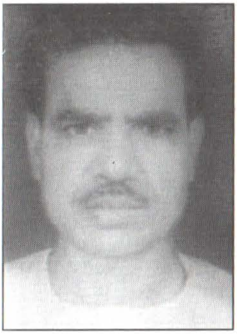
৩৪. খন্দকার আবু তাহের
পিতাঃ নূরুল হক খন্দকার
গ্রামঃ নিকুঞ্জরা
পোষ্টঃ ফাজিলপুর
জেলাঃ ফেনী।



৩৫. অনিল বরণ রায়
পিতাঃ মনোরঞ্জন রায়
৮৫/বি চট্টেশ্বরী রোড
চকবাজার, চট্টগ্রাম
সন্দ্বিপ অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।



৩৬. আব্দুল হাকিম
পিতা- ইয়াকুব আলী মোল্লা
গ্রাম- এখলাসপুর, মতলব
জেলা- চাঁদপুর
চাঁদপুর অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।



৩৭. আলাউদ্দিন ফজলু
পিতাঃ এম. এ. কাদের
গ্রামঃ চরকুমারিয়া
সরসতিরচর, দাউদকান্দি
জেলাঃ কুমিল্লা
হিরন পয়েন্ট অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।



৩৮. জহুরুল ইসলাম
পিতাঃ মরহুম নূর মোহাম্মদ
গ্রামঃ ২৩/১ পশ্চিম রামপুরা
ডাকঃ ওমর আলী লেন.
জেলাঃ ঢাকা
চাঁদপুর বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।
বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংকে কর্মরত।



৩৯. এম মনির হোসেন
পিতাঃ আব্দুল করিম বক্স
গ্রামঃ লটরদী
পোঃ গাজরা
থানাঃ মতলব
জেলাঃ কুমিল্লা
চাঁদপুর বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।



৪০. মোরশেদ আলম
পিতাঃ নায়েব আলী ভূইয়া
গ্রামঃ মানিককান্দী
ডাকঃ ইসলামাবাদ
ইলিয়টগঞ্জ
জেলাঃ কুমিল্লা।



৪১. মহিউদ্দিন আহমেদ
পিতাঃ আব্দুল মজিদ
গ্রামঃ চরভৈরব
ভেদরগঞ্জ
শরিয়তপুর।



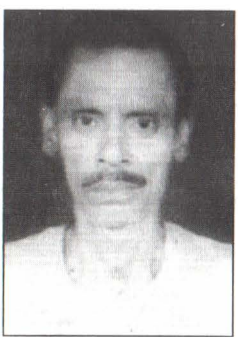
৪২. ইলিয়াস খন্দকার
পিতাঃ মৃত ইসহাক খন্দকার
গ্রামঃ দৌলতপুর
ডাকঃ দৌলতপুর
থানাঃ ফাজিলপুর
জেলাঃ ফেনী
চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহন করেন।



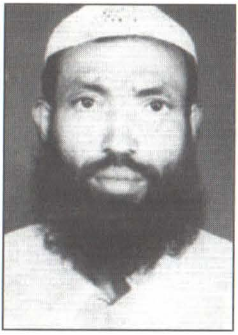
৪৩. মোঃ আবুল কাশেম মিয়া
পিতাঃ আব্দুল সামাদ
গ্রামঃ নন্দলালপুর
পোষ্টঃ মতলব
থানাঃ মতলব
জেলাঃ চাঁদপুর।



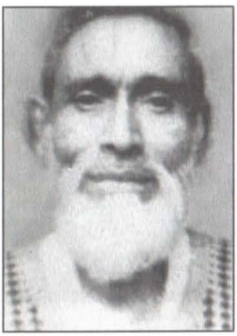
৪৪. সেলিমউল্লা খান
পিতাঃ মোঃ আলম খান
গ্রামঃ হাইমচর
জেলাঃ চাঁদপুর
বর্তমান মুগদাপাড়া, ঢাকা
চাঁদপুর অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। বর্তমানে হৃদরোগে আক্রান্ত। হার্টের ১টি ভাল্‌ব নষ্ট। অর্থাভাবে চিকিৎসা করতে পারছেন না। সরকার এবং সহৃদয় ব্যক্তিদের সাহায্য কামনা করেন।



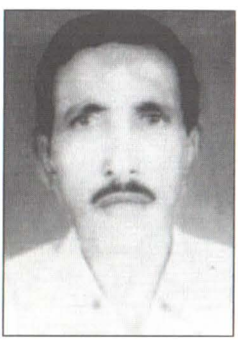
৪৫. মোঃ আকরাম হোসেন
পিতাঃ মোঃ ইসহাক সরদার
গ্রামঃ সাতপাকিয়া
পোষ্টঃ আটুলিয়া বাজার
থানাঃ তালা
জেলাঃ সাতক্ষীরা
খুলনা এবং মংলা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।



৪৬. আফাজ উদ্দিন
পিতাঃ আম্বর আলী
গ্রামঃ কৃষঃপুর
স্বরসতী
জেলাঃ কুমিল্লা
হার্ডিঞ্জ ব্রীজ অপারেশন কালে শত্রুবাহিনীর হাতে বন্দি হন।



৪৭. সাইদুর রহমান প্রধান
পিতাঃ মৃত বাবর আলি প্রধান
গ্রামঃ রামপুরা, হরিরামপুর
ডাকঃ গবিন্দগঞ্জ
জেলাঃ গাইবান্ধা।



৪৮. মজিবুল হক
পিতাঃ মাহবুবুর রহমান
গ্রামঃ লাঙ্গলমুড়া
ডাকঃ দৌলতপুর,
থানাঃ ফাজিলপুর,
জেলাঃ ফেনী
সন্দ্বীপ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।



৪৯. ফারুক-ই-আজম, বীর প্রতীক
পিতা- মনির আহমদ চৌধুরী
১৯ মেহেদীবাগ, চট্টেশ্বরী রোড
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।



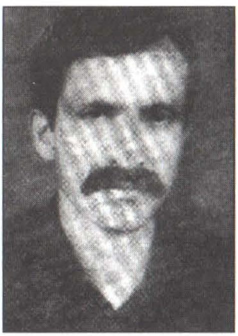
৫০. মোঃ শফিউল আনাম
পিতাঃ সুলতান আহমেদ
গ্রামঃ ফরহাবাদ
ডাকঃ নূর আলি মিয়া হাট
থানাঃ নাজিরহাট
জেলাঃ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।



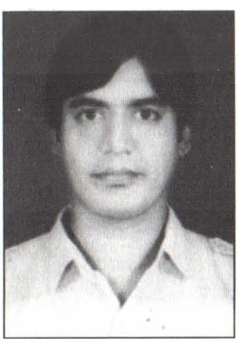
৫১. এম. লোকমান
পিতাঃ এম ইসহাক
গ্রামঃ পূর্ব ঢালাই
ডাকঃ কাটিরহাট, নাজিরহাট
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
বর্তমানঃ শিকলবাহক, এল,এ, (ভূমি হুকুম দখল এর কার্যালয়), চট্টগ্রাম সদর, চট্টগ্রাম।



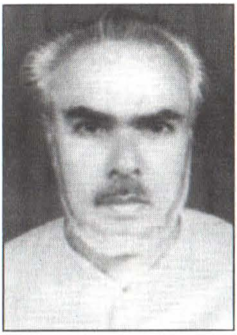
৫২. মোঃ এমদাদুল হক
পিতাঃ মোঃ ওয়ালিউল্লাহ
গ্রামঃ দেওটি
ডাকঃ দেওটি
থানাঃ বেগমগঞ্জ
জেলাঃ নোয়াখালী।



৫৩. মোঃ মোশাররফ হোসেন
পিতাঃ মুজিবুল হক
গ্রামঃ মজিদপুর
ডাকঃ আটিয়ারপুর
থানাঃ চৌমুহনী
জেলাঃ ফেনী।



৫৪. ফারুক আহমেদ
পিতাঃ আঃ আজিজ মাষ্টার
গ্রামঃ চাবিপাড়া
ডাকঃ ভাগ্যকূল
থানাঃ শ্রীনগর
জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ
আরিচা ফেরীঘাট অভিযানে অংশ গ্রহন করেন। বর্তমানে আমেরিকাতে চাকরি করছেন।



৫৫. খান আব্দুল আজিজ
পিতাঃ মৃত আলেফ খান্
গ্রামঃ কালী মোহন পালের বাড়ী
পোষ্টঃ নতুন বাজার
থানাঃ চাঁদপুর
জেলাঃ চাঁদপুর
চাঁদপুর অভিযানে অংশ নেন।



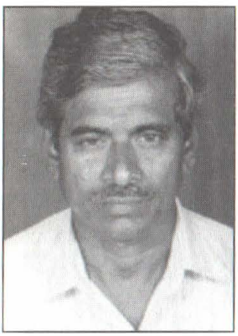
৫৬. দারু মিয়া
পিতাঃ চাঁদ মিয়া
গ্রামঃ সামন্তগর
ডাকঃ নবীনগর
জেলাঃ কুমিল্লা।



৫৭. আব্দুল ওয়াহাব
পিতাঃ নাজির আহমেদ
গ্রামঃ কালিয়াপুর
ডাকঃ চৌমুহনী
জেলাঃ নোয়াখালী
বর্তমানঃ ইউ.এম.সি জুট মিঃ, নরসিংদী।



৫৮. মোঃ জয়নাল আবেদীন চৌধুরী
পিতাঃ এ.রহমান চৌধুরী
গ্রামঃ উত্তর ইছাখালী
ডাকঃ বাবুরহাট
থানাঃ মিরশরাই
জেলাঃ চট্রগ্রাম
চট্টগ্রাম এবং সন্দ্বীপ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



৫৯. মোশাররফ মিয়া
পিতাঃ মেসের মিয়া
গ্রামঃ আমীরাবাদ
ডাকঃ সদরপুর
জেলাঃ ফরিদপুর
কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার সোনারহাট ব্রীজ ধ্বংস করেন। এরপর হিরন পয়েন্ট অভিযানে অংশ নেন।



৬০. মোঃ ফোরকান আলী
পিতাঃ মোঃ মুসা মিয়া
গ্রামঃ বরকাতহাট
ডাকঃ সন্দ্বীপ
থানাঃ সন্দ্বীপ
জেলাঃ চট্রগ্রাম
সন্দ্বীপ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



৬১. হেদায়েত উল্লাহ
পিতাঃ নূর মহম্মদ
গ্রামঃ মীর হাজিরবাগ
ডাকঃ ফরিদাবাদ
থানাঃ ডেমরা
জেলাঃ ঢাকা
নারায়নগঞ্জ এবং সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনে অংশ নেন।



৬২. মোস্তাফিজুর রহমান
পিতাঃ আবুল হোসেন মণ্ডল
গ্রামঃ বড় মহেশপুর
ডাকঃ ভাদুরিয়া
থানাঃ নবাবগঞ্জ
জেলাঃ দিনাজপুর
সন্দ্বীপ অভিযানে অংশ নেন।



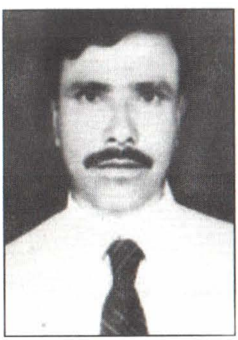
৬৩. মোঃ ইয়ার আলী মুন্সী
পিতাঃ রুস্তম আলী মুন্সী
গ্রামঃ ভাটরা
ডাকঃ ভাটরা বেজড়া
জেলাঃ গোপালগঞ্জ
আরিচাঘাট অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।



৬৪. ডাঃ মোজাম্মেল হক সিদ্দিকী
পিতাঃ এম.এস.এ. সিদ্দিকী
ঠিকানা ঃ সরকারী পশু হাসপাতাল
ফুলবাড়ীয়া, নিমতলা
জেলাঃ ঢাকা
বর্তমানে সহকারী পরিচালক হিসেবে ময়মনসিংহে কর্মরত। রাজবাড়ী প্রতিরোধযুদ্ধ এবং গোয়ালন্দ ফেরীঘাট অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।



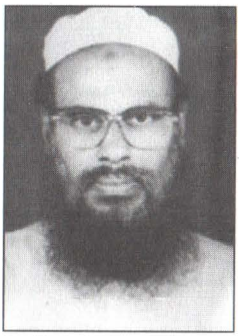
৬৫. মোতাহার হোসেন শেখ
পিতাঃ দাগ মাতবর
গ্রামঃ মোলামের ডাঙ্গী
ডাকঃ সদরপুর
জেলাঃ ফরিদপুর
গোয়ালন্দ ফেরীঘাট অপারেশন অংশগ্রহণ করেন।



৬৬. শামসুল হক
পিতাঃ আদিল উদ্দিন মিয়া
গ্রামঃ আকুলিয়ার চর
ডাকঃ সদরপুর
জেলাঃ ফরিদপুর
গোয়ালন্দ ফেরীঘাট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



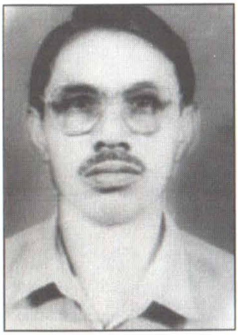
৬৭. এম.এ. রব্বান আলী
পিতাঃ মৃত মোঃ হানিফ উদ্দিন মোল্লা
গ্রামঃ মৌকুড়ি
ডাকঃ পাংশা
থানাঃ পাংশা
জেলাঃ রাজবাড়ি
আরিচা ফেরীঘাট অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।



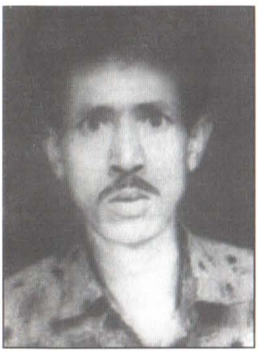
৬৮. রুকুজ্জামান
পিতাঃ সৈয়দ আলী
গ্রামঃ কাচারিপাড়া
ডাকঃ পাংশা
জেলাঃ রাজবাড়ী
গোয়ালন্দ ফেরীঘাট অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।



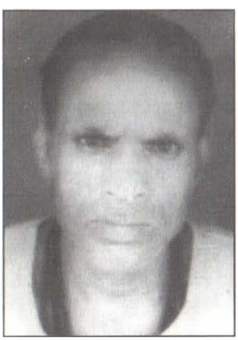
৬৯. গোলাম রহমান
পিতাঃ ইয়াকুব আলি ফকির
গ্রামঃ কাচারিপাড়া
ডাকঃ পাংশা
জেলাঃ রাজবাড়ী।
রাজবাড়ীতে সম্মুখযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সুবেদার হিসাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে; অবসর জীবন যাপন করছেন।



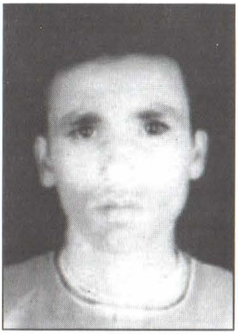
৭০. নির্মল কুমার ঢালী
পিতাঃ বিজয় বিহারী ঢালী
গ্রামঃ মাটিভাঙ্গা
ডাকঃ নাজিরপুর
জেলাঃ পিরোজপুর
মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



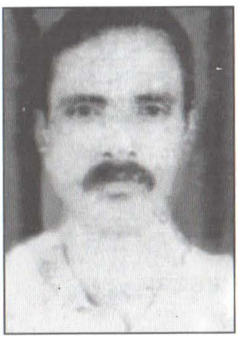
৭১. মুজিবুর রহমান
পিতাঃ কাজী লালু উদ্দিন
গ্রামঃ বোয়ালিয়া
ডাকঃ বাবুগঞ্জ
থানাঃ মোল্লারহাট
জেলাঃ বাগেরহাট
মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



৭২. মাখন চন্দ্র মজুমদার
পিতাঃ রাখাল চন্দ্র মজুমদার
গ্রামঃ কালীবাড়ী
ডাকঃ কালীবাড়ি বাজার
থানাঃ মোরলগঞ্জ
জেলাঃ বাগেরহাট
মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



৭৩. সুধাংশু কুমার মণ্ডল
পিতাঃ নিকুঞ্জ বিহারী মণ্ডল
গ্রামঃ কালীবাড়ী
ডাকঃ কালীবাড়ি বাজার
থানাঃ মোরলগঞ্জ
জেলাঃ বাগেরহাট
মোল্লারহাট থানা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



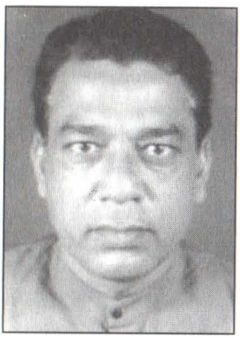
৭৪. গোপীনাথ হাওলাদার
পিতাঃ মহেন্দ্রনাথ হাওলাদার
গ্রামঃ কালীবাড়ী
ডাকঃ কালীবাড়ি বাজার
থানাঃ মোরলগঞ্জ
জেলাঃ বাগেরহাট
মোল্লারহাট থানা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



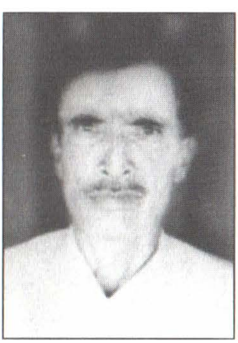
৭৫. এ.কে. শাহ আলম
পিতাঃ এ. রহমান শুকানী
গ্রামঃ কুচিমোড়া
থানাঃ সন্দ্বীপ
জেলাঃ চট্টগ্রাম
সন্দ্বীপ অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।



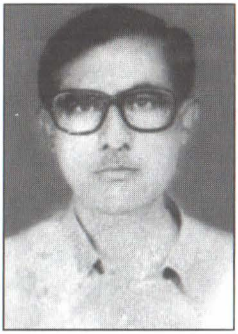
৭৬. আবুল হোসেন দেওয়ান
পিতাঃ দেওয়ান আলী
গ্রামঃ নিশ্চিন্তপুর
ডাকঃ নাথের পেটুয়া
জেলাঃ কুমিল্লা
সন্দ্বীপ অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।



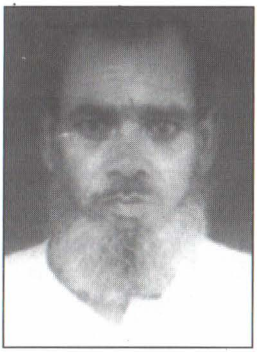
৭৭. খোরশেদ আলম
পিতাঃ ওয়ালিউল্লা মিয়া
গ্রাম সূচীপাড়া
থানা শাহ্রাস্তি
জেলা চাঁদপুর
আর. কে ইলেকট্রিক
নিউ মেডিকেল কলেজ রোড
রিকাবীবাজার, সিলেট
চাঁদপুর নদী বন্দর অপারেশনে নেতৃত্বদান করেন।



৭৮. মোঃ ইন্তাজ আলী
পিতাঃ মাদার বকস
গ্রামঃ রামপুর
জেলাঃ কুড়িগ্রাম।



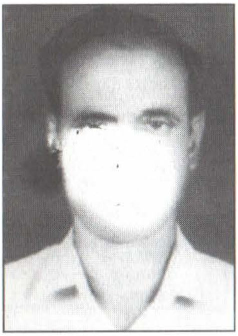
৭৯. বিনয় কুমার সরকার (দুলাল মাস্টার)
পিতাঃ ঈশান চন্দ্র সরকার
গ্রামঃ রামপুর
ডাকঃ হরিরামপুর
ডাকঃ হরিরামপুর, গোবিন্দগঞ্জ
জেলাঃ গাইবান্ধা।



৮০. জসিম উদ্দীন প্রধান
পিতাঃ নাসিম উদ্দীন
গ্রামঃ রামপুরা
ডাকঃ হরিরামপুর, গোবিন্দগঞ্জ
জেলাঃ গাইবান্ধা।



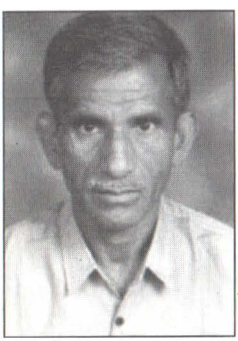
৮১. মাহবুবর রহমান প্রকৌশলী
পিতা কেরামত আলি পাটোয়ারী
রামপুরা, ঢাকা
আই ডব্লিউ টি এ-তে কর্মরত।



৮২. মোঃ নূরুল আলম চৌধুরী
পিতাঃ এ,করিম চৌধুরী
গ্রামঃ শিতলপুর
ডাক+থানাঃ সীতাকুণ্ড
জেলাঃ চট্টগ্রাম
সন্দ্বীপ যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন। বর্তমানে পিডিপিতে নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে কর্মরত।



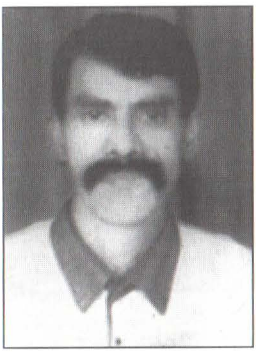
৮৩. আব্দুল ওয়াহিদ
পিতাঃ সিরাজ আলি
গ্রামঃ চান্দ্রা
জেলাঃ কুমিল্লা
চাঁদপুর নদীবন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



৮৪. মোঃ আরব আলি সরকার
পিতাঃ আশু সরকার
গ্রামঃ ইক্কাখালি, ডাক- মজিতপুর, থানা- দাউদকান্দি
জেলাঃ কুমিল্লা
নারায়ণগঞ্জ ও দাউদকান্দী অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।



৮৫. বাচ্চু মিয়া পাটওয়ারী
পিতাঃ সামছুল হক পাটওয়ারী
গ্রামঃ বাখরাপুর
জেলাঃ চাঁদপুর।



৮৬. শফিক আহমেদ
পিতা রইসউদ্দিন আহমদ
গ্রাম+ডাক ধুলিহার
জেলা সাতক্ষীরা
মংলা বন্দর অভিযানে অংশ নেন।



৮৭. সেলিম ভূঁইয়া
পিতাঃ ওয়ালিউল্লা ভূইয়া
গ্রামঃ নিয়াজপুর
ডাকঃ মিরেরপাড়া
থানাঃ বেগমগঞ্জ
জেলাঃ নোয়াখালি।



৮৮. এস. মজুমদার
পিতাঃ করিম বকস্ মজুমদার
গ্রামঃ উচাঙ্গা
ডাকঃ বাকিলা, হাজিগঞ্জ
জেলাঃ চাঁদপুর
চাঁদপুর এবং সিলেট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



৮৯. মোঃ আবুল হোসেন ফকির
পিতা ফজলুর রহমান ফকির
শিক্ষক
মতিঝিল সরকারী বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
গ্রাম নিয়ামতপুর
ডাক লক্ষীপুর
থানা পালং
জেলা শরিয়তপুর



৯০. মোঃ নজরুল ইসলাম
পিতাঃ মোঃ ইউসুফ আলি
গ্রামঃ পদ্মার পাড়
ডাকঃ মতলব
জেলাঃ চাঁদপুর।



৯১. মোঃ নজরুল ইসলাম
পিতাঃ ইয়াকুব আলি
গ্রামঃ খিল মোহর
ডাকঃ পালাখাল, থানা কচুয়া
জেলাঃ চাঁদপুর
পলাশী নৌ-কমান্ডো ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অংশ নেন।



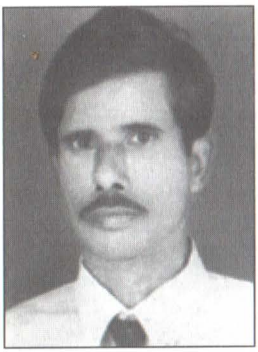
৯২. মোঃ আবুল খালেক এম.সি.পি.ও.
পিতাঃ মরহুম সাহেব আলি
গ্রামঃ চরগাধাতলী
ডাকঃ গৌরনদী
জেলাঃ বরিশাল।



৯৩. মোঃ সামসুল কবির
পিতাঃ মোঃ ইব্রাহিম
গ্রামঃ দাশাদী
সফরমালী, চাঁদপুর
মমিনউল্লা পাটোয়ারী বীর প্রতীক এর নেতৃত্ব চাঁদপুর বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



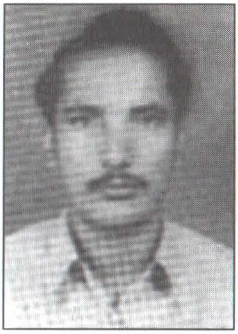
৯৪. সুশিল কুমার
গ্রামঃ সোনাইপুর
ডাকঃ মারুয়া বাজার
থানাঃ বালিয়াকান্দী
জেলাঃ রাজবাড়ী
গোয়ালন্দ ফেরীঘাট অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন।



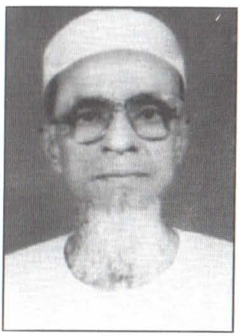
৯৫. নূরুল ইসলাম
পিতা আহম্মদ আলি
গ্রাম মহিচাইল
ডাক মহিচাইল
থানা চান্দিনা
জেলা কুমিল্লা
বর্তমান : টি/৫০৭/এ, উত্তর আমবাগান
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।



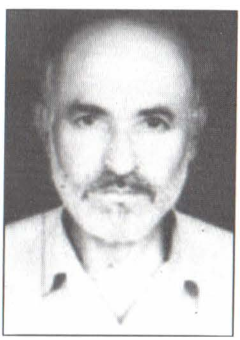
৯৬. ওয়াহিদুল ইসলাম
পিতা :আঃ মতিন প্রধান
গ্রাম পূর্ব রাজারগাঁও
ডাক পূর্ব রাজারগাঁও বাজার
জেলা চাঁদপুর।



৯৭. বদিউল আলম



৯৮. এম.ও.আর তালুকদার
গ্রামঃ দক্ষিন বড়গাছা, তেবাড়িয়া সড়ক
জেলাঃ নাটোর।



৯৯. এম.এ বারী সি.পি.ও
গ্রামঃ গাগলাইল
ডাকঃ মাথিয়া
জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।



১০০. জোবেদ আলি
পিতা আদর আলি সরদার
গ্রাম কালিয়ানী
ডাক বৈকারী
জেলা সাতক্ষীরা
মংলা বন্দর অভিযানে অংশগ্রণ করেন।



১০১. আনোয়ার হোসেন
পিতাঃ ঠাণ্ডু মিয়া
গ্রামঃ দক্ষিন মেখল
ডাকঃ ঘরদোয়ার, হাটহাজারী
জেলাঃ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।



১০২. খোরশেদ আলম, বীর প্রতীক
পিতাঃ মোঃ শাদত আলি
সুফিয়া মঞ্জিল, পুর্ব নাছিরাবাদ
জেলাঃ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর অভিযানে নেতৃত্ব দেন।



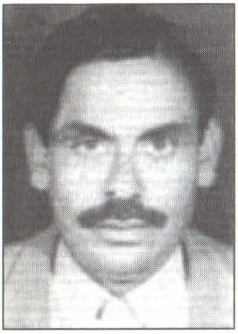
১০৩. মোঃ জসিম উদ্দীন
পিতাঃ মুলকাতুর রহমান
গ্রামঃ পশ্চিম বশিকপুর
জেলাঃ ফেনী
নারায়ণগঞ্জ এবং দাউদকান্দি ঘাট অভিযানে উপ দলনেতা হিসেবে নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারে কর্মরত।



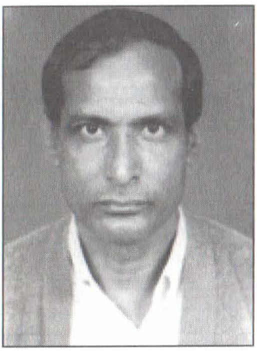
১০৪. আঃ খালেক
পিতাঃ শির মিয়া মোল্লা
গ্রামঃ পাটলিয়াকান্দী
থানাঃ হোমনা
জেলাঃ কুমিল্লা
দাউদকান্দি অভিযানে অংশ নেন।



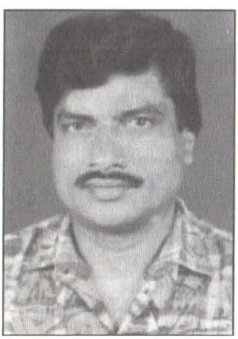
১০৫. ইদ্রিস আলি
পিতাঃ কাশেম আলি
গ্রামঃ আরইবুনিয়া
থানাঃ নাজিরপুর
জেলাঃ পিরোজপুর।



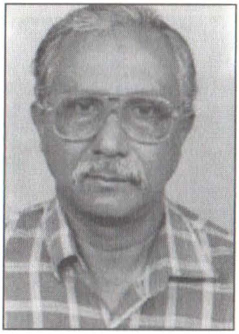
১০৮. নিজামুল হক
পিতাঃ মৃত আঃ বারী
বর্তমান প্রশাসনিক বিভাগ
নর্থ বেঙ্গল পেপার মিঃ লিঃ
পাকশী, পাবনা কর্মরত
আরিচাঘাট অভিযানে অংশ নেন।



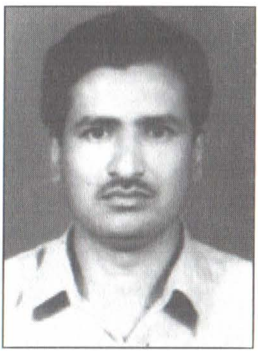
১০৯. হারুনর রশিদ
গ্রামঃ রামপুরা
ডাকঃ হরিরামপুর, গোবিন্দগঞ্জ
জেলাঃ গাইবান্ধা
বর্তমানঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস গাইবান্ধা
ফুলছড়িঘাট অপারেশটে অংশ নেন।



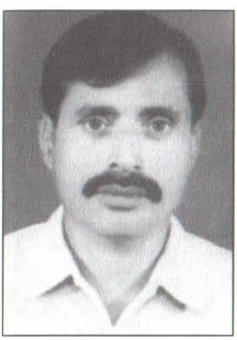
১১০. আনোয়ার হোসেন
পিতাঃ হামিদ মিয়া
গ্রামঃ দক্ষিণ মাতুয়াইল
ডাকাঃ যাত্রাবাড়ী
থানাঃ ডেমরা
জেলাঃ ঢাকা
দাউদকান্দী ও নারায়ণগঞ্জ অপারেশনে অংশ নেন।



১১১. এম শহিদউল্লা
পিতাঃ এ,হাই মিয়া
গ্রামঃ দক্ষিন মাতুয়াইল
ডাকঃ যাত্রাবাড়ী
থানাঃ ডেমরা
জেলাঃ ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা সিদ্ধিরগঞ্জ অপারেশনে অংশ নেন।



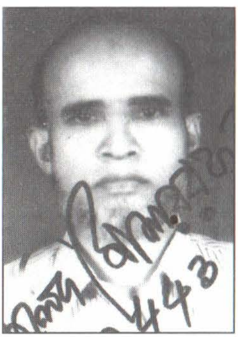
১১২. মোঃ শাহ্ আলম
পিতাঃ এ. খালেক
গ্রামঃ খলিলাবাদ
ডাক নারাণদিরা
থানাঃ দাউদকান্দি
জেলাঃ কুমিল্লা।



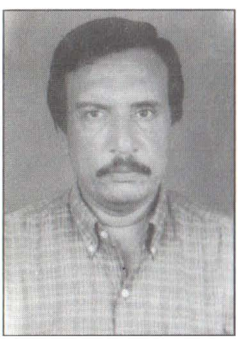
১১৩. সিরাজুল ইসলাম
পিতা গনি মিয়া প্রধান
গ্রাম আমিরাবাদ
ডাক গবিন্দপুর
থানা হোমনা
জেলা কুমিল্লা।



১১৪. মো ঃ আমির হোসেন
পিতা ঃ চাঁদ বক্‌স
ইন্সট্রাক্টর, সিগনাল স্কুল
বিএনএস ঈশা খান, ঢাকা
চাঁদপুর অপারেশনে অংশ গ্রহণ করেন।
গ্রাম ঃ পুদিয়ানা
ডাক ঃ এখলাসপুর, থানা ঃ মতলব
জেলা ঃ চাঁদপুর।



১১৫. মোশাররফ হোসেন
পিতা ঃ মুন্সী আফেজউদ্দিন মোল্লা
গ্রাম ঃ মাদুলি হারানিয়া
ডাক ঃ হোগলাবুনিয়া
থানা ঃ নাজিরপুর, জেলা ঃ পিরোজুর
বর্তমান ঃ উচ্চমান সহকারী
শাখা টেলিফোন রাজস্ব অফিস
কলেজ রোড, বরিশাল
পিরোজপুর কচানদীতে এবং বরিশাল অপারেশনে অংশ নেন।



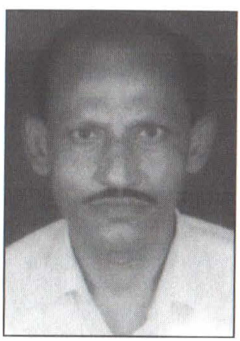
১১৬. জামাল উল্ল্যাহ
গ্রাম ঃ শাখা উল্লাহ
গ্রাম ঃ মালিয়াইশ
ডাক ঃ সুফিয়া মাদ্রাসা
থানা ঃ মিরশ্বরাই
জেলা ঃ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর ঃ অভিযানে উপ দলনেতা হিসেবে নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে পরিদর্শক খাদ্য বিভাগ, চট্টগ্রাম।



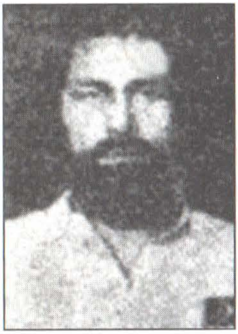
১১৭. অভিমন্যু মন্ডল
পিতা ঃ সাহদেব মন্ডল
গ্রাম সাবোখালী
ডাক এস. বাখরগঞ্জ
জেলা বাগেরহাট



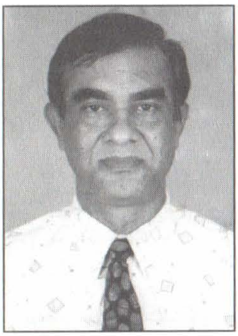
১১৮. মোঃ আঃ খালেক
পিতা ঃ শির মিয়া মোল্লা
গ্রাম ঃ পাটলিয়াকান্দি
থানা ঃ হোমনা
জেলা ঃ কুমিল্লা ।



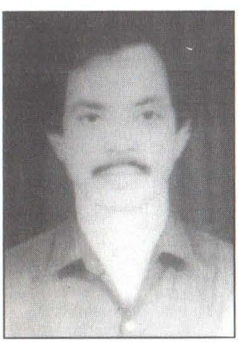
১১৯. আবুল হোসেন
পিতা ঃ আহমদউল্লা গাজী
গ্রাম ঃ
ডাক ঃ
থানা ঃ
জেলা ঃ



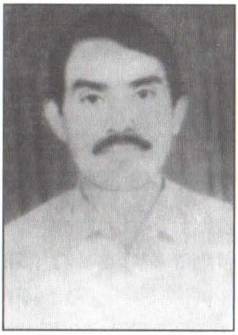
১২০. ডাঃ কে. এম. রায়হান
পিতা ঃ চান মিয়া ফকির
গ্রাম ঃ উত্ত্র আলমনগর
ডাক ঃ চর ভদ্রাসন
জেলা ঃ ফরিদপুর।



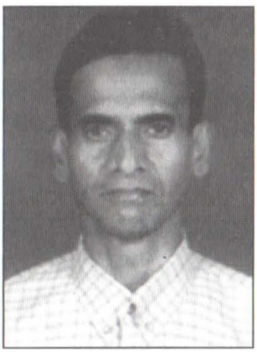
১২১. খন্দকার মামনুন ইলাহী
পিতা ঃ খন্দকার আতা ইলাহী
মুরাদ কুঠির
মেডিকেল রোড ধাপ. রংপুর
বর্তমান ঃ এস.পি.ও জনতা
৪৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।



১২২. ফরহাদ আলি গাজী
পিতা ঃ শওকত আলি গাজী
গ্রাম+ডাক ঃ গড়ইখালি
থানা ঃ পাইকগাছা
জেলা ঃ খুলনা।



১২৩. ফিরোজ গাজী
পিতা ঃ শওকত আলি গাজী
গ্রাম+ডাক ঃ গড়ইখালি
থানা ঃ পাইকগাছা
জেলা ঃ খুলনা।



১২৪. আমিনুল হক
পিতা ঃ তাজেল মিয়া
গ্রাম+ডাক   এখলাশপুর
থানা   মতলব
জেলা   চাঁদপুর



১২৫. শহীদ মহিবউল্লাহ বীর বিক্রম
১নং নর্থব্রুক হল রোড
ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা



১২৬. এ.কে.এম. মোজাম্মেল হক খান

পিতা ঃ ফজলুল হক

গ্রাম পান্টি

ডাক গান্ধ্রা

থানা মুরাদনগর

জেলা কুমিল্লা



১২৭. মহিউদ্দিন

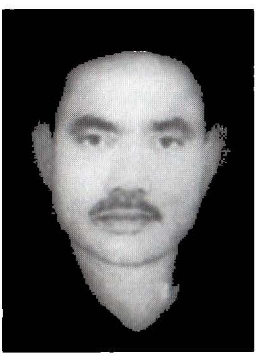
পিতা ঃ মনছুর আহমদ

গ্রাম ঃ পশ্চিম ইছাখালি

ডাক ঃ মাতবরহাট

থানা ঃ মিরশ্বরাই

জেলা ঃ চট্টগ্রাম।



১২৮. আবুল বাশার

পিতা ঃ আবু বক্কর সিদ্দিক

গ্রাম কালিকাপুর

থানা চৌমুহনী

জেলা নোয়াখালী

পরিশিষ্ট "গ"

২৫ মার্চ '৭১ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করলে ফ্রান্সে অবস্থানরত পাকিস্তানী নৌ-বাহিনীর ৮জন বাঙালি নাবিক বিদ্রোহ ঘোষণা করে সপক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের তালিকা :-

গাজী মোঃ রহমত উল্লাহ বীর প্রতীক
পিতা : মো: শহর আলী গাজী
৪০, বি.কে. দাস রোড, শেখপাড়া, খুলনা
নৌ-বাহিনীর নং- ৬৬১১৩

সৈয়দ মোঃ মোশাররফ হোসেন
পিতা সৈয়দ রিয়াজউদ্দিন
গ্রাম+ডাক : সিড্যা, থানা ডামুড্যা
জেলা শরিয়তপুর
বর্তমান ঠিকানা
৭/১৮০ রূপনগর কলোনী
মীরপুর, ঢাকা-১২২১
নৌ-বাহিনীর নম্বর - ৬৩২৯৯

আমিনউল্লা শেখ বীর বিক্রম
গ্রাম পাইকপাড়া, থানা ফরিদগঞ্জ
জেলা চাঁদপুর
বর্তমান
গ্রীন ভিউ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম
নৌ-বাহিনীর নম্বর- ৬৫৩৯১
মৃত্যু ১৫ জুলাই '৯৯

আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী বীর উত্তম
সাবমেরীনার আব্দুল ডব্লিউ চৌধুরী বীর বিক্রম
গ্রাম উত্তর শ্রীপুর, ডাক মুন্সীর হাট
থানা+জেলা ফেনী
নৌ-বাহিনীর নং- ৬৪০৫১২
বর্তমান
ইস্টার্ন টাওয়ার
বাড়ি ১৬০২/৩ নিউ ইসকাটন, ঢাকা

বদিউল আলম বীর উত্তম
পিতা মোজাম্মেল হক সরকার
গ্রাম রামপুরা, ডাক : নাকাইহাট
থানা: গবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
বর্তমান
৪৪, পলাশনগর, মীরপুর, ঢাকা-১১
নৌ-বাহিনী নং-৬৪০৫১২

মোঃ আহসান উল্লাহ বীর প্রতীক
পিতা মৃত মোঃ আমিনউল্ল্যাহ
গ্রাম ও ডাক আহমদপুর
থানা+জেলা ফেনী
নৌ-বাহিনীর নং-৬৮৪৪৪

শহীদ আব্দুর রকিব মিয়া বীর বিক্রম
পিতা হাজী হাতেম আলী মুন্সী
গ্রাম শোলা প্রতিমা, ডাক+থানা সখিপুর
জেলা : টাঙ্গাইল
নৌ-বাহিনীর নং-৬৫০২৪৩

আব্দুল রহমান বীর বিক্রম
পিতা মৃত শফিকুর রহমান
গ্রাম+ডাক: সালিমাবাদ
থানা নাগরপুর
জেলা : টাঙ্গাইল
নৌ-বাহিনীর নং-৬৬০৪৪৯
বর্তমান :
১৫ পেরী দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডো বাহিনী বা প্রধান সেনাপতির স্পেশাল বাহিনীর তালিকা।
'৭১ সালে সি-২ পি ক্যাম্প পলাশীতে তৈরী- (বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত)।

মীর মোশতাক আহমদ রবি
পিতা : মীর এশরাক আলী
গ্রাম ও ডাক : মুনজিতপুর
জেলা : সাতক্ষীরা
বর্তমান
বাসা নং-৪/ডি
ইস্টার্ন হাউজিং এপার্টমেন্ট
সার্কিট হাউজ সড়ক
রমনা থানার পিছনে, ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০০০১

আব্দুল কাদের
পিতা আঃ মোতালেব
গ্রাম + ডাক : দেবনগর
জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০০২

গাজী মোঃ আমীন
পিতা গাজী ফয়জুল রহমান
গ্রাম পাঞ্চুরিয়া
ডাক+জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০০৩

আব্দুর রহিম
পিতা : মৃত মো: আ: কুদ্দুস
গ্রাম : কামরাঙ্গিরচর
ডাক : নয়াগাঁও, জেলা ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০০০৪

মোক্তার হোসেন
পিতা মৃত হাতেম আলী
গোকুল নগর কৃষি ফার্ম
ডাক-দত্ত নগর বাজার
মহেশপুর, ঝিনাইদহ
নৌ-কমান্ডো নং-০০০৫

যোয়াদুর রসুল বাবু
পিতা আঃ লতিফ মৃত
গ্রাম +ডাক : চাঁদখালী
জেলা খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং-০০০৬

অরুন ভট্টাচার্য্য
পিতা মৃত সুধীর ভট্টাচার্য্য
গ্রাম পাড়ালা, ডাক খাটুয়া ডাঙ্গা
থানা মনিরামপুর, জেলা যশোর
বর্তমান
১১৩ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, যশোর সদর
নৌ-কমান্ডো নং-০০০৭

শেখ আঃ সেলিম ককিল
পিতা শেখ আঃ ওয়াহাব
গ্রাম : সুলতানপুর
সাতক্ষীরা সদর, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০০৮

রফিকুল ইসলাম বাবলা
পিতা আবুল হোসেন মোল্ল্যা
গ্রাম ঘলঘলিয়া
ডাক ভাতশালা
জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০০৯

মোঃ আলফাজউদ্দিন
পিতা- অজিহার রহমান
গ্রাম নেবাখালী
ডাক জগন্নাথপুর
জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০১০

ইমাম বারী
পিতা আতিয়ার রহমান
৩৬, খুলনা রোড, গ্রাম কাটিয়া
সাতক্ষীরা সদর, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০১১

আব্দুস সাত্তার
পিতা মোঃ শামছুদ্দিন বি:
গ্রাম : কনেজপুর
ডাক এন.এস.টাউন, জেলা : যশোর
নৌ-কমান্ডো নং-০০১২

আলি আশরাফ শিকদার
পিতা ওয়াজেদ আলি শিকদার
গ্রাম+ডাক সোমাদ্দরখালি
থানা মোড়লগঞ্জ, জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০০১৩

অরুণ কান্তি মুখার্জি
পিতা : কালিপদ মুখার্জি
গ্রাম সুন্দরপুর
ডাক গিলাতলা
জেলা ; বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০০১৪

বজলুর রহমান
পিতা মোঃ আঃ কাশেম
গ্রাম গোদাঘাটা, ডাক জগন্নাথপুর
জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০১৫

আবুল হোসেন
পিতা হাজী হাবিবউল্ল্যাহ
গ্রাম তালুয়া চাঁদপুর
ডাক তালুয়া চাঁপুর
থানা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০০১৭

শহীদ সিরাজুল ইসলাম
পিতা আক্তার আলী সরদার
খুলনা রোড, গ্রাম : কাটিয়া
ডাক+জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০১৮

শওকত আলী
পিতা মামদার বিশ্বাস
গ্রাম : নওদাগ্রাম, ডাক মহেশপুর
জেলা ঝিনাইদহ
নৌ-কমান্ডো নং-০০১৯

মোহাম্মদ কুদ্দুস
পিতা তোফাজ্জেল হোসেন
গ্রাম সোনাতলা, ডাক সোমাদ্দারখালী
থানা: মোড়লগঞ্জ, জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০০২০

আব্দুল গফুর
পিতা আঃ গনি মন্ডল
গ্রাম+ডাক : পাচকায়বা
থানা শার্শা, জেলা যশোর
নৌ-কমান্ডো নং-০০২১

আজিজুল আলম
পিতা সমির উদ্দিন মিস্ত্রী
গ্রাম : কালিগ্রাম, ডাক বাঘা
জেলা রাজশাহী
নৌ-কমান্ডো নং-০০২২

গোলাম মোস্তফা
পিতা আজিজুর রহমান মোল্লা
গ্রাম : চরদাঘা, ডাক পানাইল
থানা কাশিয়ানী, জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০২৩

আলী হোসেন
পিতা মোঃ কালা মিয়া
গ্রাম: মহেশপুর
ডাক মহেশপুর (অফিস পাড়া)
জেলা ঝিনাইদহ
নৌ-কমান্ডো নং-০০২৪

কাজী এমদাদুল হক
পিতা : কাজী আহমদ হোসেন
গ্রাম চৌগাছা
ডাক কুটি চৌগাছা, শ্রীপুর
জেলা মাগুরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০২৫

মনসুর আলী মাঝি
পিতা পবন আলী মাঝি
গ্রাম ভাইহারা
ডাক সোমাদ্দারখালী
থানা মোড়লগঞ্জ
জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০০২৬

সুবোধ কুমার বিশ্বাস
পিতা : শ্রী ব্রজ মোহন বিশ্বাস
গ্রাম : মিরাশপুর
ডাকা মুল ত্রিবাণী
জেলা ঝিনাইদহ
নৌ-কমান্ডো নং-০০২৭

আব্দুল হক
পিতা ডা: এ. মালেক
গ্রাম পীরগাছা
ডাক ঘুঘরী পান্থপাড়া
জেলা ঝিনাইদহ
নৌ-কমান্ডো নং-০০২৮

হুমায়ুন কবীর
পিতা শেখ শহীদ আঃ মজিদ
গ্রাম নন্দীগ্রাম
ডাক পানাইল
থানা আলফাডাঙ্গা
জেলা ফরিদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০২৯

শেখ রুহুল আমীন
পিতা শেখ জয়নাল আবেদীন
গ্রাম বেতিল, ডাক বেতিল হাটখোলা
জেলা সিরাজগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৩০

হাসান নূর
পিতা মৃত আঃ ওয়াদুদ
গ্রাম পথেরতলা
ডাকা : দিলালপুর, জেলা পাবনা
নৌ-বাহিনীর নং-০০৩১

সৈয়দ আবুল বাশার
পিতা সৈয়দ মহম্মদ আলী
গ্রাম হরকুসুম কুঞ্জ
ডাক উঃ দঃ আলেকান্দা রোড
থানা বটতলা, জেলা বরিশাল
নৌ-কমান্ডো নং-০০৩২

ফজলুল হক
পিতা মোঃ আঃ রাজ্জাক
গ্রাম দেওয়ানপাড়া, ডাক শ্যামপুর
থানা মতিহার, জেলা রাজশাহী
নৌ-কমান্ডো নং-০০৩৩

বিশ্বনাথ পালিত
পিতা সুরেন্দ্র নাথ পালিত
গ্রাম ঘলঘলিয়া, ডাক ভাতশালা
থানা দেবহাটা, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৩৪

মোঃ জবেদ আলী
পিতা আদর আলী সরকার
গ্রাম কালিয়ানী, ডাক বৈকারী
জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৩৬

এবাদুল ইসলাম
পিতা : মৃত বাছতুল্যা সরদার
গ্রাম কুলিয়া, ডাক গুরুগ্রাম
থানা দেবহাট্টা, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৩৭

হাফিজউদ্দিন (মফিজ)
পিতা আমজাদ আলী মোড়ল
গ্রাম জুসখোলা, ডাক পাটকেলঘাটা
জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৩৯

মোঃ রুহুল আমিন
পিতা জামাত আলি মন্ডল
গ্রাম+ডাক চৌগাছা
জেলা ঝিনাইদহ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৪০

মনীন্দ্র নাথ বিশ্বাস
পিতা কালীচন্দ্র বিশ্বাস
গ্রাম +ডাক : বাঁশতলী
জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৪১

সামসুল হক
পিতা মোঃ আঃ আজিজ
গ্রাম +ডাক এনায়েতপুর
থানা সুজানগর, জেলা পাবনা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৪২

আলমগীর শিকদার
পিতা আবু জাফর শিকদার
গ্রাম : টিটা, ডাক : কালিনী
থানা আলফাডাংগা, জেলা ফরিদপুর
নৌ-বাহিনীর নং-০০৪৩

মতিউর রহমান বীর প্রতীক
পিতা আব্দুল আলী শেখ
গ্রাম সাতঘরিয়া, ডাক হলদিয়া
থানা লৌহজং, জেলা মুন্সিগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৪৪

রইসউদ্দিন (শিক্ষক)
পিতা : নওশের আলী সরদার
গ্রাম+ডাক গদাইপুর
থানা আশাশুনি, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৪৫

আমজাদ হোসেন
পিতা জাফর আলি সরদার
গ্রাম +ডাক পারুলিয়া
জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৪৬

বশির আহমদ
পিতা : রইসউদ্দিন মোল্লা
গ্রাম শেখেরমারী, ডাক দামকুড়াহাট
জেলা রাজশাহী
নৌ-কমান্ডো নং-০০৪৭

নাইমুল ইসলাম
পিতা মোঃ আফতাবউদ্দিন
গ্রাম+ডাক নমশঙ্কর বাটী
জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৪৮

জি.এম. গফ্ফার
পিতা মৃত সৈয়দ আলী গাজী
গ্রাম : কুলিয়া, ডাক : গুরুগ্রাম
থানা দেবহাটা, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৪৯

জহিরুল হক (খোকা)
পিতা : সলিমউদ্দিন ফকির
গ্রাম ২৫, হাজী মহসীন রোড
ডাক খুলনা, জেলা খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৫০

আব্দুল হাকিম
পিতা মোঃ নাজিরউদ্দিন
গ্রাম বেতিল, ডাক বেতিল হাটখোলা
থানা চৌহালি, জেলা : সিরাজগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৫১

শহীদ আফতাব উদ্দিন
পিতা মৃত নূরউদ্দিন মন্ডল
গ্রাম : কাশিয়াডাঙ্গা, ডাক যাদবপুর
থানা শার্শা, জেলা যশোর
নৌ-কমান্ডো নং - ০০৫৪

মুজিবুর রহমান
পিতা ওয়াহেদ আলি মন্ডল
পো : কাশিয়াডাঙ্গা, ডাক : যাদবপুর
থানা : শার্শা, জেলা যশোর
বর্তমান
সহকারী ম্যানেজার (ক্যাশ)
বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী
নৌ-কমান্ডো নং-০০৫৫

ওসমান গনি
পিতা আব্বাস উদ্দিন মল্লিক
গ্রাম কোটচাঁদপুর বাসষ্ট্যান্ডপাড়া
ডাক কোটচাঁদপুর, জেলা ঝিনাইদহ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৫৬

অভিমন্যু মন্ডল
পিতা সাহাদেব মন্ডল
গ্রাম শাবুখালী, ডাক পুটারপাড়া
জেলা : বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০০৫৭

এমদাদুল হক
পিতা মোঃ আঃ কাশেম সরদার
গ্রাম কুলিয়া, ডাক গুরুগ্রাম
থানা দেবহাটা, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৫৮

মনীন্দ্র নাথ মন্ডল
পিতা দুলাল চন্দ্র মন্ডল
গ্রাম+ ডাক বিনেরপোতা
জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৫৯

মোঃ খলিলুর রহমান
পিতা মোঃ আয়জদ্দিন বিশ্বাস
৪, নীলাম্বর সাহা রোড
সেকশন, হাজারীবাগ
ঢাকা-১২০৫, ফোন ৮৬১৮০৪১
নৌ-কমান্ডো নং-০০৬০

শেখ সামসুল আলম
পিতা : শেখ আব্দুস সামাদ
গ্রাম চাঁদপুরপাড়া, ডাক কানাইডাঙ্গা
থানা মহেশপুর, জেলা ঝিনাইদহ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৬১

আব্দুল হামিদ
পিতা হাজী সোলেমান সরকার
গ্রাম ভিমের ডাং, ডাক দামকুড়াহাট
জেলা রাজশাহী
নৌ-কমান্ডো নং-০০৬২

শেখ মহসীন আলী
পিতা শেখ রিয়াজউদ্দিন আহমদ
গ্রাম : ৩১, শীতলাবাড়ী
ডাক : ইসলামপুর ক্রসরোড
থানা খুলনা সদর, জেলা : খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৬৩

ফজলুল হক চৌধুরী
পিতা : কামরুজ্জামান চৌধুরী
গ্রাম ফাগদীপাড়া
ডাক ঘোড়ামারা, রাজশাহী
জেলা রাজশাহী
নৌ-কমান্ডো নং-০০৬৪

অনিল কুমার মন্ডল
পিতা : মৃত রামচন্দ্র মন্ডল
গ্রাম : কুলিয়া, ডাক গুরুগ্রাম
জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৬৫

মালেক সোবহান
পিতা : নূর মহম্মদ মন্ডল
গ্রাম মুরারীপুর, ডাক : হরিপুর
জেলা রাজশাহী
নৌ-কমান্ডো নং-০০৬৬

শহীদ খবিরুজ্জামান বীর বিক্রম
পিতা মৌ: এ. জব্বার
গ্রাম : বাগমারা, ডাক খাবাসপুর
থানা পানচাট, জেলা ফরিদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৬৭

সামসুল হক চাকলাদার
পিতা মোজাম্মেদ হক চাকলাদার
গ্রাম পুরাতন কসবা (হক মঞ্জিল)
ডাক যশোর, জেলা যশোর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৬৮

আমিনুর রহমান খসরু
পিতা এস.এম. কাশিম
গ্রাম ৪৯ হাজী মেহের আলী রোড
ইকবাল নগর, খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৬৯

সাজেদুল হক চুন্নু
পিতা : আলিমউদ্দিন আহমদ
গ্রাম : নিউ টাউন, জেলা : মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৭০

হাবিবুল হক খোকন
পিতা : আলহাজ্ব সায়েদউদ্দিন আহ্মেদ
গ্রাম : নতুনশহর
জেলা : মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৭১

ডা: শাহ আলম বীর উত্তম
পিতা এম. আলী আহম্মদ চৌধুরী
গ্রাম করমুল্লাপুর
ডাক : জিরতালা বাজার
থানা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০০৭২

ফকরুল ইসলাম
পিতা এম.এ. শহীদ
গ্রাম + ডাক : লাতুয়া
থানা : বিয়ানীবাজার
জেলা সিলেট
নৌ-কমান্ডো নং-০০৭৩

আবুল হোসেন (মৃত)
পিতা এ. রহমান গাজী
গ্রাম+ডাক : শাবরামপুর
থানা কালকিনী
জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৭৪

হাফিজুর রহমন
পিতা মোঃ দলিলউদ্দিন
গ্রাম : বদরপাশা, ডাক : রাজৈর
জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৭৫

আলী আহমদ
পিতা : ইসমাইল ফকির
গ্রাম সরমঙ্গল (ঘোয়ালকান্দী)
ডাক খালিয়া
থানা রাজৈর, জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৭৬

সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
পিতা মৃত জনাদ্দন বিশ্বাস
গ্রাম ধর্মরায়ের বাড়ী, ডাক উজানী
থানা মুকসুদপুর, জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৭৭

বিধান বিশ্বাস
পিতা কুঞ্জ বিহারী বিশ্বাস
গ্রাম মহাতলি, ডাক : উজানী
থানা মুকসুদপুর, জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৭৮

শাহাবউদ্দিন ভূঁইয়া
পিতা মোঃ হানিফ ভূইয়া
গ্রাম সোনালী কাঁচঘর
ডাক : প্রধান সড়ক, জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৭৯

সাইদুর রহমান
পিতা এম. মজিদ মিয়া
গ্রাম + ডাক : কমলাপুর
থানা কুঠিবাড়ী, জেলা ফরিদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৮০

এস.কে. স্বর্ণকার
পিতা রাজেন্দ্র স্বর্ণকার
গ্রাম+ডাক চরমুগুরিয়া
জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৮১

মাহবুব আহমদ মিলন
পিতা কাজী মমিনউদ্দিন আহমদ
গ্রাম নতুন শহর
জেলা : মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৮২

গফুর খাঁন
পিতা : মৃত সাত্তার খান
গ্রাম+ডাক : চরমুগুরীয়া
জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৮৩

আবিউর রহমান
পিতা মজিবুর রহমান
গ্রাম+ডাক সরগ্রাম
থানা বোয়ালমারী
জেলা : ফরিদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৮৫

আবুল বাশার
পিতা আইয়ুব আলী সর্দার
গ্রাম+ডাক রামভদ্রপুর
থানা ভেদরগঞ্জ, জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৮৬

গোলাম রব্বানী (মৃত)
পিতা মুন্সী নূর মহম্মদ
গ্রাম+ডাক ভেদরগঞ্জ
জেলা : মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৮৭

এম.এ. রহিম
পিতা মরহুম মো: আলী বক্স বেপারী
গ্রাম কোড়ালতলী
ডাক + থানা : ভেদরগঞ্জ
জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৮৮

ওয়ালিউল্লা হাওলাদার
পিতা : মোঃ মদন আলি হাওলাদার
গ্রাম গৈজ্যা, ডাক ভেদরগঞ্জ
জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০০৮৯

আনোয়ার হোসেন
পিতা এম.এ. হামিদ মিয়া
গ্রাম মাতুয়াইল, ডাক যাত্রাবাড়ী
থানা ডেমরা, জেলা ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৯০

এনামুল হক
পিতা বজলুল হক
গ্রাম জয়নগর, ডাক পিরীজকান্দী
থানা রায়পুরা, জেলা নরসিংদী
নৌ-কমান্ডো নং-০০৯১

বশির আহমদ
পিতা তমিজউদ্দিন আহমেদ
গ্রাম+ডাক হামছাদী
থানা সোনারগাঁও, জেলা : নারায়ণগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৯২

হেদায়েতউল্লাহ
পিতা নূর মোহাম্মদ
গ্রাম ১১৯ মীর হাজির বাগ
ডাক ফরিদাবাদ
থানা ডেমরা, জেলা ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৯৩

এম শহিদ উল্লাহ
পিতা এ. হাই মিয়া
গ্রাম +পো : মাতুয়াইল (উত্তরপাড়া)
থানা ডেমরা, জেলা ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৯৪

আজহার হোসেন
পিতা এম. আব্দুর রশীদ
গ্রাম +ডাক মাতুয়াইল
থানা ডেমরা, জেলা ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৯৫

তোফাজ্জল হোসেন
পিতা আনসার আলী
গ্রাম + ডাক তারাবো
জেলা নারায়ণগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৯৬

এস. এম. খলিলউল্লাহ
পিতা : আঃ গনি মোল্লা
গ্রাম : কাচারীকান্দি, ডাক মধ্যনগর
থানা : রায়পুর, জেলা নরসিংদী
নৌ-কমান্ডো নং-০০৯৭

এ. কাদের মিয়া
পিতা মনির হোসেন প্রধান
গ্রাম পুরানো বাউসিয়া, ডাক বাউসিয়া
থানা গজারিয়া, জেলা মুন্সিগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০০৯৮

এ. হাশেম
পিতা শরবত আলী
গ্রাম রূপপুর
ডাক রূপপুর বাজার
জেলা ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০০৯৯

এ. খালেক
পিতা   হোসেন আলী সরদার
গ্রাম +ডাক   মিরশাপুর
থানা : কসবা, জেলা : বাহ্মণবাড়িয়া
নৌ-কমান্ডো নং-০১০০

ফজলুল হক ভূঁইয়া
পিতা   মৃত একেন আলি ভূঁইয়া
গ্রাম   কোড্ডা, ডাক   আখাউড়া
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
নৌ-কমান্ডো নং-০১০১

আরজ মিয়া
পিতা   মৃত আব্দুল আজিজ
গ্রাম +ডাক   বাহাদুরপুর
থানা   আশুগঞ্জ, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
নৌ-কমান্ডো নং-০১০২

এম. এ. ওয়াদুদ
পিতা   মোঃ আতাহার আলি মিয়া
গ্রাম   চিপাবারইখালি
ডাক : চালিতাবুনিয়া
জেলা   বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০১০৪

এস.এম. মুজিবুর রহমান
পিতা : হাজী কোরবান আলী সরদার
গ্রাম + ডাক   নকিপুর
থানা   শ্যামনগর, জেলা   সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১০৫

এস. এম. এ. রহিম
পিতা   জিন্নাত আলি সরদার
গ্রাম + ডাক   নকীপুর
থানা   শ্যামনগর, জেলা   সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১০৬

কে. এম. এ. রহিম (মৃত)
পিতা : মানিকউল্লা মোল্লা
গ্রাম   মহিশকুর, ডাক : শ্রীউল্লা
থানা   আশাশুনি, জেলা   সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১০৭

এস. এম. নূরুল ইসলাম
পিতা : মৃত ফজলে করিম সরদার
গ্রাম   পাতাখালি, থানা   শ্যামনগর
জেলা   সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১০৮

শেখ শাহাদাত হোসেন
পিতা   শেখ কেরামত আলী
গ্রাম   চৌগাছা, ডাক   পাটকেলঘাটা
থানা : তালা, জেলা   সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১০৯

ডা: শেখ মাহফুজুল হক
পিতা : শেখ নূর আলি মাষ্টার
নাহার ক্লিনিক, নতুন রাস্তা
সোনাডাঙ্গা, খুলনা সদর
খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং-০১১০

এম. শাহ আলম
পিতা   মোবারক আলী হাওলাদার
গ্রাম + ডাক : তুলিগাতী
থানা   মোড়লগঞ্জ, জেলা : বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০১১১

শেখ মোহর আলি
পিতা   মৃত শেখ ছাকাওয়াত আলি
গ্রাম +ডাক   হায়বাতপুর
থানা   শ্যামনগর, জেলা   সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১১২

হারুনর রশীদ
পিতা আহমদ ইসলাম শিকদার
গ্রাম + ডাক : রাজাপুর
জেলা : বরিশাল
নৌ-কমান্ডো নং-০১১৩

রবীন্দ্রনাথ মন্ডল
পিতা দেবেন্দ্র নাথ মন্ডল
গ্রাম : খলিশা বুনিয়া, ডাক গাবুরা
থানা : শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১১৪

জি.এম.আ: রহিম
পিতা গাজী মোঃ ছাকিমউদ্দিন
গ্রাম +ডাক : নকীপুর
থানা : শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১১৫

সুশীল কুমার মন্ডল
পিতা মৃত দূর্গাপদ মন্ডল
গ্রাম+ডাক জোড়শিং
থানা : কয়রা, জেলা : খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং-০১১৬

জি.এম. মুস্তাফিজুর রহমান
পিতা মুছা গাজী
গ্রাম + ডাক পাতাখালি
থানা : শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১১৭

আবু নেছার ছিদ্দিক
পিতা হারুনর রশীদ সরদার
গ্রাম +ডাক পাতাখালি
থানা শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১১৮

মোঃ শমশের আলী
পিতা মৃত খোশলাল সরদার
গ্রাম : মিরগীডাঙ্গা, ডাক ঘোনা
জেলা : সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১১৯

প্রফুল্ল কুমার মিস্ত্রী
পিতা অন্নদা মিস্ত্রী
গ্রাম +ডাক দিগরাজ
থানা মংলা, জেলা : বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০১২০

রাম প্রসাদ সরকার
পিতা সতীশ চন্দ্র সরকার
গ্রাম গবিন্দকাঠী, ডাক বিষ্ণুপুর
থানা : কালীগঞ্জ, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১২১

আতাহারউদ্দিন তালুকদার
পিতা আফছার উদ্দিন তালুকদার
গ্রাম বটকাজল, ডাক নগরেরহাট
থানা বাউফল, জেলা পটুয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০১২২

আবুল ফয়েজ
পিতা : আব্দুল মজিদ
গ্রাম +ডাক সাতমোড়া
থানা নবীনগর, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
নৌ-কমান্ডো নং-০১২৩

শাহ্জাহান সিদ্দিকী বীরবিক্রম
পিতা আব্দুর রাজ্জাক মাস্টার
শাশত, বাড়ী নং-১১
সড়ক-১০, সেক্টর ০৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০১২৪

আ: সাত্তার
গ্রাম মহব্বত আলী তালুকদার
গ্রাম +ডাক নকীপুর
থানা শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১২৫

আব্দুল ওয়াহিদ
পিতা সিরাজ আলী
গ্রাম : চান্দালা
ডাক চান্দালা বাজার
জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১২৬

আবু তাহের
পিতা মোখলেসুর রহমান
গ্রাম ভোগাবেটিপুর
ডাক জোরারগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০১২৭

মোঃ শফিউল্লাহ
পিতা আঃ রব পাটওয়ারী
গ্রাম চরহাজারি, ডাক আবুমাঝিরহাট
থানা কোম্পানীগঞ্জ, জেলা নোয়াখালি
নৌ-কমান্ডো নং-০১২৮

এ.এইচ. এম. জিলানী চৌধুরী
পিতা বুজরুচ আলম চৌধুরী
গ্রাম + ডাক মোবারক ঘোনা
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১২৯

আবুল বাশার
পিতা মোখলেছুর রহমান
গ্রাম +ডাক পরাগালপুর
থানা জোরারগঞ্জ, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৩০

সালেহ আহমেদ
পিতা আলী ইউছুফ (হাবি:)
গ্রাম +ডাক পরাপলপুর
থানা মিরশ্বরাই, জেলা : চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৩১

শেখ আঃ কাদের
পিতা মোঃ ইব্রাহিম শেখ
গ্রাম বাজুয়াগড়, ডাক রতনপুর
থানা কালিগঞ্জ, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৩২

মোহাম্মদ আলী
পিতা আঃ রাজ্জাক মোল্লা (মৃত)
গ্রাম+ডাক মায়ারদিয়া
থানা : নগরকান্দা, জেলা ফরিদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৩৩

এম.এ. কাশেম
পিতা গোলাম নবী ফকির
গ্রাম খারাবাদ, ডাক : কাশিয়ানী
জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০১৩৪

নূরুল ইসলাম
পিতা মৃত গহর আলী মোল্লা
গ্রাম +ডাক : নকীপুর
থানা শ্যামনগর, জেলা : সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৩৫

দিলীপ কুমার রায়
পিতা মৃত মনীন্দ্র নাথ রায়
গ্রাম লস্কর, ডাক পাইকগাছা
জেলা খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৩৬

গবীন্দ কুমার সানা
পিতা : রতনচন্দ্র সানা
গ্রাম শীবহাটি
জেলা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৩৭

শফিক আহ্‌মেদ
পিতা রইসউদ্দিন আহ্‌মদ
গ্রাম +ডাক ধুলিহর
জেলা : সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৩৮

জয়নাল আবেদীন (মৃত)
পিতা : সিরাজউদ্দিন সরদার
গ্রাম শ্রীমন্তকাঠী
ডাক আঠুলিয়া বাজার,
থানা তালা, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৩৯

শাহজাহান আলম
পিতা : মৃত পাচু সরদার
গ্রাম দোহার, পো আটুলিয়া বাজার
থানা তালা, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৪০

রমেন্দ্র নাথ সরকার
পিতা : বলাই কৃষ্ণ সরকার
গ্রাম + ডাক গোবিন্দকাঠী
থানা কালিগঞ্জ, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৪১

সামসুর রহমান
পিতা মোঃ হায়দার আলি সরদার
গ্রাম সাতপাকিয়া
ডাক আটুলিয়া বাজার
থানা তালা, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৪২

শহীদ রফিকুর ইসলাম
পিতা মৌলনা জালাল উদ্দিন
গ্রাম পশ্চিম রাধাসার
ডাক : শ্রীপুর বাজার
থানা : হাজীগঞ্জ, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৪৪

এম. এ. বশর প্রকৌশলী
পিতা মরহুম হাজী মোঃ সামছুল হক
গ্রাম ধূম, ডাক মহাজনহাট
থানা : মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
৫/৬, সি এন্ড বি অফিসার্স কোয়াটার
এস.ই'র বাংলা, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৪৫

মাহবুবুল আলম
পিতা রহিমউল্লা
গ্রাম নেহেরপুর, ডাক মহাজনহাট
থানা : মীরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৪৬

আব্দুর রশিদ
পিতা আব্দুল ওয়াহাব
গ্রাম +ডাক নিকুঞ্জপুর
থানা ফাজিলপুর, জেলা নোয়াখারি
নৌ-কমান্ডো নং-০১৪৭

মজহারউল্লা বীর উত্তম
পিতা মৌঃ মোঃ আজম
গ্রাম ভালুকিয়া, ডাক করেরহাট
থানা মীরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৪৮

বশীর উল্লাহ
পিতা : হাজী বাদশা মিয়া
গ্রাম উত্তর আন্ধার মানিক, ডাক
নিজপানুয়া
থানা ছাগলনাইয়া, জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০১৪৯

সেলিম বাঙালী
পিতা ইয়াকুব আলী
গ্রাম মাইনি, ডাক আবু তোরাব
থানা : মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৫০

তৌহিদুল আনোয়ার
পিতা শফিকুর রহমান
গ্রাম : জগতপুর, ডাক মুন্সিরহাট
জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০১৫১

জামাল উল্লাহ
পিতা শাফা উল্লাহ
গ্রাম মালিয়াইশ, ডাক সুফিয়া মাদ্রাসা
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৫২

খোরশেদ আলম বীর প্রতীক
পিতা হাজী মোঃ ছাদত আলী
ছুফিয়া মঞ্জিল
১০২৯ জাকির হোসেন সড়ক
পূর্ব নাছিরাবাদ, চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৫৩

অনিল বরণ রায়
পিতা মনোরঞ্জন রায়
গ্রাম ৮৫ চট্টেশ্বরী রোড
ডাক চকবাজার
জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৫৪

এমদাদ হোসেন মতিন
পিতা শফিউল্লাহ
৭০৬ শহীদবাগ
রাজারবাগ, ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৫৫

বদিউল আলম শাহ
পিতা হাজী বজল আহম্মদ শাহ্
নাজ ফটোস্ট্যাট সার্ভিস
নাজিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৫৬

দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৫৭

ড: আলাউদ্দিন আহমেদ
পিতা ওসমান গণি সরদার
গ্রাম + ডাক : বুরুদিয়া
জেলা কিশোরগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০১৫৮

রশিদ আহমেদ
পিতা মৃত গুনু মিয়া সওদাগর
গ্রাম নারানগিরিমুখ
ডাক রাইখালী বাজার
থানা চন্দ্রঘোনা, জেলা রাঙ্গামাটি
নৌ-কমান্ডো নং-০১৫৯

মারফত আলি
পিতা ফরিজউদ্দিন বকাউল
গ্রাম তেলা মাসুয়া খাল, ডাক খিদিরপুর
থানা মতলব, জেলা : চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৬০

এম.এ. আজিজ খান
পিতা মৃত আলেফ খান
গ্রাম কালী মোহন পালের বাড়ি
ডাক নতুন বাজার, জেলা : চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৬১

তোফায়েল আহমদ (মৃত)
পিতা : ফজলুল হক
গ্রাম পশ্চিম লক্ষ্মিপুর
ডাক : দালাল বাজার
জেলা লক্ষ্মীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৬২

নজরুল ইসলাম
পিতা : মৃত এয়াকুব আলি
গ্রাম : খিলমোহর, ডাক পালামোহর
থানা : কচুয়া, জেলা : চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৬৪

আমীর হোসেন
পিতা : চাদবকস (মৃত)
গ্রাম : হাশিমপুর, ডাক এখলাসপুর,
থানা : মতলব, জেলা চাঁদপুর
নৌ-নৌ-কমান্ডো নং-০১৬৫

আব্দুল মালেক
পিতা আফতাব উদ্দিন বাকুয়াইল
গ্রাম : বড়নওপাড়া
ডাক লৌহজং
জেলা মুন্সিগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০১৬৬

সিরাজুল ইসলাম
পিতা মৃত মোঃ মফিজদ্দিন বেপারী
গ্রাম +ডাক মাঝিগাছা
থানা : কচুয়া, জেলা : চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৬৭

শহীদ হোসেন (মৃত)
পিতা আলতাফ হোসেন
গ্রাম সান্রা, ডাক পাঁচচাই
থানা হাজিগঞ্জ, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৬৮

এম. শাজুদ্দিন
পিতা এ. গনি প্রধান
গ্রাম : হাইদনকান্দী, ডাক ইসলামাবাদ
থানা গৌরীপুর, জেলা : কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৬৯

সৈয়দ আকরাম
পিতা ডাঃ সৈয়দ আঃ করিম
গ্রাম : নাটিঙ্গী, ডাক দোল্লাই নবাবপুর
থানা চান্দিনা, জেলা : কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৭০

ফজলুল কবির
পিতা : নূর মহম্মদ
গ্রাম : জয়নগর, ডাক শাহরাস্তি
জেলা : চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৭১

মোরশেদ আলম
পিতা এম.এ. সামাদ সরকার
গ্রাম সুন্দুলপুর, ডাক দাউদকান্দী
জেলা : কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৭২

আবুল হুসেন
পিতা এম. এ. বারিক মৃত
গ্রাম + ডাক : রাজা মেহের
থানা দেবীদ্বার, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৭৩

সামসদ্দিন আহমদ সামু (মৃত)
পিতা মাহবুবুর রহমান
৩২৯ হাজী মহসীন রোড
নতুনবাজার আলিমপাড়া
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৭৪

এ. কাদের
পিতা মৃত এ. সোবহান
গ্রাম +ডাক : কংসনগর
থানা দেবীদ্বার, জেলা : কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৭৫

এম.এ. মজিদ
পিতা ইসহাক হাওলাদার
গ্রাম+ডাক : সেলিমপুর
থানা মুলাদী, জেলা বরিশাল
নৌ-কমান্ডো নং-০১৭৬

মাহমুদ আলম
পিতা আঃ হক চৌধুরী
গ্রাম+ডাক : উলানিয়া
থানা পথেরহাট, জেলা বরিশাল
নৌ-কমান্ডো নং-০১৭৭

শহীদ এ. সামাদ
পিতা আব্দুল গফুর (মৃত)
গ্রাম দাউদকান্দি
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৭৮

এ. সামাদ তালুকদার (শিক্ষক)
পিতা মোঃ ইসমাইল তালুকদার
গ্রাম স্বর্ণঘোষ, ডাক ধানুকা
থানা পালং, জেলা শরীয়তপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৭৯

আজিজ হোসেন মীর
পিতা মৃত মীর মোঃ আঃ ওহাব
গ্রাম বাহের কুশিয়া, ডাক ঘড়ীসার
থানা : নড়িয়া, জেলা শরীয়তপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৮০

আবু তাহের খন্দকার (ড্রাফটসম্যান)
পিতা নূরুল হক খন্দকার
ঢাকা ওয়াশা, ওয়াশা ভবন
কাওরানবাজার, ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৮১

মনিরুল ইসলাম
পিতা মোঃ এ. মান্নান
গ্রাম বাজগোদা
ডাক +জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৮২

আবুল হাশেম
পিতা মৃত মোঃ সুন্দর আলী
গ্রাম বেলাশহর, ডাক চান্দিনা
জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৮৪

মোজাম্মেল হক
পিতা এ.কে.এম. ফজলুল হক
গ্রাম : পান্টি, ডাক গান্ধ্রা
(পাকিস্তান বাজার)
থানা মুরাদনগর, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৮৫

আব্দুল হাকিম
পিতা মৃত ইয়াকুব আলী মোল্যা
গ্রাম +ডাক এখলাসপুর
থানা মতলব (উত্তর), জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৮৬

ফজলুর রহমান (ফজলু)
পিতা এম. এ. কাদের
গ্রাম চরকুমারিয়া, ডাক সাতানী
থানা দাউদকান্দী, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৮৭

জহুরুল ইসলাম
পিতা : মরহুম নূর মোহাম্মদ হাওলাদার
২৩/১ পশ্চিম রামপুরা
ওমর আলী লেন, ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৮৮

জয়নাল আবেদীন
পিতা মোঃ আব্বাস আলী
গ্রাম সরসতিরচর, ডাক সাতআনি
থানা দাউদকান্দি, জেলা : কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৮৯

খন্দকার রুহুল আমিন
পিতা খঃ কফিলউদ্দিন
গ্রাম শিবপুর, ডাক : দশপাড়া
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৯০

বাচ্চু পাটওয়ারী
পিতা সামসুল হক পাটওয়ারী
গ্রাম : বাখরপুর
ডাক +জেলা : চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৯১

এনামুল হক
পিতা মোঃ জমিরউদ্দিন খলিফা
গ্রাম : বাহেরচর, ডাক মজিতপুর
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৯২

শফিকুল ইসলাম
পিতা মৃত মোজাফফর আলী প্রধান
গ্রাম চরলক্ষীপুর, ডাক মতলব
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৯৩

এম.এ. রাজ্জাক
পিতা ইয়াকুব আলী
গ্রাম দাসাদী, ডাক সফরমালী
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৯৪

মনীর হোসেন
পিতা আঃ করিম বক্‌স
গ্রাম লটবদী
ডাক পাঁচআনি, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৯৫

মেসবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
পিতা মমতাজ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী
গ্রাম খলিলাবাদ, ডাক নারানদিয়া
থানা : দাউদকান্দি, জেলা : কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০১৯৬

এম. মহিবউল্লাহ
পিতা : আব্দুস করিম
গ্রাম দক্ষিণ মেখল, ডাক পূর্ব মেখল
থানা হাটহাজারী, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৯৭

কামাল আহমেদ
পিতা মৌ: সৈয়দ আহমদ
গ্রাম সাউথ মেখাল, ডাক : ঘরদুয়ারা
থানা হাটহাজারী, জেলা : চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০১৯৮

শাখাওয়াত হোসেন (শওকত)
পিতা বন্দে আলী পাটওয়ারী
গ্রাম+ডাক আশ্বিনপুর
থানা মতলব, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০১৯৯

বেল্লাল হোসেন মৃধা (শিক্ষক)
পিতা হাজী গোলাম কাদের মৃধা
গ্রাম +ডাক : আলিমাবাদ
থানা মুলাদী, জেলা : বরিশাল
নৌ-কমান্ডো নং-০২০০

আমিনুল হক
পিতা : তাজল মিয়া
গ্রাম এখলাসপুর, ডাক : এখলাছপুর
থানা মতলব, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২০১

মোরশেদ আলম
পিতা : নায়েব আলী ভূঁইয়া
গ্রাম মানিকগঞ্জ, ডাক ইসলামাবাদ
থানা ইলিয়টগঞ্জ, জেলা : কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২০২

শাহজাহান কবির
পিতা মৃত মোঃ ইব্রাহীম
১৩/এফ পূর্ব মাদারটেক
সিঙ্গাপুর রোড, বাসাবো,
সবুজবাগ, ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০২০৪

সামসুল কবীর
পিতা মোঃ ইব্রাহিম মাস্টার
গ্রাম দাশাদী, ডাক সফর মালি
থানা+ জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২০৫

এম.এ. কামাল (মৃত:)
পিতা : হাজী সুলতান আহমেদ
গ্রাম উত্তর মাদ্রাসা, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২০৬

মুন্নাফ পাটোয়ারী
পিতা মৃত আ: হোসেন পাটোয়ারী
গ্রাম +ডাক : দায়চারা
থানা ফরিদগঞ্জ, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২০৭

জি.এম. আইয়ুব
পিতা সাধু গাজী
লেক সার্কাস কোয়ার্টার
কলেজ অব নার্সিং মহা
নৌ-কমান্ডো নং-০২০৮

মহিউদ্দিন আহমেদ
পিতা আব্দুল মজিদ
গ্রাম +থানা চরভৈরব
থানা ভেদরগঞ্জ
জেলা শরিয়তপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২০৯

মাহবুবুর রহমান
পিতা : হাজী কেরামত আলী পাটওয়ারী
৪০/৪বি পূর্ব হাজীপাড়া
রামপুরা, ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০২১০

শফিকুর রহমান (মৃত)
পিতা জামাল উদ্দিন মিয়া
গ্রাম ছিরকা চাঁদপুর, ডাক নয়াহাট
থানা ফরিদগঞ্জ, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২১১

লুৎফর রহমান
পিতা এম.নূর খান (মৃত)
গ্রাম চাঁদপুর, ডাক নয়াহাট
থানা ফরিদগঞ্জ, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২১২

এস.এ. মজুমদার
পিতা : মৃত করিম বক্স মজুমদার
গ্রাম উচ্চঙ্গা, ডাক বলাখাল
থানা হাজিগঞ্জ, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২১৩

আশরাফুল হক
পিতা আসগর আলী
গ্রাম বনশোভা, ডাক বনশোভা
জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২১৪

আবুল হাশেম (শহীদ)
পিতা এম. আলী মিয়া
গ্রাম শোন্দ্রম
ডাক +থানা জিয়াপুর
জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২১৫

ইলিয়াস খন্দকার
পিতা ইসহাক খন্দকার (মৃত)
গ্রাম +ডাক দৌলৎপুর
থানা ফাজিলপুর, জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০২১৬

আবুল হাশেম চৌধুরী (মৃত)
পিতা এ. মজিদ চৌধুরী
গ্রাম বনশোভা, ডাক কুমিল্লা সদর
জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২১৭

শান্তি মিয়া সরকার
পিতা আবু মিয়া সরকার
গ্রাম খলিলাবাদ, ডাক : নারানদিয়া
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২১৮

আমির হোসেন বীর প্রতীক
পিতা : দলিলুর রহমান
গ্রাম নৈরাজপুর, ডাক কে.এম. হাট
থানা ফাজিলপুর, জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০২১৯

কে.এম. মান্নান
পিতা আমজাদ আলি প্রধান
গ্রাম পাইকাস্তা, ডাক বাবুরহাট
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২২০

খোরশেদ আলম সরকার
পিতা ছায়েদ আলী সরকার
গ্রাম দিঘীড় পাড়, ডাক রায়পুর
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২২১

খায়রুল আনাম
পিতা সৈয়দুর রহমান
গ্রাম কিশোরগঞ্জ, ডাক বুড়িচং
জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২২২

নূরুল ইসলাম
পিতা আহম্মদ আলি
গ্রাম +ডাক: মহিচাইল
থানা চান্দিনা, জেলা কুমিল্লা
নৌ-বাহিনীর নং-০২২৪

আরব আলী সরকার
পিতা আছু সরকার
গ্রাম কাকিয়াখালী, ডাক মজিতপুর
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২২৫

সিদ্দিকুর রহমান (মৃত)
পিতা বন্দে আলী পাটোয়ারী
গ্রাম কল্যাণদী, ডাক সফরমালি
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২২৬

আব্দুল জলিল
পিতা শেখ রজব আলি
গ্রাম ভাড়ারিয়া
ডাক রাজা নগর, সিরাজদী খান
জেলা মুন্সিগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০২২৭

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
পিতা : আঃ হক চৌধুরী
গ্রাম : উ: আধার মানিক, ডাক : রাধানগর
থানা : ছাগলনাইয়া, জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০২২৮

আবুল হোসেন
পিতা মৌ: আহমদ উল্লা গাজী
৮৮৯/১ পূর্ব মনিপুর
মীরপুর, ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০২২৯

মতিউর রহমান বীর উত্তম (মৃত)
পিতা মৃত জয়নুদ্দিন ডক্টর
গ্রাম রঘুনাথপুর, ডাক ইসলামাবাদ
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৩০

শাহ আলম মোহাম্মদ
পিতা এ. খালেক সরকার
গ্রাম খলিলাবাদ, ডাক নারানদিয়া
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৩১

আব্দুর রহমান
পিতা এম.এ. আজিজ
গ্রাম রঘুনাথপুর, ডাক ইসলামাবাদ
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৩২

সিকান্দার আলী
পিতা সামসুল হক খান
গ্রাম ছোট মারাদন, ডাক পথের বাজার
থানা মতলব বাজার, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৩৩

দীন ইসলাম
পিতা এম. আজিজুর রহমান
গ্রাম ১৭৮/৯, পশ্চিম রহমান
ডাক নারায়ণগঞ্জ, জেলা নারায়ণগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০২৩৪

আঃ রহিম
পিতা এম. হাফিজউদ্দিন
গ্রাম সামাইরকান্দি, ডাক : বাউসিয়া
থানা গজারিয়া, জেলা মুন্সিগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০২৩৫

আবুল হোসেন মল্লিক
পিতা নওয়া মিয়া মল্লিক
গ্রাম মল্লিককান্দি, ডাক সখিপুর
থানা ভেদরগঞ্জ, জেলা শরীয়তপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৩৬

আবুল কাশেম মিয়া
পিতা আঃ ছামাদ মিয়া
গ্রাম নন্দলালপুর, ডাক মতলব
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৩৭

নূর মোহাম্মদ
পিতা আফসার আলী
গ্রাম গৌরীপাশা, থানা : নলছিটি
জেলা ঝালকাঠি
নৌ-কমান্ডো নং-০২৩৮

সিরাজউদ্দিন (মৃত)
পিতা মোসলেমউদ্দিন
গ্রাম সাতবাড়িয়া, ডাক বালাখাল
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৩৯

বাদশা মিয়া
পিতা দুদমিয়া সরকার
গ্রাম রথের বাজার, ডাক মতলবগঞ্জ
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৪০

লুৎফর রহমান
পিতা মুখলেসুর রহমান
গ্রাম নৈরাজপুর, ডাক কে.এম.হাট
থানা ফাজিলপুর, জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০২৪১

দলিল উদ্দিন হাওলাদার
পিতা ওফাজউদ্দিন হাওলাদার
গ্রাম+ডাক : বিকারী
থানা উপাশী, জেলা শরিয়তপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৪২

হাবিবুর রহমান
পিতা আলহাজ লুৎফুল কবির
গ্রাম ছান্দ্রা, ডাক রায়পুর
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৪৩

ওয়াহিদুল ইসলাম
পিতা আব্দুল মতিন প্রধান
গ্রাম পূর্ব রাজারগাঁও
ডাক পূর্ব রাজারগাঁও বাজার
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৪৪

মোস্তাক আহমেদ ফকির (মৃত)
পিতা : ছৈয়দ আলি ফকির
গ্রাম সিঙ্গলা দিঘীর পাড়
ডাক রায়পুর, থানা দাউদকান্দি
জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৪৫

নূরুল হক
পিতা : কাজী মাহবুব হোসেন
গ্রাম ম্যারীনবাট, ডাক বাহাদুর পুর
থানা শীবচর, জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৪৬

বোরহান উদ্দিন আহমেদ এ.জি.এম
পিতা এরফানউদ্দিন আহমদ
ই/৫৫, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৪৭

নজরুল ইসলান
পিতা মোঃ ইউনুছ আলি
গ্রাম পদ্মারপাড়, ডাক : পাঠানবাজার
থানা মতলব, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৪৮

সেলিমউল্লা খাঁন
পিতা মোঃ আলম খান (মৃত)
গ্রাম ৬/৩/এ মুগদা পাড়া
বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
নৌ-কমান্ডো নং-০২৪৯

আলী আজম
পিতা সেকেন্দার আলী
গ্রাম : কলঘরা, ডাক : কলঘরা
জেলা ; চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৫০

আবু মূসা চৌধুরী
পিতা সুলত আহমদ চৌধুরী
গ্রাম হাইদচাকিয়া, ডাক : বিন্দাবনহাট
থানা ফটিকছড়ি, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৫১

নূরুল ইসলাম চৌধুরী
পিতা আলী নায়াজ চৌধুরী
গ্রাম গইজহাট, ডাক নতুনবাজার
জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০২৫২

আকরাম হোসেন
পিতা ইসহাক সরদার
গ্রাম সাতপাকিয়া, ডাক আটুলিয়া বাজার
থানা তালা, জেলা সাতক্ষীরা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৫৩

সালাহউদ্দিন আহমেদ বীর উত্তম (মৃত)
পিতা মৌ : ছাইদউদ্দিন আহ্‌মেদ
গ্রাম পাথালিয়া, ডাক বাবুরহাট
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৫৪

আনোয়ার মিয়া
পিতা ঠান্ডু মিয়া
গ্রাম দক্ষিণ মিখাল, ডাক ঘরদোয়ার
থানা হাটহাজারী, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৫৫

নূরুল হক বীর প্রতীক
পিতা : মৌ সামছুল হক
গ্রাম চাঁদগাঁও, ডাক চকবাজার
জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৫৬

হেলাল উদ্দিন আহ্‌মেদ
পিতা নূরুল ইসলাম
গ্রাম সোনাপুর, ডাক মতিগঞ্জ
জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০২৫৭

খোরশেদ আলম
পিতা ওয়ালিউল্ল্যা
গ্রাম সূচীপাড়া, থানা শাহরাস্তি
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৫৮

মনোজ কুমার দত্ত
পিতা ধীরন্দ্রে কুমার দত্ত
গ্রাম ধূম, ডাক মহাজনহাট
থানা মিয়শরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৫৯

এস.এন. মাওলা বীর প্রতীক (মৃত)
পিতা ডা: এন.এম. মাওলা
গ্রাম দক্ষিণ রাঙ্গামাটি
ডাক ফটিকছড়ি, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৬০

আফাজ উদ্দিন
পিতা আম্বর আলী
গ্রাম কৃষ্ণপুর, ডাক স্বরসতী
থানা মোড়লগঞ্জ, জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০২৬১

জসিম উদ্দিন
পিতা : মুলকাতুর রহমান
গ্রাম পঃ বশিকপুর, ডাক পূর্ব বশিকপুর
থানা +জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০২৬২

আব্দুল মালেক শেখ
পিতা ডেঙ্গর শেখ
গ্রাম দেবগ্রাম, ডাক : আখাউড়া
থানা আখাউড়া,, জেলা : ব্রাহ্মবাড়িয়া
নৌ-কমান্ডো নং-০২৬৩

রুহুল আমিন
পিতা মৃত মোঃ খলিলুর রহমান
গ্রাম রোয়ালীয়া, ডাক রূপসা
থানা ফরিদগঞ্জ, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৬৪

শফিকুর রহমান
পিতা হাজী মোঃ সরু মিয়া
গ্রাম গোবিন্দপুর, ডাক পীরযাত্রাপুর
থানা : বুড়িচং, জেলা : কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৬৫

আব্দুল কাদের
পিতা মৃত কালা মিয়া
গ্রাম চিকনছড়া, ডাক : চিকনছড়া বাজার
থানা ফটিকছড়ি, জেলা : চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৬৬

নূরুল ইসলাম চৌধুরী
পিতা এম.এ. চৌধুরী
গ্রাম নর্থ মুসাদিয়া, ডাক আবু তোরাব
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৬৭

এনাম উদ্দিন
পিতা রহিমউল্লা
গ্রাম : জামালপুর, ডাক মহাজনহাট
থানা জোরারগঞ্জ, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৬৮

মোয়াজ্জেম হোসেন
পিতা মৃত জমিরউদ্দিন আহমেদ
গ্রাম পোড়াকান্দি, ডাক জাহাপুর
জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৬৯

ছাদেক হোসেন
পিতা সেকান্দার আহম্মদ ভূঁইয়া
গ্রাম জগতপুর, ডাক নতুন মুন্সিরহাট
থানা : ফুলগাজী, জেলা ফেনী
নৌ-বাহিনীর নং-০২৭০

মজিবুল হক
পিতা মাহবুবুর রহমান
গ্রাম : লাঙ্গলমোড়া, ডাক দৌলৎপুর
থানা : ফাজিলপুর, জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০২৭১

মাহবুবুল আলম
পিতা সৈয়দ সামছুল হক
গ্রাম পাঁচজোড়, ডাক করেরহাট
জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৭২

বিজয় কৃষ্ণ সরকার
পিতা কালিপদ সরকার
গ্রাম :+ডাক: মহেশ্বর পাশা
থানা দৌলতপুর, জেলা খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৭৩

গিয়াস উদ্দিন
পিতা নূরুল হুদা
গ্রাম দক্ষিণ সুন্দরপুর
ডাক ফটিকছড়ি, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৭৪

কামরুল হুদা (প্রভাষক)
পিতা মৃত মোঃ খোরশেদ আলী
গ্রাম লোন অফিসপাড়া
ডাক আ. প্রচ রোড চৌরাস্তা
জেলা যশোর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৭৫

আবুল হাশেম
পিতা মোঃ আঃ জব্বার
গ্রাম পূর্ব ধলই, ডাক কাঠিরহাট
থানা হাটহাজারী, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৭৬

আব্দুর রশিদ মিয়া
পিতা মৃত আঃ আজিজ ভূঁইয়া
গ্রাম চরফতেজংপুর, ডাক ইব্রাহিমপুর
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৭৭

জয়নাল আবেদীন কাজল
পিতা নাদেরুজ্জামান
গ্রাম পরাগলপুর, ডাক মহাজনহাট
জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৭৮

আবু বক্কর সিদ্দিক
পিতা এ. বশর
৯৬৬, শেখ মুজিব রোড
এস.এস. এন্টারপ্রাইজ
আগ্রাবাগ, চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৭৯

সিরাজউদৌল্লা
পিতা আহমেদ সোবহান মিস্ত্রী
গ্রাম পাদুয়া, ডাক হাদির ফকিরহাট
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৮০

ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক
পিতা মনির আহমদ চৌধুরী
১৯ মেহেদীবাগ, চকবাজার
চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৮১

আবু বক্কর
পিতা আব্দুস সাত্তার
গ্রাম : নয়াগ্রাম, ডাক বিয়ানীবাজার
জেলা সিলেট
নৌ-কমান্ডো নং-০২৮২

নূরুল গনি
পিতা মৃত মোঃ ইলিয়াস মাস্টার
গ্রাম হাতিলোটা, ডাক বারবাকুন্ডু
জেলা : চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৮৩

নূরুল ইসলাম
পিতা এফ. করিম সরকার
গ্রাম পুরাকান্দি, ডাক : দাউদকান্দি
থানা জাহাপুর, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৮৪

মহিউদ্দিন
পিতা মনসুর আহমদ
গ্রাম পশ্চিম ইছাখালি, ডাক মাতবরহাট
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৮৫

সিরাজুল ইসলাম
পিতা গনি মিয়া প্রধান
গ্রাম আসিরাবাদ, ডাক গবিন্দপুর
থানা হোমনা, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৮৬

গোলাম কুদ্দুস মজুমদার
পিতা নূরুল হুদা মজুমদার
গ্রাম জগতপুর, ডাক নূতন মুনসীর হাট
থানা ফুলগাজী, জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০২৮৭

সেলিমউল্লা ভূঁইয়া
পিতা আব্দুল্লা ভূইয়া মৃত
লাঙ্গলমোড়া, দৌলতপুর
ফাজিলপুর, ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০২৮৮

আলমগীর হোসেন
পিতা জালালউদ্দিন জমাদার
গ্রাম লক্ষীগঞ্জ, ডাক লক্ষীগঞ্জ সদর
জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০২৮৯

শহীদ মোহাম্মদ হোসেন বিপি
পিতা আহমেদ মিয়া
গ্রাম ঢালাই, ডাক কাঠিরহাট
জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৯০

ওবায়দুল হক
পিতা মোজাফফর আহমদ
গ্রাম জামালপুর, ডাক শান্তিরহাট
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৯১

খায়রুল বাশার
পিতা সালেহ আহমদ
গ্রাম রাঙ্গামাটি, ডাক ফটিকছড়ি
জেলা পাবর্ত্য জেলা
নৌ-কমান্ডো নং-০২৯২

শফিউল এনাম
পিতা সুলতান আহমেদ
গ্রাম: ফরহাবাদ, ডাক নূর আলি মিয়া হাট
থানা নাজিরহাট, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৯৩

এম. ওয়াহিদ মিয়া
পিতা আয়েনউদ্দিন
গ্রাম হিওনিপাড়া, ডাক বড়ভাসালিয়া
থানা আবিনগাঁও, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৯৪

এম. লোকমান
পিতা এম. ইসাহাক
গ্রাম পূর্ব ঢালাই, ডাক কাটিরহাট
থানা নাজিরহাট, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০২৯৫

মমিনউল্লা পাটওয়ারী বিপি
পিতা এম. ইসহাক
গ্রাম +ডাক: মইশাদী
থানা চাঁদপুর, জেলা চাঁদপুর
নৌ-বাহিনীর নং-০২৯৬

রেজাউল করিম
পিতা বজলুল করিম
গ্রাম পাঁচবাড়িয়া, ডাক পাঁচবাড়িয়া
থানা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০২৯৯

এ. কাশেম
পিতা সোনা মিয়া
গ্রাম বড় ইব্রাহিমপুর, ডাক বাবুপুর
থানা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩০০

ফজলুল করিম
পিতা মিছির আলি প্রধান
গ্রাম প্রতাবেরচর, ডাক : বড়ানগর
(বৈদ্যের বাজার)
থানা সোনারগাঁও, জেলা নারায়ণগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৩০১

এমদাদুল হক
পিতা মোঃ ওয়াহিলউল্লাহ
গ্রাম +ডাক: দেওটি
থানা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩০২

খোরশেদ আলম
পিতা শহীদ কালা মিয়া
গ্রাম রছুলপুর, ডাক পাটারীবাড়ী
থানা রামগঞ্জ, জেলা লক্ষীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩০৩

রফিকউল্লা ভূঁইয়া
পিতা আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া
গ্রাম +ডাক খালিশ পাড়া
থানা চাটখিল, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩০৪

এম. ইসহাক ভূঁইয়া
পিতা মোঃ মঞ্চু ভূঁইয়া
বাসা নং ৩২/৮ নৌবাহিনী কলোনী-২
বন্দরটিলা, চট্রগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩০৫

মোশাররফ হোসেন
পিতা মুজিবুল হক
গ্রাম মজিদপুর, ডাক : আতিয়ায়পুর
থানা চৌদ্দগ্রাম, জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩০৬

এম. সেলিম ভূইয়া
পিতা মৃত অলিউল্লা ভূইয়া
গ্রাম নিয়াজপুর, ডাক : মিররপাড়া
থানা বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালি
নৌ-কমান্ডো নং-০৩০৭

মজিবুল হক
পিতা আব্দুল আজিজ
গ্রাম পরী, ডাক : নিয়ামত
থানা রামগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩০৮

এ. এস.এম. মোস্তফা
পিতা আহমেদউল্লা পণ্ডিত
গ্রাম ডাক+থানা চাটখিল
জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩০৯

আবুল বাশার (মৃত)
পিতা : আব্দুল হাকিম
গ্রাম লালপুর, ডাক মীর আলীপুর
ডাক বেগমগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩১০

আবুল বাশার
পিতা আবু বক্কর সিদ্দিক
গ্রাম + ডাক : কালিকাপুর
থানা চৌমুহনী, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩১১

এম. সাবির উল্লাহ
পিতা করিম বক্স মোল্লা
গ্রাম দেলিয়াই, ডাক দেলিয়াই
থানা চাটখিল, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩১২

ডি.কে. ভৌমিক (মৃত)
পিতা মোহিনী মোহন ভৌমিক
গ্রাম কালিয়াকান্দী, ডাক : বিজবাগ
থানা সেনবাগ, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩১৩

আলী হোসেন ভূঞা
পিতা আঃ রশিদ ভূঞা
গ্রাম অমরপুর , ডাক : শ্রীপুর
থানা চাটখিল, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩১৪

আব্দুল কাদের
পিতা আব্দুল মালেক
গ্রাম সিমরাইল, ডাক : সিমরাইল
থানা : কসবা, জেলা বি-বাড়িয়া
নৌ-কমান্ডো নং-০৩১৫

আব্দুর রাজ্জাক হাজী
পিতা আঃ ছালাম
গ্রাম মধ্যম করিমপুর, ডাক সোনাপুর
ডাক সুধারাম, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩১৬

আতিকুর রহমান
পিতা মুজিবুর রহমান
গ্রাম শ্রীপুর, ডাক সোনাপুর
জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩১৭

কামাল উদ্দিন
পিতা নাদির হোসেন
গ্রাম : কামালপুর, ডাক : মোহনপুর
থানা : মতলব, জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩১৮

দেওয়ান শাহজাহান
পিতা ইয়াকুব হোসেন
গ্রাম মগরা, ডাক বৈদ্যেরকুল
থানা +জেলা মুন্সীগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৩১৯

হাবিবউল্লা বাহার
পিতা হাজী সামসুল হক
গ্রাম : নলচর, ডাক : চন্দনপুর
থানা হোমনা, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০৩২০

আব্দুল মতিন
পিতা মৃত আহমদউল্যা বেপারী
গ্রাম বিষ্ণুপুর, ডাক ভাট্‌রা
থানা রামগঞ্জ, জেলা লক্ষীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩২১

ফারুক আহমেদ
পিতা আঃ আজিজ মাস্টার
গ্রাম চারিপাড়া, ডাক ভাগ্যকুল
থানা : শ্রীনগর, জেলা মুন্সিগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৩২২

হাবিবুর রহমান
পিতা এ. রউফ, গ্রাম রঘুনাথপুর
ডাক কাশিপুর, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০৩২৩

চৌঃ মোঃ আমির আলী
পিতা সুজন মিয়া চৌধুরী
গ্রাম মাথাভাঙ্গা, ডাক ছয়ফুল্লাকান্দি
থানা হোমনা, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০৩২৪

আবুল হোসেন দেওয়ান
পিতা দেওয়ান আলী
গ্রাম নিচিন্তপুর, ডাক সোন্দাল
থানা নাথেরপেটুয়া, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০৩২৫

আব্দুল খালেক
পিতা শির মিয়া মোল্লা
গ্রাম + ডাক পাটলিয়াকান্দি
থানা হোমনা, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০৩২৬

দারু মিয়া
পিতা চাঁদ মিয়া
গ্রাম সামন্তগড়, ডাক মাগাউড়া
থানা নবীনগর, জেলা কুমিল্লা
নৌ-বাহিনীর নং-০৩২৭

এ. ওয়াহাব
পিতা নাজির আহমদ
গ্রাম +ডাক কালিয়াপুর
থানা চৌমুহনী, জেলা নোয়াখালী
নৌ-বাহিনীর নং-০৩২৮

এনামুল হক
পিতা এ বাশার চৌধুরী
গ্রাম দূর্গাপুর, ডাক কারিয়াবাজার
থানা ফাজিলপুর, জেলা ফেনী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩২৯

নূরুল আলম
পিতা এ. করিম চৌধুরী
গ্রাম + ডাক শীতলপুর
থানা সীতাকুন্ড, জেলা: চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৩০

প্রফুল্ল কুমার দাস
পিতা দীনবন্ধু দাস
গ্রাম জয়নগর, ডাক আবুরহাট
জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৩১

নূর হোসেন
পিতা মকবুল আহমদ সওদাগর
গ্রাম ধূম, ডাক মহাজনহাট
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৩২

এমদাদুল হক
পিতা ওবায়দুল হক
গ্রাম আম্বিয়া, ডাক মিরশ্বরাই
জেলা : চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৩৩

জয়নাল আবেদিন চৌধুরী
পিতা : আজিজুর রহমান চৌধুরী
গ্রাম উত্তর ইছাখালী, ডাক আবুরহাট
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৩৪

এ.কে.এম. শাহ আলম
পিতা এ. রহমান শুকানী
গ্রাম কুচিমোড়া, ডাক বরইয়া
থানা সন্দীপ, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৩৫

মোহাম্মদ হোসেন
পিতা মৌলভী ইয়াকুব
গ্রাম হারামিয়া, ডাক বৈদ্যেরহাট
থানা সন্দ্বীপ, জেলা : চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৩৬

রেজাউল করিম চৌধুরী
পিতা মজিবুল হক চৌধুরী
গ্রাম বামনসুন্দর, ডাক দারগারহাট
থানা : মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৩৭

এম. ফোরকান
পিতা মুছা মিয়া
গ্রাম হারামিয়া, ডাক বকতারহাট
থানা সন্দ্বীপ, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৩৮

খায়রুল আলম চৌধুরী
পিতা মজিবুল হক চৌধুরী
গ্রাম বামনসুন্দর, ডাক: দারগারহাট
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৩৯

ইউসুফ শিকদার
পিতা মৃত মজিবুল হক
গ্রাম সাতঘরিয়া
ডাক+থানা শীবেরহাট
জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৪০

মহিউদ্দিন আহমেদ
পিতা মকবুল আহ্মেদ
গ্রাম জালিয়াল, ডাক পাক কিশোরগঞ্জ
থানা সুধারাম, জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৪১

এম. কামাল
পিতা মোঃ আবুল হোসেন
গ্রাম তুলাতলি, ডাক ভাটিয়ারী
থানা সীতাকুণ্ড, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৪২

এ. হক (মৃত)
পিতা নাদেরুজ্জামান
গ্রাম বামী পাঠারীর বাড়ি
ডাক টি.এম. বাজার
থানা সন্দ্বীপ, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৪৩

ফয়সুল আলম
পিতা সালামতউল্লা
গ্রাম কাচিয়াপুর, ডাক : পি.এম. বাজার
থানা সন্দ্বীপ, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৪৪

এম.এ. বাশার
পিতা মোঃ ইদ্রিস
গ্রাম কাছিয়াপার, ডাক : টি.এম. বাজার
থানা সন্দ্বীপ, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৪৫

জহুর আহমেদ
পিতা বাদশা মিয়া
গ্রাম + ডাক রসুনগিরী
থানা মগেরহাট, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৪৬

এম. হুসেন ভূঁইয়া
পিতা : সুলতান আহমদ ভূইয়া
গ্রাম উত্তর আম্বিয়া, ডাক মিরশ্বরাই
জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৪৭

মোঃ নূরুননবী
পিতা মৃত জাহুরুল হক
গ্রাম +ডাক বালিয়াদী
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৪৮

এ. খায়ের ভূইয়া
পিতা সরু ভূইয়া
গ্রাম জানারুথারপুর, ডাক তামুহনী
থানা জোরারগঞ্জ, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৪৯

জবল হুসেন
পিতা এ.হক
গ্রাম হিটকান্দি, ডাক কাজির হাট
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৫০

আহমেদুর রহমান
পিতা নূর আহাম্মদ
গ্রাম বামনসুন্দর
ডাক দারোগারহাট
জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৫১

বিজয় কুমার দাশ
পিতা প্রকাশ চন্দ্র দাশ
গ্রাম নাহেরপুর, ডাক মহাজনহাট
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৫২

এম. ইউনুস
পিতা নূর আহমেদ
গ্রাম পাতাকুট, ডাক আজমপুর
থানা জোরারগঞ্জ, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৫৩

এম. ইকবাল
পিতা গোলাম মোস্তফা
গ্রাম সাহাপুর, ডাক আজমপুর
থানা জোরারগঞ্জ, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৫৪

মানিক চন্দ্র দাশ
পিতা বিপিন চন্দ্র দাশ
গ্রাম মগাদিয়া, ডাক আবু তোরাব
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৫৫

মাহমুদুল হক
পিতা এ.হক (মৃত)
গ্রাম হারনি, ডাক হাতিয়া টাউন
জেলা নোয়াখালী
নৌ-কমান্ডো -০৩৫৬

শাহজাহান মিঞা
পিতা মৃত মনির আহমদ
গ্রাম বাড়িয়াখালী, ডাক দারোগারহাট
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৫৭

গোপাল চন্দ্র দাশ
পিতা পান্নানন্দ দাশ
গ্রাম হান্দিগ্রাম, ডাক সূতা কমলদহ
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৫৮

খয়বর আলী
পিতা চটকু মাসুদ
গ্রাম সিতাই ঝাড়, ডাক পাঁচগাছী
জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৫৯

এন. মামনুল ইলাহী
পিতা আশরাফুল আলম
গ্রাম মৌলাপাড়া, জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৬০

শশী ভূষণ রায়
পিতা : ঝাপুড়া রাম রায়
গ্রাম সোমনারায়ণ, ডাক : নাজিম খান
থানা রাজারহাট, জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৬১

নরেন্দ্র নাথ
পিতা : নন্দ কুমার রায়
গ্রাম দূর্গাপুর, ডাক চান্দিজাম
জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৬২

রুহুল আমিন
গ্রাম +ডাক তারাপুর
থানা সুন্দরগঞ্জ
জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৬৩

নওশের আলী
পিতা হানিফ উদ্দিন
গ্রাম সতীঝাড়, ডাক পাঁচগাছি
জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৬৪

হুসেন আলী
পিতা সফেতউল্লাহ
গ্রাম চর সতীঝাড়,
ডাক + কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৬৫

কামাল উদ্দিন
পিতা আব্দুস সোবহান
গ্রাম সিংপাড়া, ডাক পঞ্চগ্রাম
জেলা দিনাজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৬৬

ফনিন্দ্র নাথ বর্মন
পিতা বিশ্বনাথ বর্মন
গ্রাম সিদ্ধান্ত মালতিবাড়ি
ডাক পাঙুল, জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৬৮

নূরুল আলম
পিতা সৈয়দ আলী মাষ্টার
গ্রাম সারাই, ডাক হারাগাছ
থানা কাউনিয়া, জেলা রংপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৬৯

কাশেম আলি
পিতা কাচু মাসুদ বেপারী
গ্রাম : কাচিচর, ডাক পাঁচগাছি
জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৭০

আব্দুল খালেক
পিতা কফিলউদ্দিন
গ্রাম ভক্তিপুর, ডাক রাণীপুকুর
থানা মিঠাপুকুর, জেলা রংপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৭১

মজিবর রহমান
পিতা আছিমউদ্দিন মণ্ডল
গ্রাম ছোট মহেশপুর, ডাক নবাবগঞ্জ
জেলা দিনাজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৭২

জয়াব আলি
পিতা জহিরউদ্দিন
গ্রাম ঢালা, ডাক দুতিয়ামরা
থানা নবাবগঞ্জ, জেলা দিনাজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৭৫

মোকসেদ আলী
পিতা আবেদ আলী
গ্রাম ব্যাংতাড়াই, ডাক হারাগাছ
থানা কাউনিয়া, জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৭৬

একরামুল হক
পিতা মোঃ নিজামউদ্দিন মন্ডল
গ্রাম শালখুরিয়া, ডাক পুটিমারা
থানা নবাবগঞ্জ, জেলা দিনাজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৭৭

জিন্নাতুল আলম (না: সুবেদার)
পিতা আশরাফুল আলম
গ্রাম ভবানীপুর, ডাক বৈরচুনা
থানা পীরগঞ্জ, জেলা ঠাকুরগাঁও
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৭৮

হাবিবুর রহমান
পিতা মহিউদ্দিন
গ্রাম পাকুসিয়া, ডাক বাহাদুরিয়া
থানা নবাবগঞ্জ, জেলা দিনাজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৭৯

নাজিমুদ্দিন
পিতা কালু বেপারী
গ্রাম +ডাক শ্যামগ্রাম
থানা নবীনগর, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৮০

মমিনউদ্দিন
পিতা বসিউদ্দিন
গ্রাম সাফাই, ডাক হারাগাছ
জেলা : কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৮১

তোফাজ্জল হোসেন
পিতা সিরাবউদ্দিন
গ্রাম গরুহারা, ডাক পাঁচগাছি
জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৮৩

আকবর আলি
পিতা সিরাজউদ্দিন
গ্রাম গরুহারা, ডাক পাঁচগাছি
জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৮৪

জাভেদ আলি
পিতা খেতাব মণ্ডল
গ্রাম সাহনান্দা, ডাক যাত্রাপুর
থানা উলিপুর, জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৮৫

বদরুল আলম
পিতা বখতিয়ার আলী
গ্রাম মূলঘর, ডাক ফকিরহাট
জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৮৬

ফরহাদ আলি
পিতা শওকত আলি
গ্রাম+ডাক গড়ইখালি
থানা পাইকগাছা, জেলা খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং- ০৩৮৭

সৈয়দ রেজওয়ান
পিতা সৈয়দ আ: গনি
গ্রাম সৈয়দ মহল্লা, ডাক মূলঘর
থানা ফকিরহাট, জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৮৯

নজরুল হুদা
পিতা সুবদল শেখ
গ্রাম মির্জাপুর লেন, জেলা খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৯০

আব্দুর রহমান
পিতা লেহাজউদ্দিন
গ্রাম তালিবপুর, ডাক ইরটা
থানা সাংগাইর, জেলা মানিকগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৯১

কামরুল আলম
পিতা বখতিয়ার আলী
গ্রাম মূলঘর, ডাক ফকিরহাট
জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৯২

আব্দুস সালাম
পিতা সফিরউদ্দিন মন্ডল
গ্রাম চরকী, ডাক বিরামপুর
থানা নবাবগঞ্জ, জেলা দিনাজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৯৪

নাদের আলি
গ্রাম আঠারোজানি
ডাক বেপারীটোলা
থানা বিরামপুর
জেলা দিনাজপুর
নৌ-কমান্ডো নং- ০৩৯৫

এখলাসুর রহমান
পিতা এহছানউদ্দিন
গ্রাম ছোট মহেশপুর
ডাক : নবাবগঞ্জ
জেলা দিনাজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৯৬

মোস্তাফিজুর রহমান
পিতা আঃ হোসেন মণ্ডল
গ্রাম বড় মহেশপুর
ডাক ভাদুরিয়া
জেলা দিনাজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৯৭

ফিরোজ আলি গাজি
পিতা শওকত আলি গাজি
গ্রাম +ডাক গড়ইখালী
জেলা খুলনা
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৯৯

সিরাজুল ইসলাম
পিতা মোঃ রশিদ
গ্রাম কবুতর খোলা
ডাক ভাগ্যকুল
থানা শ্রীনগর, জেলা মুন্সীগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৩৯৯

নির্মল বিজয় বালা
পিতা অনাদী নাথ বালা
গ্রাম+ডাক+থানা টুংগীপাড়া
জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৪০০

জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস
পিতা সুধীর চন্দ্র বিশ্বাস
গ্রাম টুঙ্গিপাড়া, ডাক পদগতি
জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৪০১

রবীন চন্দ্র বালা
পিতা : বিন্দু বিহারীবালা
গ্রাম টুঙ্গিপাড়া, ডাক পদগতি
জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৪০২

আব্দুল বারী
গ্রাম+ডাক+ বাজেরগাতি
জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৪০৩

শ্যাম চন্দ্র মন্ডল
পিতা উপেন্দ্র নাথ মন্ডল
গ্রাম ফালনা, ডাক বাজেরগাতি
জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৪০৪

কেবশ লাল বালা
গ্রাম ধুলগ্রাম, ডাক ধুসার কালকিনী
জেলা মাদারীপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪০৫

আলাউদ্দিন খান
পিতা কাশেম খান
গ্রাম বালিহাটি, ডাক দাওখালি
থানা ভাঙ্গা, জেলা ফরিদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪০৬

পঞ্চানন সরকার
পিতা নগেন্দ্রনাথ সরকার
গ্রাম + ডাক আলগী
থানা ভাঙ্গা, জেলা ফরিদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪০৭

ইয়ার আলি মুন্সী
পিতা রুস্তম আলী মুন্সী
গ্রাম ভাটরা, ডাক ভাটরা বেজড়া
জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৪০৮

নিখিল চন্দ্র বৈরাগী
পিতা রসিক লাল বৈরাগী
গ্রাম কালিগ্রাম, ডাক জলিরপাড়
থানা মোকসেদপুর
জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৪০৯

চিন্ময় কান্তি মন্ডল
পিতা চৌধুরী নাথ মন্ডল
গ্রাম ডুমুরিয়া
ডাক ডমুরিয়া বাজার, টুঙ্গীপাড়া
জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৪১০

নিজামুল হক
গ্রাম বান্ধব বাড়িয়া
ডাক কোটালিপাড়া
জেলা গোপালগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৪১১

এম. এ. হোসেন
গ্রাম নিয়ামতপুর, ডাক : লক্ষীপুর
থানা পালং, জেলা শরিয়তপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪১২

এ. মজিদ মিয়া
পিতা আব্দুল জব্বার মিয়া
গ্রাম সুবেদারকান্দী
ডাক আঙ্গারিয়া
থানা পালং, জেলা শরিয়তপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪১৩

আলি আজম
গ্রাম+ডাক মহেশপুর ভেদরগঞ্জ
জেলা শরিয়তপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪১৪

হাবিবুর রহমান
পিতা কাইমুদ্দিন
গ্রাম এলায়েল, ডাক পাঞ্চুরিয়া
জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪১৫

ডাঃ মোজাম্মেল হক সিদ্দিকী
পিতা এম, এস, এ, সিদ্দিকী
গ্রাম মোলামেরডাঙ্গী
ডাক আকুলিয়ারচর
থানা সদরপুর, জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪১৬

মোতাহার হোঃ শেখ
পিতা দাগ মাতবর
গ্রাম মোলামেরডাঙ্গী
ডাক আকুলিয়ারচর
থানা সদরপুর, জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪১৭

এম. মোশারফ্ হোসেন
পিতা মেস্রে আলি
গ্রাম আমীরাবাদ
ডাক সদরপুর
জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪১৮

সামছুল হক
পিতা আদিল উদ্দিন মিয়া
গ্রাম+ডাক আকুলিয়ার চর
থানা সদরপুর, জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪১৯

খলিলুর রহমান
পিতা এ. মালেক মোল্লা
গ্রাম নাছিরপুর, ডাক চৌধুরী হাট
থানা সদরপুর, জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪২০

মোয়াজ্জেম হোসেন
পিতা আফসারউদ্দিন
গ্রাম মোলামের ডাঙ্গি, ডাক: আকুলিয়ারচর
থানা সদরপুর, জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪২১

রায়হান উদ্দিন
পিতা : চান মিয়া ফকির
গ্রাম উত্তর আলমনগর
ডাক চর ভদ্রাসন
জেলা ফরিদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪২২

শেখ সুলতান
পিতা শেখ হাফিজ
গ্রাম গুহালক্ষিপুর
ডাক+জেলা ফরিদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪২৩

সুশীল কুমার রায়
গ্রাম সোনাইপুরী
ডাক নড়িয়া বাজার
থানা বালিয়াকান্দী
জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪২৪

নিরঞ্জন কুমার মন্ডল
গ্রাম বিজয় নগর
ডাক চামুন্ডী নগর
থানা বালিয়াকান্দী
জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪২৫

সূর্যকান্ত মিরবার
গ্রাম বোলপুর, ডাক মোড়লগঞ্জ
জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০৪২৬

দুলাল কৃষ্ণ দাশ
পিতা রাধাকান্ত দাশ
গ্রাম+ডাক ম্যাটারনিটি হাসপাতাল রোড
জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪২৭

এম. রব্বান আলি
পিতা মৃত মোঃ হানিফ উদ্দিন মোল্লা
গ্রাম মৌকুড়ি, ডাক পাংশা.
জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪২৮

রফিকুল ইসলাম
পিতা কামালউদ্দিন
গ্রাম কাচাড়িপাড়া
ডাক পাংশা. জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪২৯

রুকুনুজ্জামান
পিতা সৈয়দ আলী
গ্রাম+ডাক কাচারিপাড়া
থানা পালং. জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৩০

গোলাম রহমান
গ্রাম+ডাক কাচারিপাড়া
থানা পালং, জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৩১

নাজিম উদ্দিন আহমেদ
পিতা তারুমন্ডল
গ্রাম নবকৃষ্ণপুর. ডাক রামকুল
থানা পাংশা, জেলা রাজবাড়ী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৩২

আব্দুর রব
পিতা সিরাজুল হক
গ্রাম চরমাটি ভাঙ্গা, ডাক : মাটিভাঙ্গা
থানা নাজিরপুর. জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৩৩

নির্মল কুমার ঢালি
পিতা বিজয় বিহারী ঢালি
গ্রাম মাটিভাঙ্গা
ডাক মাটিভাঙ্গা নাজিরপুর
জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৩৪

নাসির হায়দার (মৃত)
পিতা মৃত আঃ সামাদ
গ্রাম মাহামুদ কান্দা. ডাক মাটিভাঙ্গা
থানা নাজিরপুর. জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৩৫

সমীর রঞ্জন দত্ত
পিতা সুধাময়ী
গ্রাম মুগাদিয়া, ডাক আবু তোরা
থানা মিরশ্বরাই, জেলা চট্টগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৩৬

ইয়ার আলি
গ্রাম চরমাটিভাঙ্গা
ডাক মাটিভাঙ্গা
থানা নাজিরপুর, জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৩৭

এ. হক
পিতা সিরাজুল হক
গ্রাম চরমাটিভাঙ্গা. ডাক মাটিভাঙ্গা
থানা নাজিরপুর. জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৩৮

নুরুল ইসলাম
পিতা ইমামউদ্দিন আহমদ
গ্রাম মাহমুদা কান্দা, ডাক মাটিভাঙ্গা
থানা নাজিরপুর, জেল পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৩৯

স্বপন কুমার মন্ডল
পিতা নরেন্দ্র নাথ মন্ডল
গ্রাম মাটিভাঙ্গা, ডাক মাটিভাঙ্গা
থানা নাজিরপুর, জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৪০

জগদিশ চন্দ্র বিশ্বাস
গ্রাম মদন বানিয়ারী
ডাক দিঘীরজান
থানা নাজিরপুর
জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৪১

ইদ্রিস আলি
পিতা কাশেম আলী
গ্রাম বারাইবুনিয়া, ডাক মাটিভাঙ্গা
থানা নাজিরপুর, জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৪২

মোশাররফ হোসেন
গ্রাম মাদুলিহারা
ডাক হোগলাবুনিয়া
থানা নাজিরপুর
জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৪৩

এ. রশিদ
পিতা আজহার আলি মিয়া
গ্রাম কিত্তিপাশা
ডাক +জেলা ঝালকাঠি
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৪৪

আমজাদ হোসেন
পিতা এলেমউদ্দিন মিয়া
গ্রাম কির্ত্তীপাশা বাজার
ডাক কির্ত্তীপাশা, জেলা ঝালকাঠি
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৪৫

নিকুঞ্জলাল বাড়ৈ
পিতা রজনী কান্ত বাড়ৈ
গ্রাম শিমুলিয়া, ডাক : বেত্রা
থানা+জেলা ঝালকাঠি
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৪৬

অমল চন্দ্র নট্ট
পিতা নারায়নচন্দ্র নট্ট
গ্রাম কাঠপট্টি রোড
ডাক +জেলা ঝালকাঠি
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৪৭

মুজিবর রহমান
পিতা কাজী লালউদ্দিন
গ্রাম বোয়ালিয়া, ডাক বাবুগঞ্জ বাজার
থানা মোল্লাহাট, জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৪৮

এস. এম. ইয়াকুব
পিতা এ.টি.এম. আইয়ুব
গ্রাম কুমারডাঙ্গা, ডাক লেসাগঞ্জ
থানা হরিরামপুর, জেলা মানিকগঞ্জ
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৪৯

মাখন চন্দ্র মজুমদার
পিতা রাখাল চন্দ্র মজুমদার
গ্রাম কালীবাড়ী, ডাক কালীবাড়ী বাজার
থানা মোড়লগঞ্জ, জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৫০

সুধাংশু কুমার মন্ডল
পিতা নিকুঞ্জ বিহারী মন্ডল
গ্রাম কালিবাড়ী
ডাক কালিবাড়ী বাজার
থানা মোড়লগঞ্জ
জেলা বাগেরহাট
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৫১

গোপিনাথ তালুকদার
পিতা মহেন্দ্রনাথ হাওঃ
গ্রাম কালিবাড়ী
ডাক কালিবাড়ী বাজার
থানা মোড়লগঞ্জ
জেলা : বাগেরহাট
নৌ-বাহিনীর নং-০৪৫২

মীর সাইদুজ্জামান
পিতা আমজাদ আলী
গ্রাম দোহারপাড়া
ডাক পাবনা সদর
জেলা পাবনা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৫৪

সামসুল আলম
গ্রাম+ডাক সোহাগঢাল
থানা স্বরূপকাঠি, জেলা পিরোজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৫৫

মোজাম্মেল হক
গ্রাম+ডাক মহেশপুর ঝালকাঠি
জেলা ঝালকাঠি
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৫৬

প্রভাত চন্দ্র হাওলাদার
পিতা মৃত সতীশ চন্দ্র হাওলাদার
গ্রাম কঠুরাকাঠী, ডাক কুড়িয়ানা
থানা স্বরূপকাঠী, জেলা পিরোজপুর
নৌ-বাহিনীর নং-০৪৫৭

নরেন্দ্রনাথ মন্ডল
পিতা মৃত উপেন্দ্র নাথ মন্ডল
গ্রাম জগদীশপুর
ডাক শতদশকাঠী
জেলা ঝালকাঠী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৫৮

দিলীপ কুমার মিত্র
পিতা কৃষ্ণ কান্ত মিত্র
গ্রাম শতদশকাঠি
ডাক+জেলা ঝালকাঠি
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৫৯

অতুল কৃষ্ণ মিত্র
পিতা সুরেন্দ্র নাথ মিত্র
গ্রাম কাফুরকাঠী, ডাক শতদশকাঠী
জেলা ঝালকাঠী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৬০

নিরঞ্জন বিশ্বাস
পিতা ভাষ্যারাম বেপারী
গ্রাম খোর্দ্দ বডাহর
ডাক কির্ত্তিপাশা, জেলা ঝালকাঠী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৬১

আব্দুল বারেক
পিতা এ. ওয়াহেদ
গ্রাম গোয়াতন
ডাক শ্রীমন্তকাঠী
জেলা ঝালকাঠী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৬২

তপন কুমার মুখার্জি
পিতা স্বর্গীয় শান্তি রঞ্জন মুখার্জি
গ্রাম তারপাশা, ডাক কীর্ত্তিপাশা
জেলা ঝালকাঠী
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৬৩

দিলীপ কুমার দেবনাথ
গ্রাম+ডাক নিয়ামতি
থানা বাকেরগঞ্জ
জেলা বরিশাল
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৬৪

বাহার উদ্দিন
পিতা খোদা বকস্
গ্রাম রামচন্দ্রপুর, ডাক বোনারপাড়া
জেলা কুড়িগ্রাম
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৬৫

গোলাম হোসেন
পিতা গান্দালা বেপারী
গ্রাম রামপুর, ডাক নাকাইহাট
জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৬৬

মাহবুবুর রহমান
পিতা করিম বকস্
গ্রাম রামপুর, ডাক নাকাইহাট
থানা: গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৬৭

এন্তাজ আলি
পিতা নাদের বসক্
গ্রাম রামপুর, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৬৮

আবু বক্কর সিদ্দিকী
পিতা আঃ সাত্তার
গ্রাম হরিনাথপুর, ডাক বাদিয়াখালী
থানা পলাশবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৬৯

আশরাফুল আজাদ
পিতা আজিমউদ্দিন
গ্রাম রামপুরা, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৭০

গোলাম মোস্তফা
পিতা জসিমউদ্দিন
গ্রাম রামপুরা, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৭১

আমিনুল ইসলাম
পিতা তায়েব আলি সরকার
গ্রাম রামপুরা, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৭২

সাইদুর রহমান
পিতা বাবুর আলী
গ্রাম রামপুরা, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৭৩

সামসুল হক
পিতা রানদুরা বেপারী
গ্রাম রামপুরা, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৭৪

আব্দুল আজিজ
পিতা আরিফউদ্দিন বেপারী
গ্রাম রামপুরা, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৭৫

হারুনর রশিদ
পিতা মৃত খাদেম হোসেন
গ্রাম রামপুরা, ডাক : নাকইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৭৬

রফিকুল ইসলাম
পিতা আব্দুল কাদের
গ্রাম হরিনাথপুর, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৭৭

ফয়জুর রহমান
পিতা আকবর আলী
গ্রাম রামপুরা, ডাক : নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৭৮

জিন্নাত আলি
পিতা আমেনউদ্দিন
গ্রাম রামপুরা, ডাক : নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৭৯

মহম্মদ আলি
পিতা আকবর আলী
গ্রাম : রামপুর , ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৮০

বজলুর রহমান
পিতা আকবর আলী
গ্রাম রামপুরা, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৮১

রফিকুল ইসলাম
পিতা গোন্দালা বেপারী
গ্রাম রামপুরা, ডাক : নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৮২

জসিমউদ্দিন
পিতা নাসিমউদ্দিন
গ্রাম রামপুরা, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৮৩

বিনয় কুমার
পিতা ইশ্বর চন্দ্র
গ্রাম রামপুরা, ডাক : নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৮৪

এ. মজিদ
পিতা ওমর আলী সরকার
গ্রাম ফরিদপুর, ডাক আমদাঘোষ
থানা পলাশবাড়ি, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৮৫

মাহবুবর রহমান
পিতা আফতাবউদ্দিন
গ্রাম রংপুর, ডাক নকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৮৬

শরিফউদ্দিন
পিতা শাফায়েত উল্লাহ
গ্রাম রংপুর, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৮৭

ইউনুস মিয়া
পিতা জয়নাল আবেদীন
গ্রাম মহম্মদপুর, ডাক মতলব
জেলা চাঁদপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৮৮

সামসুল হুদা
পিতা আশু যোসেফ সরকার
গ্রাম রামপুরা, ডাক নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৮৯

জুয়েল মিয়া
পিতা ইসহাক মন্ডল
গ্রাম হরিনাবাড়ী, ডাক : নাকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৯০

এ. গফফার
পিতা জামাত আলী মন্ডল
গ্রাম হাসহনাথপুর, ডাক বাদিয়াখালী
থানা পলাশবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৯১

এম. আর. সিদ্দিকী
পিতা কে. এইচ. খান
গ্রাম+ডাক ফুলবাড়ি পার্বতীপুর
জেলা দিনাজপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৯২

ফজলুল হুসেন
পিতা সৈয়দ আলী মোল্লা
গ্রাম মন্সীপাড়া, ডাক আলমনগর
থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৯৩

মকবুল হুসেন
পিতা আফতাবউদ্দিন
গ্রাম রামপুরা, ডাক নকাইহাট
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৯৪

এন. নবী
পিতা এম. হারুন
গ্রাম হরিনাথপুর, ডাক বাদিয়াখালী
থানা গোবিন্দগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৯৫

করিব মিয়া
পিতা বজলুর রহমান
গ্রাম+ডাক বারিকান্দী
থানা নবীনগর, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৯৭

আব্দুল মান্নান
পিতা সুলতান মিয়া
গ্রাম চরবাড্ডা, ডাক জীবনগঞ্জ বাজার
থানা নবীনগর, জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৯৮

মোকসেদুর রহমান
পিতা আব্দুল মান্নান
গ্রাম+ডাক বারিকান্দী নবীনগর
জেলা কুমিল্লা
নৌ-কমান্ডো নং-০৪৯৯

নৌ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের নামের তালিকা

লেঃ (এল) (অবঃ) গাজী মোঃ রহমত উল্লাহ
বীর প্রতীক
৪০ বি,কে,রায় রোড, শেখ পাড়া
জেলা-খুলনা, নৌ-নং-৮১

কমডোর (এস) বি এন মোঃ গুলজার হোসেন
সহকারী নৌ প্রধান (লজিষ্টিক)
নৌ সদর, বনানী, ঢাকা-১২১৩ নৌ-নং-১২৪

লেঃ (এল) (অবঃ) আমিন উল্লাহ শেখ
বীর বিক্রম
আল আমিন টি ষ্টোর, ৪৭৪, কর্ণফুলী বাজার
চৌমোহনী, চট্টগ্রাম, নৌ-নং ৮৮

লেঃ কমান্ডার (এক্স) (অবঃ) জালাল উদ্দীন
বীর উত্তম
পোষ্ট/থানা/জেলা-মাগুরা, নৌ-নং ৯৫

লেঃ (এক্স) (অবঃ) আব্দুল আউয়াল সরকার
বীর প্রতীক
গ্রাম ও ডাক-শাদগঞ্জ, কুমিল্লা, নৌ-নং৮৬

লেঃ (এক্স) (অবঃ) মোফাজ্জল হোসেন
বীর প্রতীক
৪৬৮/৩, মানিকদী বাজার, ঢাকা সেনানিবাস,
ঢাকা, নৌ-নং ১৯৫

কমডোর (এক্স) (অবঃ) আব্দুল ওয়াহেদ চৌধুরী
বীর উত্তম, বীর বিক্রম
গ্রাম: উত্তর শ্রীপুর, পোঃ মুন্সীর হাট
থানা/জেলা-ফেনী, নৌ-নং ৮৯

লেঃ কমান্ডার (এক্স) (অবঃ) সুলায়মান মিয়া
গ্রাম-কাশারা, ডাক-পাইকপাড়া, কুমিল্লা
নৌ-নং ৯৩

লেঃ এম. এ. আউয়াল ইবিএন
বাড়ী-৩/৬ ডি, রূপাতলি হাউজিং এষ্টেট
ডাক-জাগুয়া, বরিশাল, নৌ-নং ৮৩

ক্যাপ্টেন (এস) বি এন মোঃ ইসহাক
অধিনায়ক বা নৌ জা
বা নৌ জা শহীদ মোয়াজ্জেম
কাপ্তাই, পার্বত্য জেলা নৌ-নং-৯৭

লেঃ কমান্ডার (এস) (অবঃ) এম এন মিয়া
গ্রাম ও ডাক আহমদপুর, জেলা-নোয়াখালী
নৌ-নং ৯৪

লেঃ কমান্ডার (এক্স) (অবঃ) এম এম হক
গ্রাম-খাগুরিয়া, ডাক-বেলতুলি বাজার
জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং ৯১

লেঃ কমান্ডার (অবঃ) শেখ মুনিরুজ্জামান
গ্রাম-কারারী, ডাক-উতকুল, জেলা-খুলনা
নৌ-নং-৯৮

লেঃ কমান্ডার (ই) (অব) এম এ বাসেত
গ্রাম ও ডাক-কসবা, জেলা-কুমিল্লা
নৌ-নং-৯৯

লেঃ কমান্ডার (এস) (অবঃ) এন ইউ চৌধুরী
পশ্চিম কাউনিয়া রোড, ডাক-কাউনিয়া
জেলা-বরিশাল, নৌ-নং-১০১

কমান্ডার (এস) (অবঃ) এম এ বাশার
গ্রাম-মালতিনগর, ডাক ও জেলা-বগুড়া
নৌ-নং ১০২

কমান্ডার (এস) এম এ মালেক
গ্রাম-জামরা, ডাক-মিয়াবাজার
জেলা-কুমিল্লা নৌ-১০৩

লেঃ কমান্ডার (এস) (অবঃ) দেলোয়ার হোসেন
গ্রাম-তালিবপুর, পোঃ আরতা, জেলা-ঢাকা
নৌ-নং-১০৪

কমান্ডার (এল) (অবঃ) এম এম রহমান
গ্রাম ও ডাক-বোয়ালিয়া, জেলা-বরিশাল
নৌ-নং -১০৫

লেঃ কমান্ডার(অবঃ) এম এন ইউ আহমেদ
গ্রাম ও ডাক-মৌলভী পাড়া, জেলা-খুলনা
নৌ-নং -৯২

লেঃ কমান্ডার (এস) বি এন এমএ তালুকদার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ডিপি সেন্টার
বা নৌ জা হাজী মহসীন, ঢাকা সেনানিবাস
ঢাকা, নৌ-নং-১০৬

কমান্ডার (এক্স) (অবঃ) এ সোবহান মিয়া
গ্রাম ও ডাক- হিতালিয়া, জেলা-পটুয়াখালী
নৌ-নং-১১৩

লেঃ কমান্ডার (এক্স) (অবঃ) এম এম রহমান
গ্রাম ও ডাক-আদিয়াবাদ, জেলা-নরসিংদী
নৌ-নং-১১৪

লেঃ কমান্ডার (এক্স) (অবঃ) ডব্লিউ আই ভুইয়া
গ্রাম-আউনা, ডাক-শোলাহ, জেলা-ঢাকা
নৌ-নং-১১১

লেঃ কমান্ডার (এক্স) লেঃ এম এফ রহমান
গ্রাম-পানোর, ডাক-মোহনগঞ্জ
জেলা-নেত্রকোনা, নৌ-নং-১০৮

লেঃ কমান্ডার (অবঃ) এম এন মোস্তাফা
গ্রাম-ভোগাকাটার, ডাক-কামার আলী, জেলা-চট্টগ্রাম, নৌ-নং-১১২

লেঃ কমান্ডার (অবঃ) এ এইচ এম মাহমুদ
গ্রাম-শ্রীধরপুর, ডাক-কেন্দুয়া
জেলা-নেত্রকোনা, নৌ-নং-১১৭

লেঃ কমান্ডার (এক্স) বি এন এস এ ভূইয়া
নির্বাহী কর্মকর্তা, নৌ বাহিনী সদর দপ্তর
বনানী, ঢাকা-১২১৩, নৌ-নং-১১৫

লেঃ কমান্ডার (এক্স) (অবঃ) এম এ হাশেম
গ্রাম-দক্ষিণ পাহাড়িয়াপুর, ডাক-জলডুব,
জেলা-সিলেট, নৌ-নং-১১০

লেঃ কমান্ডার(এক্স)বিএন এম এ মোতালেব
গ্রাম-উত্তর লক্ষীপুর, ডাক-কৃষ্ণনগর
থানা-নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নৌ-নং-১১৬

কমান্ডার (এস) (অবঃ) এম এম উদ্দিন
গ্রাম ও ডাক-চড়শুবুদী
জেলা-ঢাকা, নৌ-নং-১৯৬

লেঃ কমান্ডার(অবঃ) মকবুল আহমেদ
গ্রাম-বনাবাড়িয়া, ডাক-হুসামিয়া, জেলা-কুমিল্লা নৌ-নং-২৫৪

লেঃ কমান্ডার (এক্স) বি এন এম এ কুদ্দুস
গ্রাম-পরমানন্দপুর, ডাক-দোয়েলকান্দী
জিলা-জামালপুর, নৌ-নং-৩১৫

লেঃ (এল) (অবঃ) এম এ রহিম
গ্রাম-লাউগাই, ডাক-শায়ামগঞ্জ
জেলা-নেত্রকোনা, নৌ-নং-৩১৪

লেঃ (এক্স) (অবঃ) এস ইউ গাজী
দক্ষিণ খালিশপুর, ডাক-খালিশপুর, খুলনা
নৌ-নং-৮৫

সাঃ লেঃ (এক্স) (অবঃ) এফ ইউ খন্দকার
গ্রাম-কৃষ্ণাপুর, ডাক-বামৈল, জেলা-কুমিল্লা
নৌ-নং-৯৬

লেঃ (এস) (অবঃ) এ এম এ হক
গ্রাম ও ডাক-টাংগাবা, জেলা-ময়মনসিংহ
নৌ- নং-৮০

লেঃ কমান্ডার (ই) শহীদ মোয়াজ্জেম হোসেন
৩৬, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, শহীদ
সড়ক নং-২, ঢাকা-৫ নৌ-নং-৫৭৪

লেঃ কমান্ডার (এক্স)(অবঃ) এম এন ইসলাম
নৌ-নং-১০৭

লেঃ কমান্ডার (এস) (অবঃ) এম এ মান্নান
গ্রাম-গোলগান্দা, ডাক ও জেলা-ময়মনসিংহ
নৌ-নং-১০০

লেঃ কমান্ডার (এক্স) (অবঃ) এম এস রহমান
গ্রাম-গাজীপুর, ডাক-চারিয়াবাজার
থানা-বিয়ানী বাজার, সিলেট, নৌ-নং-৮৪

লেঃ (অবঃ) মুজিবুর রহমান
গ্রাম ও ডাক-রুদরাকার, থানা-পালং
জিলা-ফরিদপুর, নৌ-নং-৬৬৫০৮

লেঃ (অবঃ) এ এইচ এম এস আলম
বেলা শেষে, বাসা নং ৪৬৪/৪, উত্তর
ইব্রাহিমপুর, ঢাকা-১২০৪ নৌ-নং-৬৫২

সাঃ লেঃ (এসডি) (আর), বি এন এম. আর ইসলাম
গ্রাম-দত্তেরচড়, ডাক-ধানুয়া কামালপুর,
থানা-শ্রীবর্দি. শেরপুর, নৌ-নং-৯২৪

ক্যাপ্টেন বি এন কে এম হাসান
গ্রাম-কুরপালী, থানাঃ কোটালীপাড়া,
গোপালগঞ্জ নৌ-নং-১৭৮

ইঃ কমান্ডার বিএন (অবঃ) এ রউফ
আনন্দ ভৈরব, হাউজ নং-১১ রোড নং ৫,
সেক্টর-১৩, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২১৩

কমান্ডার বিএন আব্দুল মমিন মিয়া
গ্রাম ও ডাকঃ সূচীপাড়া, থানা-শাহারাস্তি,
জেলা-চাঁদপুর, নৌ-নং-২৯১

কমান্ডার বিএন মোঃ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
ফুলতলা, থানাঃ বৈতাগী,বরগুনা-নৌ-নং-২২৯

কমান্ডার বিএন এমএম এ তালুকদার
পিতাঃমোঃ ইসহাক তালুকদার, গ্রাম-
কালিকাপুর, থানা ও জেলা-পটুয়াখালী নৌ-নং২৩০

কমান্ডার বিএন এম বি চৌধুরী
গ্রাম-কামাতাংগারিয়া. ডাক-ভুরুংগামারী, জেলা-রংপুর. নৌ-নং-২৯৩

লেঃ কমান্ডার বিএন (অবঃ) আমজাদ হোসেন
গ্রাম-রামচন্দ্রপুর, ডাক-ঘোড়ামারী,
জেলাঃরাজশাহী, নৌ-নং-২৪

লেঃ কমান্ডার বিএন (অবঃ) এ কে খান
গ্রাম-মোহাম্মদ নাছির, ডাক-মাতাবারের হাট
থানা-বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, নৌ-নং৫৭৯

লেঃ বিএন এম এ হোসেন
গ্রাম-দক্ষিণ রাজষপুর, ডাক-শালধর বাজার
থানা-পরশুরাম, জেলা-ফেনী নৌ-নং-৯৮৫

নৌ বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা নাবিকদের নামের তালিকা

ই আর এ-১ মোঃ রুহুল আমিন বীর শ্রেষ্ঠ (শহীদ)
গ্রাম-বেগপান চড়া, ডাক-নান্দিনা পাড়া, থানা-
বেগমগঞ্জ, জেলা-ফেনী, নৌ-নং৬২০৬৬

ই আর এ-১ মোঃ আফজাল মিয়া
বীর উত্তম (যুদ্ধাহত) (মৃত)
গ্রাম-ডারারুল, ডাক ও থানা-জয়দেবপুর
জিলা-গাজীপুর, নৌ-নং-৬৬২৫২

ই আর এ-৪ মোঃ বদিউল আলম বীর উত্তম
গ্রাম-রামপুরা, ডাক-নাকাইহাট, থানা-
গবিন্দগঞ্জ,গাইবান্ধা, নৌ-নং-৬৪০৫১২

পি ও মোঃ সিরাজুল মাওলা বীর উত্তম
গ্রাম-নওপাড়া, ডাক-রহিমনগর, থানা-কচুয়া,
জেলা-চাঁদপুর, নৌ-নং-৬২০৩১৬

এবি মোঃ দৌলত হোসেন মোল্লা বীর বিক্রম
গ্রাম ও ডাক-গাবুর, থানা-কাপাসিয়া, ঢাকা
নৌ-নং-৬৩০৫৮২

এবি মোঃ মহিবুল্লাহ বীর উত্তম
গ্রাম ও ডাক- সাইদাপুর, থানা-কচুয়া,জেলা-
চাঁদপুর নৌ-নং-৬২০৭২৬

আরইএন-১ মোঃ ফরিদউদ্দিন আহমেদ
বীর বিক্রম (শহীদ)
গ্রাম-বোগাবীগ্রাম, ডাক-শ্রীপুর বাজার
থানা-চৌদ্দগ্রাম, চাঁদপুর, নৌ-নং৬৭০১৩৫

এবি কফিলউদ্দিন আহমেদ
গ্রাম-দারিচর, ডাক-গয়েশপুর, থানা-কালিগঞ্জ
জেলা-ঢাকা, নৌ-নং-৬৬০৩০৬

এম.আহমেদ (লে:)
গ্রাম-বানাবাড়িয়া, ডাক-হুসামিয়া, থানা-
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৪০৩৫৮

এলএস মোঃ আব্দুল মালেক বীর বিক্রম
গ্রাম-সাইকোট, ডাক ও থানা-চান্দিনা
জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং ৬৭০১৩৪

ইএন-১ আব্দুর রকিব মিয়া (বীর বিক্রম) শহীদ
গ্রাম-সোলাপ্রতিমা, ডাক-সখিপুর,থানা+জেলা
-টাঙ্গাইল, নৌ-নং- ৬৫০২৪৩

ষ্টুয়ার্ড-১ মোঃ আব্দুল রহমান বীর বিক্রম
গ্রাম ও ডাক-সালিমাবাদ, থানা-নাগরপুর
জেলা-টাঙ্গাইল, নৌ-নং-৬৬০৪৪৯

এমই-১ মোঃ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক
গ্রাম-চরবাতিয়া, ডাক-খাস সাতবাড়িয়া
থানা-শাহজাদপুর, পাবনা, নৌ-নং৬৪০৫০৮

এল এস মোঃ আঃ হাকিম বীর প্রতীক
গ্রাম-মাদানগড়, ডাক-চন্দ্রাবাজার
জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৮৪০৩৪২

এল/টিও এ এস ভূইয়া বীর প্রতীক
গ্রাম-চারিয়ানী পাড়া, ডাক ও থানা-নন্দাইল
জেলা-ময়মনসিংহ, নৌ-নং৬২০৬৫৯

এমই-১ আহসান উল্লা বীর প্রতীক
গ্রাম ও ডাক-আহমদ পুর
থানা ও জেলা-ফেনী, নৌ-নং-৬৮৪৪৪

পিও (আব এস) মোঃ আমীর হোসেন
বীর প্রীতক
বাসা নং সিবি-১২৬/৮,কচুক্ষেত পুরান বাজার
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা, নৌ-নং-৭২০০২৭

এবি এম আই সরকার শহীদ
গ্রাম-পুখরিয়া, ডাক ও জেলা- গোপালগঞ্জ
নৌ-নং-৬৬০৩১৮

কুক-১ সুলতান আহমেদ শহীদ
গ্রাম-নান্দাহার, ডাক- ইলহারা
জেলা-বরিশাল, নৌ-নং ৬৭০৭২০

এল/এমই ফজল আলী শহীদ
গ্রাম-সংখচাইল বাজার
ডাক ও জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৬০৭৫

সিপিও (রাইটার) আব্দুর রহমান মিয়া শহীদ
গ্রাম-দোপাল্লা, ডাক-ওয়ারোক
জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৩৩৭৩

এমই-১ এম এম উদ্দিন শহীদ
গ্রাম ও ডাক-গুনাগরী, জেলা-চট্টগ্রাম
নৌ-নং-৬২০২২৮

এবি আব্দুল লতিফ পাটওয়ারী শহীদ
গ্রাম ও ডাক-আলীপুর
জেলা-লক্ষীপুর, নৌ-নং-৬৩০৮৪২

এবি এম রহমান শহীদ
গ্রাম-রেজ্জাকপুর, ডাক-চাটখিল
জেলা-নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৮০৭৪২

এমই-১ আলী আহমেদ শহীদ
গ্রাম-চরপাগলা, ডাক-তোরাবগঞ্জ
জেলা-লক্ষীপুর, নৌ-নং-৬৭০১২৭

ডিই/এউসি এম বদিউজ্জামান শহীদ
গ্রাম-কালীনগর, ডাক ও থানা-নালিতাবাড়ী
জেলা-শেরপুর, নৌ-নং-৬৯০৪৬১

এমই-১ মোঃ খালেকুজ্জামান শহীদ
গ্রাম-গজারিয়া, ডাক-হিঙ্গানগর, জেলা-
টাঙ্গাইল, নৌ-নং ৬৬০৩৩৯

এল/এস হেলাল উদ্দিন আহমেদ শহীদ
গ্রাম-দেওয়ানপাড়া, ডাক ও জেলা-জামালপুর
নৌ-নং-৬৬৪২৯

এল/টিও এমএস হুদা শহীদ
গ্রাম-দয়ারপারা, ডাক ও জেলা-গাইবান্ধা
নৌ-নং-৬৪৩৫২

চীফ ইআরএ আবু তাহের
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা
গ্রাম-সাতবাড়িয়া, ডাক-মিয়াবাজার
জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৮০৪৬৫

এবি কাজী নাজিম উদ্দিন শহীদ
গ্রাম ও ডাক-বেলাবো
জেলা-নরসিংদী, নৌ-নং-৬৩০৫৭২

এবি এম হক শহীদ
গ্রাম-পূর্ব লালানগর, ডাক-ছোট দারোগারহাট,
জেলা-চট্টগ্রাম, নৌ-নং-৬২০৭২০

এলএস আক্রাম হোসেন শহীদ
বরিশাল সদর হাসপাতাল, ষ্টাফ কোয়াটার
বরিশাল, নৌ-নং-৬১১৪৫

এল/টিও এম এ মতিন
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা
গ্রাম ও ডাক- কসবা, থানা-বি বাড়িয়া
জেলা-বি-বাড়িয়া, নৌ-নং-৬৭০১৩১

সিপিও (ষ্টুয়ার্ড) এম এ আফজাল
গ্রাম-পানখারচর,ডাক-ফুকরা, থানা-কাশিয়ানী
জেলা-ফরিদপুর, নৌ-নং-৬১০৩২

ই আর এ-২ এম এ জলিল
গ্রাম-পরাগপুর, ডাক-চড়গ্রাপুর, থানা-
দৌলতপুর, জেলা-কুষ্টিয়া, নৌ-নং-৬৪১৪১

সিপিও (অবঃ) এন এইচ চৌধুরী
গ্রাম-মাহমুদাবাদ, ডাক-বারবকুন্ড
থানা-শীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, নৌ-নং-৬৪৩০০

এমসিপিও (অবঃ) এম এ খালেক
গ্রাম-কালনা, ডাক-পিংগোলাখাটী,
থানা-গৌরনদী, বরিশাল-নৌ-নং-৬৪৬৮২

ইআরএ-২ এম ও আর তালুকদার
গ্রাম-সাদনগর, ডাক-বিরকূলাসা
থানা ও জেলা-নাটোর নৌ-নং-৬৪৮৮০

সিআরএস এম এ খালেক
গ্রাম ও ডাক-মাহমুদপুর, থানা-মেলান্দ,
জেলা-জামালপুর, নৌ-নং-৬৫০৯০

এমসিপিও (এক্স) এম এ রহমান
গ্রাম-মান্দারা, ডাক-রাধাগঞ্জ
থানা-কোটালীপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ
নৌ-নং-৬৫৩৭০

সিপিও (অবঃ) এম হানিফ
গ্রাম-পনচাড়া, ডাক-কান্দাপাড়া থানা-
মকসুদপুর,গোপালগঞ্জ, নৌ-নং-৬৫৩৭৯

চীফইআরএ এম আহমেদ
গ্রাম-নওয়ালকুরি, ডাক-শানাগঞ্জ
থানা ও জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৫৬৩৯

সিপিও (ষ্টুয়ার্ড) এম এইচ আলী
গ্রাম-বরিয়াজানী, ডাক ও থানা-নালিতাবাড়ী
জেলা-শেরপুর, নৌ-নং-৬৫৭৯০

পিও মোঃ নজরুল ইসলাম
গ্রাম ও ডাক-পাঁচবাড়িয়া, থানা-বেগমগঞ্জ
জেলা-নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৫৮৫২

পিও (কুক) এস এস আহমেদ
গ্রাম-হরিদা, ডাক-চড়কুলিয়া, থানা-
মোল্লারহাট, বাগেরহাট, নৌ-নং-৬৫৮৭৩

অঃসাঃলেঃ (অবঃ) এম এ রউফ
গ্রাম-মিলারচড়, ডাক-মোহনপুর
থানা-মতলবগঞ্জ, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৫৯৯৩

চীফইআরএ এম আলী
গ্রাম ও ডাক-ঘনিয়া
থানা-ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর নৌ-নং-৬৬৩৩০

সিপিও এম এস উল্লা
গ্রাম-আমরপুর, ডাক-চাপড়াশিরহাট
থানা-সদর, নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৬৩৩৮

সিপিও (জিআই) এসএমএস হক
গ্রাম ও ডাক-সিংগারগারী
থানা-কেশরগঞ্জ,রংপুর, নৌ-নং-৬৬৫১৯

এমসিপিও (ও/ই) এমএন ইসলাম
পশ্চিম শাহাপুর, ডাক-কড়ইতলী
থানা-ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর, নৌ-নং-৬৬৫৮৮

এমসিপিও (এক্স) এম এ তাহের
গ্রাম-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, ডাক-নোয়াখালী
থানা-সুধারাম, নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৬৬১৬

সিপিও এম এস রহমান
গ্রাম-পুরবারাতুয়াবাতী, ডাক-কুমিল্লা
থানা-কোতয়ালী, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৬৬২৬

সিপিও এম এইচ রহমান
গ্রাম-সিধতা, ডাক ও থানা-হোসাইনপুর
জেলা-কিশোরগঞ্জ, নৌ-নং-৬৬৮২৩

এল/এস এম টি হোসেন
গ্রাম-বাতগ্রাম, ডাক-কুন্ডরহাট
থানা-নান্দিগ্রাম, বগুড়া, নৌ-নং-৬৬৯৭৩

চীফইআরএ এ কে এম আলী
গ্রাম-কান্দাপাড়া, ডাক-কালিয়াহরিপুর
থানা ও জেলা-সিরাজগঞ্জ, নৌ-নং-৬৭০৮১

পিও (ষ্টুয়ার্ড) এম বি আলম
গ্রাম-বরখাইন, ডাক-তৈলারদীপ
থানা-আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, নৌ-নং-৬৭২৬১

সিপিও (কুক) এ খালেক
গ্রাম-নামিলা, ডাক-উলসরা, থানা-কাপাসিয়া,
গাজীপুর, নৌ-নং-৬৭৪৯৫

সিপিও এমটিএ ভূইয়া
গ্রাম-তুজার ভাংগা, ডাক-দাউদকান্দি, কুমিল্লা
নৌ-নং-৬৭৯১৫

এমসিপিও (ই) এ এইচ ভূইয়া
গ্রাম-বাসন্তাপুর, ডাক-বতিসা
থানা-চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৭৯২৫

সিআরএস এস এ রহমান
গ্রাম ও ডাক-ইটনা, থানা-লোহাগড়া, যশোর
নৌ-নং-৬৭৯৩৬

ইআরএ-৪র্থ এম আলীম উদ্দিন
গ্রাম ও ডাক-ফিলিপনগর, থানা-দৌলতপুর,
কুষ্টিয়া, নৌ-নং-৬৭৯৪৩

সিপিও (মেড) এম এ ওয়াহিদ
গ্রাম-কাশিমপুর, থানা-পীর কাশিমপুর
থানা-মুরাদনগর, কুমিল্লা নৌ-নং-৬৮৪২২

সিআরএস এস ইসলাম
গ্রাম-রামরয়গ্রাম, ডাক ও থানা-চৌদ্দগ্রাম
কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৮৪২৪

এল/এস এম বি আলী
গ্রাম-মাটিকাটা, ডাক ও থানা-গোদাগরী
জেলা-রাজশাহী, নৌ-নং-৬৮৪৬১

সিপিও (কুক) এম এন খান
গ্রাম-নন্দীপাড়া, ডাক-পোনাসাইল
থানা-ভালুকা, ময়মনসিংহ নৌ-নং-৬৮৪৬৬

পিও এ কে আজাদ
গ্রাম-গবিন্দপুর, ডাক-হরিপুরবাজার
থানা-ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর নৌ-নং-৬২০২২২

এমসিপি(এক্স) এম রাজ্জাক খান
গ্রাম ও ডাক-কৃষ্ণখালী, থানা-বাকেরগঞ্জ,
জেলা-বরিশাল, নৌ-নং-৬৮৪৫২

পিও(এস) এম এ কালাম
গ্রাম-হরিদূর্গাপুর, ডাক-কালির বাজার
থানা-ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর, নৌ-নং-৬২০২৩০

এম এ এ, এম কে পাঠান
গ্রাম ও ডাক-দুলাল পুর, থানা-বুড়িচং
জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৬২০২৪৯

এমসিপিও(ই) ও হক
গ্রাম ও ডাক-নবীপুর, থানা-সেনবাগ,
নোয়াখালী, নৌ-নং-৬২০৩২৬

সিপিও (কুক) জেড ইউ মিয়া
গ্রাম-আক্তারপুর, ডাক-পাক্রোশপুর
থানা+জেলা-বি-বাড়িয়া, নৌ-নং-৬২০৩৩১

পিও(কুক) এম এ সালাম
গ্রাম ও ডাক-কুশিমপুর, থানা ও জিলা-
সিরাজগঞ্জ, নৌ-নং-৬২০৩৩২

এল/এস এম এ রহমান
গ্রাম-চড়গারামারা, ডাক ও থানা-শাঘাটা
জেলা-রংপুর, নৌ-নং-৬২০৬৬১

পিও এম এস উল্লা
গ্রাম-শামারগাঁও, ডাক-জয়নগর
থানা-সেনবাগ, নোয়াখালী, নং-৬২০৬৭৬

এল/এস এম এ ওয়াদুদ
গ্রাম-কালিয়া, ডাক ও থানা-দৌলতখাঁন
জেলা-ভোলা, নৌ-নং-৬২০৭৩০

সিপিও (কুক) এম এ মালেক
গ্রাম-কৃষ্ণপুর, ডাক-করিমংগল
থানা-বুড়িচং, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬২০৭৩৫

এল/টিপ রুক্কু মিয়া
গ্রাম ও ডাক-খারারা, থানা-কসবা, কুমিল্লা
নৌ-নং-৬২০৭৩৬

এল/এসএ কে এন আহমেদ
গ্রাম-পাংখারচর, ডাক-মুকিমপুর
থানা-লক্ষীপাশা, যশোর, নৌ-নং-৬৩০২২৩

এল/এস এম এ খালেক
গ্রাম ও ডাক-বাইশারী, থানা-বানরীপাড়া,
গিরোজপুর, নৌ-নং-৬৩০২২৯

সিপিও (মেড) এমআই এইচ পাটোয়ারী
গ্রাম ও ডাক-রাজারগাঁও, থানা-হাজীগঞ্জ
জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৩০২৩৩

সিসিওয়াই এ আর খান
গ্রাম-বামনী, ডাক-উলফাতনগর,
থানা-রায়পুর, নোয়াখালী, নং-৬৩০২৩৮

সিপিও (মেড) এম হানিফ
গ্রাম-নোয়াখালা, ডাক-সূয়াচাকা, থানা-
রামগঞ্জ, নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৩০৪৫৬

সিপিও কে এস উদ্দিন
গ্রাম-হাজীপারা, ডাক-কেরামতগঞ্জ,
থানা ও জেলা-লক্ষীপুর, নৌ-নং-৬৩০৫২৮

পিও এম এ সামাদ
গ্রাম ও ডাক-বারীমারডন, থানা-মুলাদী
জেলা-বরিশাল, নৌ-নং-৬৩০৫৮০

চীফইআরএ এম আই উদ্দিন
গ্রাম-ডুমুরিয়া, ডাক-রাজাপুর, থানা ও জেলা-
ফেনী, নৌ-নং-৬৩০৫৯৯

ইআরএ ৪র্থ এম ওয়ারেস আলী
গ্রাম-হাজীপুর, ডাক ও থানা-ধামরাইল
জেলা-ঢাকা, নৌ-নং-৬৩০৬৩৭

এল/টপ এম জে আলী
গ্রাম ও ডাক-তাজপুর, থানা-সিরাদীগা, ঢাকা
নৌ-নং-৬৩০৬৪১

ই এ-২ এম এন ইসলাম
গ্রাম ও ডাক-জুগিয়া, থানা ও জেলা-কুষ্টিয়া,
নৌ-নং-৬৩০৬৭৮

পিও (কুক) এম ওয়াই মিয়া
গ্রাম-কচুয়া, ডাক-আহমদনগর
থানা ও জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৩০৬৯১

এল/এস এম এইচ উল্লা
গ্রাম-লাজুইর, ডাক ও থানা-ইলিয়টগঞ্জ,
কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৩০৭০৭

সিসিওয়াই এম এফ উদ্দিন
গ্রাম-পাকুরিয়া, ডাক-কালিগঞ্জ
থানা-রূপগঞ্জ, ঢাকা, নৌ-নং-৬৩০৮০৩

সিআরএস এম এ হোসেন
গ্রাম-প্রতাবপুর, ডাক-পাংশা, থানা-বাবুগঞ্জ,
বরিশাল, নৌ-নং-৬৩০৮১২

এল/এমই এম সাত্তার
গ্রাম-চরমাদবরায়, ডাক-বাযানচড়
থানা-মেহেন্দীগঞ্জ, নৌ-নং-৬৩০৮১৭

সিআরএস এম ওয়াই আলী
গ্রাম-বালিয়াডাংগী, ডাক-দুবলিয়া, থানা ও
জেলা-পাবনা, নৌ-নং-৬৩০৮২১

এমসিপিও (এক্স) কে এইচ হক
গ্রাম-নিলাখাদ, ডাক ও থানা-গংগা সাগর
জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৩০৮৩১

এল/সিকে এস ইউ আহমেদ
গ্রাম-রামরয়গ্রাম, ডাক ও থানা-চৌদ্দগ্রাম
জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৩০৮৪৮

এল/টিপ এম ডি মিয়া
গ্রাম-শাইফবাবুরচড়, ডাক ও থানা-জাজিরা
জেলা-ফরিদপুর, নৌ-নং-৬৩০৮৬০

চীফইআরএ এম এম ইসলাম
গ্রাম-ফুলচোয়া, ডাক-বাকিলা, থানা-হাজীগঞ্জ,
জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৪০২৬২

সিপিও এন উদ্দিন
গ্রাম ও ডাক-শ্রীপুর, থানা-মেহেন্দীগঞ্জ-
বরিশাল, নৌ-নং-৬৪০৩২২

আরইএ-২ কে এ রব
গ্রাম-বনাবাড়ীয়া, ডাক-রাজগঞ্জ, থানা-
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৪০৩৫৪

সিপিও কে এ রব
গ্রাম-শরীয়তপুর, ডাক-বসুরহাট, থানা-
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী, নং-৬৪০৩৫৭

ইআরএর ৪র্থ এম এ আকবর
গ্রাম-কোতয়ালী গুনা, ডাক-গুহিরা, থানা-
রাউজান, চট্টগ্রাম, নৌ-নং-৬৪০৩৭১

সিপিও (মেড) কে এ মতিন
গ্রাম-বাহারী, ডাক-আরংবাজার
থানা-মতলবগঞ্জ, কুমিল্লা, নং-৬৪০৩৭৪

সিপিও (রাইটার) এম এস হক
গ্রাম-জুলাইপাড়া, ডাক-বাগহাউরা
থানা-নবীনগর, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৪০৪৭৯

এল/এস এম এস আহমেদ
গ্রাম ও ডাক-জলদী, থানা-বাশখালী, জেলা-
চট্টগ্রাম, নৌ-নং- ৬৪০৪৮৯

পিও জি এম ভূইয়া
গ্রাম-বারুল, ডাক-খালাফাত বাজার, থানা-
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, নৌ-নং৬৪০৪৯৬

এল/এস এম এ আলী
গ্রাম-কৃষ্ণপুর, ডাক-কালানী, থানা-সিংরা,
রাজশাহী, নৌ-নং-৬৪০৫১১

এল/এস এম জি সরোয়ার
গ্রাম-বাহারচর পঞ্জনী
নৌ-নং-৬৪০৫১৭

পিও (মেড) মোঃ চাঁদ মিয়া
গ্রাম-রামপট্টী, ডাক-রহমতপুর
থানা-বাবুগঞ্জ-বরিশাল, নৌ-নং-৬৪০৫২৩

এল/এস এম এ রহমান
গ্রাম-বেদীখানপুর, ডাক-গোয়াতলী, থানা-
মহেশপুর, যশোর, নৌ-নং-৬৪০৫২৭

এম এএ, এ এম এম আলম
গ্রাম-চড়সুক তৈয়ব, ডাক-চন্দ্রদিঘুলিয়া
থানা ও জেলা-গোপালগঞ্জ, নৌ-নং-৬৪০৫৫২

এল/এস এম এইচ রহমান খান
গ্রাম ও ডাক-কদমতলী, থানা ও জেলা-
পিরোজপুর, নৌ-নং-৬৪০৫৫৬

পিও (মেড) এম এ হাকিম
গ্রাম-শক্তিপুর, ডাক-শাহাদতপুর, থানা-
শাহাজাতপুর, পাবনা, নৌ-নং-৬৪০৫৬০

পিও এম এস হক
গ্রাম ও ডাক-কাজিরচর, থানা-মুলাদি,
বরিশাল, নৌ-নং৬৫০০৯৯

পিও (মেড) ফজলুল হক
গ্রাম-দশানী টবগা, ডাক-আমিনবাগ,থানা-
রামগঞ্জ, নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৫০২১২

ইআরএ-২ এম এফ আর হাওলাদার
গ্রাম-মংগলশীং, পোঃ কাকরদা, থানা-
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, নৌ-নং-৬৫০২২৮

সিপিও (মেড) এস জে আহমেদ
গ্রাম-ঘোলা, ডাক-বড়বাড়িয়া, থানা-মোল্লারহাট, বাগেরহাট, নৌ-নং-৬৫০২৫৭

পিও (মেড) এম এ আজিজ
গ্রাম ও ডাক-গানতি, থানা-কুমারখালী কুষ্টিয়া, নৌ-নং৬৫০২৫৮

এল/এস এম এ রাজ্জাক
গ্রাম ও ডাক-কোদালপুর, থানা-গোসাইরহাট, ফরিদপুর, নৌ-নং-৬৫০২৬০

এল/এস এম এম এ খান
গ্রাম-গাগনী, ডাক-পাকগাগনী, থানা-মোল্লারহাট, বাগেরহাট, নৌ-নং-৬৫০২৬৩

পিও (কুক) এম এ এ ফকির
গ্রাম-পনচড়া, ডাক-কান্দারপাড়া, থানা-মকসুদপুর, ফরিদপুর, নৌ-নং-৬৫০২৭০

এল/সিকে এম এইচ কবির
গ্রাম-কুড়বিনিয়া, ডাক ও থানা-বেতাগী জেলা-পটুয়াখালী, নৌ-নং-৬৫০২৭৩

এল/এস এম আই পাটোয়ারী
গ্রাম-হোতাতিয়া, ডাক-কিশোরী, থানা-রামগঞ্জ, নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৫০৩৫৩

এল/এস এম এ মতিন
গ্রাম-খাকুরিয়া, ডাক-পুপাচড়া থানা ও জেলা-লক্ষীপুর, নৌ-নং-৬৫০৩৬৩

এল/এমএ এস এম ঈসা
গ্রাম-রোবার্টসংগঞ্জ, ডাক-আলমনগর, থানা-কোতয়ালী, রংপুর, নৌ-নং-৬৫০৪৬২

ইআরএ-২ এম আর ইসলাম
গ্রাম ও ডাক-খৈলশাটি, থানা-কেন্দুয়া, নেত্রকোনা, নৌ-নং-৬৫০৪৬৯

সিপিও(এস) এম টি হোসেন
গ্রাম-দক্ষিণ শেমুলিয়া, ডাক-মেগালয়, থানা-দোহার, ঢাকা, নৌ-নং-৬৫০৪৮৭

এল/এস সালেহ মোহাম্মদ
গ্রাম-আলীপুর, ডাক-ওয়ারূক, থানা-হাজীগঞ্জ, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৫০৪৯৩

পিও এম ইদ্রিস
গ্রাম-নলদিয়া, ডাক-নবীপুর, থানা-সেনবাগ জেলা-নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৫০৫০৮

সিপিও (সিকে) এম এইচ রহমান
গ্রাম-সাহেবের চড়, ডাক-গোয়ালগ্রাম, থানা-কাশিয়ানী, ফরিদপুর, নৌ-নং-৬৫০৫৩৫

পিও এম জি মোস্তফা
গ্রাম-কাঞ্জনপুর, ডাক-নোয়াখালী, থানা-সুধারাম, নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৬০১৯৩

সিআরএস এম কে উদ্দিন
গ্রাম-ঈসাখালী, ডাক-মনবারহাট, থানা-মিরেশরাই, চট্টগ্রাম, নৌ-নং-৬৬০২০১

পিও এম হাশেম
গ্রাম-খারজাতহাক, ডাক-চিলমারি, থানা-দৌলতপুর, কুষ্টিয়া, নৌ-নং-৬৬০২১১

এলএমই এম এ রশিদ
গ্রাম-ঘুলিয়া, ডাক-বিনোদপুর, থানা-মোহাম্মদপুর, যশোর, নৌ-নং-৬৬০২২৪

এমসিপিও (এস) এম এইচ কবির
গ্রাম-পূর্ব নৈয়রী, ডাক-নৈয়রী বাজার, থানা-মতলবগঞ্জ, চাঁদপুর, নৌ-নং-৬৬০৪২৬

এলএস এম এম আলী
গ্রাম-খারখারিয়া, ডাক-রমা, থানা-চিলমারী, রংপুর, নৌ-নং-৬৬০৫৫৭

সিপিও (রাইটার) এম এ আলী
গ্রাম-সিতকা, ডাক-কালিসুরী, থানা-বাউফল, পটুয়াখালী, নৌ-নং-৬৬০৫৮৬

ইএ-৩য় এস এ কে ভূঞা
গ্রাম-ডালটা, ডাক-ডালটাবাজার, থানা-রামগঞ্জ, নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৬০৫৯৯

পিও (মেড) এম এফ হক
গ্রাম-টিলাতলী, ডাক-পঞ্চগাছিয়া, থানা-দাউদকান্দি, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৬০৬০৬

সিপিও এম এস উদ্দিন
গ্রাম-পটুয়াকান্দি, ডাক-মোহনপুর, থানা-মতলব, চাঁদপুর, নৌ-নং-৬৬০৬১৩

পিও (আর) এম এ কুদ্দুস
গ্রাম-বস্তা, ডাক-বালসিদ, থানা-হাজীগঞ্জ, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৭০১২২

এমএএ এম ডি হোসাইন
গ্রাম-তনপুর, ডাক-কদমতলী, থানা-দাউদকান্দি, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৭০১২৪

এলএস এ এস পাটোয়ারী
গ্রাম-মহেশদি, ডাক-শাহাতলী, থানা ও জেলা-চাঁদপুর, নৌ-নং-৬৭০১৪৭

এলইএন এম বি উদ্দিন
গ্রাম-পাখিউড়া, ডাক-তাপুরচড়, থানা-রউমারী, রংপুর, নৌ-নং-৬৭০১৪৯

পিও (সিকে) এম এ এস মিয়া
গ্রাম-বাশকান্দি, ডাক-বান্দুরীকান্দি, থানা-বাশকান্দি, ফরিদপুর, নৌ-নং-৬৭০১৬০

এমএএ এম কে আলম
গ্রাম-চড়ফাজিলপুর, ডাক-জুমারবাড়ী, থানা-শারিয়াকান্দি, বগুড়া, নৌ-নং-৬৭০১৮৩

এলএসএ এম এ মান্নান
গ্রাম-বাগিচাপুর, ডাক-নারায়নপুর বাজার থানা-মতলবগঞ্জ, চাঁদপুর, নৌ-নং-৬৭০১৯৫

এলএমই এম এন আনোয়ার
গ্রাম-কালুয়াই, ডাক-নৌদুনা, থানা-বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৭০২১২

ইআরএ-৪র্থ এ আর মোল্লা
গ্রাম-গুদনাইল,ডাক-লক্ষীনারায়ন থানা-সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, নৌ-নং৬৭০২১৯

পিও (আর) এম এ রাজ্জাক
গ্রাম-মহিযমারী, ডাক-কাদিমবাড়ী, থানা-রাজৈব, ফরিদপুর, নৌ-নং-৬৭০২২৪

এলএস এম এ আলী
গ্রাম-চারুয়াপারা, ডাক ও খানা-শাহাজাদপুর জেলা-পাবনা, নৌ-নং-৬৭০২৩৬

এলএস এম এ গফুর
গ্রাম-গোসপা, ডাক-বিজরা বাজার থানা-বড়ুয়া, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৭০৪৯১

পিও (মেড) এম এ বারী
গ্রাম-কুল্লা পাতার, ডাক-সালদানাদী, থানা-কসবা, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৭০৪৯৫

সিপিও (কুক) এম এস হুদা
গ্রাম-নিশ্চিন্তপুর, ডাক-ভোরাজগৎপুর থানা-লাকসাম, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৭০৫২০

এলএসএ এম এস হোসাইন
গ্রাম-নওয়াপাড়া, ডাক-মোজাফফরগঞ্জ, থানা-বরুরা, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৭০৫২২

এলএস এ সাত্তার
গ্রাম ও ডাক-তাল শহর, থানা-আশুগঞ্জ, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৭০৫৩০

এমএএ এম এম আহমেদ
গ্রাম-ব্রাহ্মণদিয়া, ডাক-পাচুরিয়া থানা-রাজবাড়ি, ফরিদপুর, নৌ-নং৬৭০৫৩৫

এলএস এম জেড হোসাইন
গ্রাম-কসবা, ডাক-গুহাট, থানাও জেলা-দিনাজপুর, নৌ-নং-৬৭০৫৫৮

পিওসিওয়াই মোঃ শহর আলী
গ্রাম-মহব্বতপুর, ডাক-চড়ডাংগী, থানা-কোতয়ালী, দিনাজপুর, নৌ-নং-৬৭০৫৭০

পিওআরএস এ ইসলাম
গ্রাম-কৌনপুর, ডাক-রূপচড়া, থানা ও জেলা-নোয়াখালী, নৌ-নং-৬৭০৫৮৭

পিও আর এম এ হক
গ্রাম ও ডাক-পারপাটি, থানা-বগুড়া
কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৭০৬২২

পিও (ষ্টুয়ার্ড) এম এ হোসাইন
গ্রাম-বরংগ, ডাক-দামুড্ডা, শরিয়তপুর
নৌ-নং-৬৭০৬৫৪

এলটিও এম এম উদ্দিন
গ্রাম-বেসরগেট, ডাক-কান্দাপাড়া
থানা ও জিলা-বাগেরহাট, নৌ-নং-৬৭০৬৬৭

এল এস এম এন বিশ্বাস
গ্রাম-অনুপনগর, ডাক-বাসুদেবপুর থানা ও
জেলা-চাপাইনবাবগঞ্জ, নৌ-নং-৬৭০৭৫৫

পিও কিউ এ রহমান
গ্রাম ও ডাক-খাগাবাড়াবাড়ী, থানা-ডিমলা,
রংপুর, নৌ-নং-৬৭০৭৫৮

এল/সিকে এম এম হক
গ্রাম-ফরিদপুর, ডাক-খাজাপুর, থানা-ফুলবাড়ী,
জেলা-দিনাজপুর, নৌ-নং-৬৭০৭৬৪

এলআরইএন এম আকবর
গ্রাম-ফুলবাড়িয়া, ডাক-বড়নগর, থানা-বাইদার
বাজার, ঢাকা, নৌ-নং-৬৭০৭৭৮

এল/এস আর আই ইসলাম
গ্রাম-বাঘমারা, ডাক-মংগলকোট, থানা-
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৮০২৯৫

এল/সিকে এলেম উদ্দিন
গ্রাম-খামারপাড়া, ডাক ও থানা-গাইবান্ধা,
রংপুর, নৌ-নং-৬৮০৪৪৫

সিআরএস এ এইচ ভূঞা
গ্রাম-মহেষপুর, ডাক-কালিদাহা, থানা ও
জেলা-ফেনী, নৌ-নং-৬৮০৪৭১

এলসিকে এম কে উদ্দিন
গ্রাম-মহিরখাইয়া, ডাক-উথারি, থানা-
গফরগাঁও ময়মনসিংহ,নৌ-নং-৬৮০৪৭৭

সিপিও (রাইঃ) এইচ এ খালেক
গ্রাম ও ডাক-লেংগুটিয়া, থানা-মেহেন্দীগঞ্জ
জেলা-বরিশাল, নৌ-নং-৬৮০৪৭৮

ইআরএ-৩য় এম এ বাশার
গ্রাম-হাইচড়া, ডাক ও থানা-ছাগলনাইয়া
জেলা-ফেনী, নৌ-নং-৬৯০২৪১

ইআরএ-৪র্থ এম এ এল মজুমদার
গ্রাম-নেসারালপুর, ডাক-জুকটিখোলা বাজার
থানা-লাখসাম, কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৯০২৪৫

ইআরএ-৩য় এম আর এ তালুকদার
গ্রাম-শাপদী, ডাক-বগড়া বাজার, থানা ও
জেলা-চাঁদপুর, নৌ-নং-৬৯০৩৯৮

ইআরএ-৩য় আর সি বড়ুয়া
গ্রাম-কাশানপুর, ডাক ও থানা-লাখসাম,
কুমিল্লা, নৌ-নং-৬৯০৪০৪

আরইএ-৩য় এম আর আমিন
গ্রাম-দক্ষিণ উদমারা, ডাক-হায়দরগঞ্জ, থানা-
রায়পুর, লক্ষীপুর, নৌ-নং-৬৯০৪২৩

ইআরএ-৩য় এম এ সোবহান
গ্রাম, ডাক ও থানা-আলমডাংগা
জেলা-কুষ্টিয়া, নৌ-নং-৬৯০৪৩৫

এবি এম এইচ রশিদ
গ্রাম-ভাত্তাচিরবাগ, ডাক-পেয়ারচাশর,
থানা+জেলা-মুন্সিগঞ্জ, নৌ-নং-৬৯০৪৩৭

এল/মিউজ এম আর ইসলাম
গ্রাম-মতশারংগার, ডাক-কায়েম কুলা,
থানা-ঝিকরগাছা, যশোর, নৌ-নং-৭০০২০৯

এমসিপিও (জিআই) এম আলমগীর
গ্রাম-চকমাজি ঘাটি, ডাক-গোয়ালগ্রাম, মাদ্রাসা,
থানা-মকসুদপুর, গোপালগঞ্জ নৌ-নং-৭২০০০১

এলটিও এম আলম
গ্রাম-নাহারপুর, ডাক-মহাজনহাট, থানা-
মিরেরশরাই, চট্টগ্রাম, নৌ-নং-৭২০০০৩

টিও -১ এম এস উল্লা
গ্রামও ডাক-চড়হাজারি, থানা-কোম্পানীগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী, নৌ-নং-৭২০০০৪

আরইএন-১ এম এ হোসাইন
গ্রাম ও ডাক-ডাশার, থানা-কালকিনী, ফরিদপুর, নৌ-নং-৭২০০০৫

এলটিও এম এন আমিন
গ্রাম-নয়াহাট, ডাক-আদমপুর, থানা-অটোগ্রাম, ময়মনসিংহ, নৌ-নং-৭২০০০৬

এলআরইএন, এম আর আই খান
গ্রাম-কাটাদিয়া, ডাক-চড়ামদ্দী, থানা-বাকেরগঞ্জ, বরিশাল, নৌ-নং-৭২০০০৭

আরও-১ এম এস সামাদ
গ্রাম-সরনগোস, ডাক-ধানুকা, থানা-পালং, ফরিদপুর, নৌ-নং-৭২০০০৮

এমই-১ এম এন ইসলাম
গ্রাম-চড়মট ভাংগা, ডাক-মতিভাংগা, থানা-নাজিমপুর, বরিশাল, নৌ-নং-৭২০০০৯

এবি এম এ এস মোল্লা
গ্রাম-বরকুজা, ডাক-ডাকুয়ারহাট, থানা-উজিরপুর, বরিশাল, নৌ-নং-৭২০০১০

পিও (এস) এম এইচ কবির
গ্রাম-মিটাপুর, ডাক ও থানা-আলফাডাংগা, জেলা-ফরিদপুর, নৌ-নং-৭২০০১১

পিও(এস) বি এ খান
গ্রাম-বাটারা, ডাক-বাটারা বাজার, থানা-মকসুদপুর, গোপালগঞ্জ, নৌ-নং-৭২০০১২

এমসিপিও (এস) এ রহমান
গ্রাম-তালিবপুর, ডাকঘর-ইরতা, থানা-সিরগাইর, ঢাকা, নৌ-নং-৭২০০১৩

এলটিও এম এ হোসাইন
গ্রাম-পানাকান্দি, ডাক-জুহাপুর, থানা-দাউদকান্দি, কুমিল্লা, নৌ-নং-৭২০০১৪

এলআরইএন এস আলী
গ্রাম-নওদাগ্রাম, ডাক ও থানা-মহেশপুর, জেলা-ঝিনাইদহ, নৌ-নং-৭২০০১৫

আরইএন-১ এ গফুর
গ্রাম ও ডাক-চরমুগুরিয়া, থানা ও জেলা-মাদারিপুর, নৌ-নং-৭২০০১৬

এলআরও বি উদ্দিন
গ্রাম-রামচন্দ্রপুর, ডাক-বোনারপাড়া, থানা-গবিন্দগঞ্জ, রংপুর, নৌ-নং-৭২০০১৭

পিও (আরএস) জে হক
গ্রাম-বারিনাবাড়ী, ডাক-নাকাইহাট, থানা-পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা, নৌ-নং-৭২০০১৮

এল/এস এম এ গফফার
গ্রাম-হরিনাথপুর, ডাক-বাটিয়া, থানা-পলাশবাড়ী, রংপুর. নৌ-নং ৭২০০১৯

এলআরইন এম এ হাকিম
গ্রাম-বেতিল, ডাক-বেতিল হাট খোলা, থানা-চৌহালি, পাবনা, নৌ-নং-৭২০০২০

এল/সিকে এস কে এস আলম
গ্রাম-শাহপুর, ডাক-হাবাশপুর, থানা-মহেশপুর, যশোর, নৌ-নং-৭২০০২১

এলপিএম এম এ রাজ্জাক
গ্রাম-দাসাদী, ডাক-শফরমালী, থানা ও জেলা-চাঁদপুর, নৌ-নং-৭২০০২২

পিএম-১ এস হক
গ্রাম ও ডাক-দেওলা, থানা-বোরহানউদ্দিন, জেলা-ভোলা, নৌ-নং-৭২০০২৩

আরইএন-১ এস মন্ডল
গ্রাম ও ডাক-মাটিভাংগা, থানা, নাজিরপুর, বরিশাল, নৌ-নং-৭২০০২৪

এল/এস এম এন উদ্দিন
গ্রাম-নাওতলা, ডাক-মাধাইয়া, থানা-চান্দিনা, কুমিল্লা, নৌ- নং-৭২০০২৫

এবি এম জি হোসাইন
গ্রাম-চৌগাছিয়া, ডাক-পাতকেলঘাটা
থানা-তালা, সাতক্ষীরা, নৌ-নং-৭২০০৬৫

ইএ-৪র্থ এম রহমান
গ্রাম ও ডাকঃ পটুয়াখালী, থানা-শ্যামনগর,
জেলা-খুলনা নৌ-নং-৭২০০৬৬

এ বি এম ওয়াই সিকদার
গ্রাম-সাতগরিয়া, থানা-সিবেরহাট
থানা-সন্দ্বিপ, চট্টগ্রাম, নৌ-নং-৭২০০৬৭

ইএ-৪র্থ এম আই ভূইয়া
গ্রাম-কুঞ্জশ্রীপুর, ডাক-গুনাবাড়ী, থানা-
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা, নৌ-নং-৭২০০৬৮

এল/এস এম এস রহমান
গ্রাম-বজরা, ডাক-পানাইল, থানা-আলফাডাংগা
ফরিদপুর, নৌ-নং-৭২০০৭০

এলইএন এম শাহজাহান
গ্রাম-আমনউল্লাপুর, ডাক-কামালপুর, থানা-
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী, নৌ-নং-৭২০০৭১

এ বি এম কে রহমান
গ্রাম ও ডাক- গোপালপুর, জেলা-কুমিল্লা,
নৌ-নং-৭২০০৭২

এ বি এ মালেক
গ্রাম-ইয়ারপুর, ডাক-সমিরমুন্সির হাট
থানা-সেনবাগ, নোয়াখালী, নৌ-নং-৭২০০৭৩

এল/এস এম এম এইচ মোল্লা
গ্রাম ও ডাক-মাকরাইল, থানা-লেগাহাগরা
জেলা-যশোর, নৌ-নং- ৭২০০৭৪

এল/এস এম জি উদ্দিন
গ্রাম-রামাপুর, ডাক-আমিনবাগ, রামগঞ্জ,
জেলা-নোয়াখালী, নৌ-নং-৭২০০৭৫

এল/এস এস এম জেড হক
গ্রাম ও ডাক-দাত্রাবাদ, থানা-গৌরনদী,
বরিশাল, নৌ-নং-৭২০০৭৬

এ বি এম জে হোসাইন
গ্রাম ও ডাক-পুরকারা, থানা-বেগমগঞ্জ,
নোয়াখালী, নৌ-নং- ৭২০০৭৭

এ বি এম এন উদ্দিন
গ্রাম-ব্রাহ্মণখালী, ডাক-বরিয়াবাজার, থানা-
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ, নৌ-নং-৭২০০৭৮

এ বি এম জেড আহমেদ
গ্রাম ও ডাক- রোসাগ্গীরী, থানা-ফটিকছড়ি
জেলা-চট্টগ্রাম, নৌ-নং-৭২০০৭৯

পিও এম এন হক
গ্রাম-টংকী, ডাক-মেছতা, থানা ও জেলা-
জামালপুর, নৌ-নং-৭২০০৮০

এবি এম এম হক
গ্রাম ও ডাক-এখলাসপুর, থানা-মতলব,
জেলা-চাঁদপুর, নৌ-নং-৭২০০৮২

ইএ-৪র্থ এম এন ইসলাম
গ্রাম ও ডাক-তেলীখালী, থানা-ভান্ডারিয়া,
পিরোজপুর, নৌ-নং-৭২০০৮৩

ইএ-৪র্থ এন আর শাহা
গ্রাম-জোয়ালিয়া, ডাক-ঘাটাইল, থানা-
কোতয়ালী, ময়মনসিংহ, নৌ-নং-৭২০০৮৪

এলপিএম এইচ রশিদ
গ্রাম-ইনকার, ডাক-ডারুল আমান, জেলা-
ফরিদপুর, নৌ-নং-৭২০০৮৫

এল/এস আই আলী
গ্রাম ও ডাক-টগরা, থানা-গওফরগাঁও-
ময়মনসিংহ, নৌ-নং-৭২০০৮৮

আরইএন এম এস ইসলাম
গ্রাম-গোবিন্দপুর, ডাক-মোহনপুরবাজার,
খুলনা, নৌ-নং-৭২০০৯১

আরও-১ এম এ হক
গ্রাম ও ডাক- ইখলাছপুর, থানা-মতলবগঞ্জ,
চাঁদপুর, নৌ-নং-৭২০০৯৪

ইএ-৪র্থ এম শাহজাহান
গ্রাম ও ডাক-মানিকখালী, থানা-পাথরঘাটা, পটুয়াখালী, নৌ-নং-৭২০০২৬

এলটিও এম এ মান্নান
গ্রাম ও ডাক-দক্ষিণ বলাখাল, থানা-হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর, নৌ- নং-৭২০০২৮

আরও-১ এম বি আর তালুকদার
গ্রাম-বারাটী, ডাক-রাজতলা, থানা-মদন, নেত্রকোনা, নৌ-নং- ৭২০০২৯

এবি এম ওয়াই সরদার
গ্রাম-সর্ণঘোষ, ডাক-রায়গঞ্জ, থানা-পালং, ফরিদপুর, নৌ-নং-৭২০০৩০

ইএ-৪র্থ এম এস সিকদার
গ্রাম-বরুরকান্দি, ডাক-পাঠান বাজার, থানা-মতলবগঞ্জ, চাঁদপুর, নৌ-নং-৭২০০৩১

এলটিও এম এ হোসাইন
গ্রাম-হাশিমপুর, ডাক-ইখলাসপুর, থানা-মতলব, চাঁদপুর, নৌ-নং-৭২০০৩২

এবি এম এস উল্লা
গ্রাম ও ডাক-রগী, থানা-হাজীগঞ্জ জেলা-চাঁদপুর, নৌ-নং-৭২০০৩৩

এল/এস এম এস উদ্দিন
গ্রাম-সাতবাড়িয়া, ডাক-বোলাখাল, থানা-হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর, নৌ-নং-৭২০০৩৪

এলআরইএন এমএ এইচ ভূইয়া
গ্রাম-শাখাতলা, ডাক-মাশীকারা, থানা-দেবীদ্বার, কুমিল্লা, নৌ-নং-৭২০০৩৫

এলটিও এ খালেক
গ্রাম ও ডাক-পথিলিয়াকান্দি, থানা-হোমনা, কুমিল্লা, নৌ-নং-৭২০০৩৬

এলআরইএন এ আর জমাদার
গ্রাম ও ডাক-জয়েনশার, থানা-সিরাজদী খান জিলা-মুন্সিগঞ্জ, নৌ-নং-৭২০০৩৭

এবি এস উদ্দিন
গ্রাম-কাল্লানদী, ডাক-সাফারমালী, থানা ও জেলা-চাঁদপুর, নৌ- নং-৭২০০৩৮

এলআরইএন এ উদ্দিন
গ্রাম-নয়ানগর, ডাক-বর্ষীবাজার, থানা-কাপাসিয়া, গাজীপুর, নৌ-নং-৭২০০৩৯

এলআরইন এম এম উদ্দিন
গ্রাম ও ডাক-পড়াগ্রাম, থানা-নবাবগঞ্জ, ঢাকা, নৌ- নং-৭২০০৪৮

ইএ-৪র্থ বি হোসাইন
গ্রাম ও ডাক-মিমানিয়া, থানা-হিজলা, জেলা-বরিশাল, নৌ-নং-৭২০০৫৩

ওডি জে চৌধুরী
গ্রাম-উত্তর আন্ধার মানিক, ডাক-নাজপুনিয়া থানা-ছাগলনাইয়া, ফেনী, নৌ-নং-৭২০০৫৫

এল/সিকে এম এস হক
গ্রাম ও ডাক- এনায়েতপুর, থানা-চৌহালী, পাবনা, নৌ-নং-৭২০০৫৬

এল/সিকে এ কাদের
গ্রাম ও ডাক-কংশনগর, থানা-বুড়িচং, কুমিল্লা, নৌ-নং-৭২০০৫৭

সিপিও (রাইটার) এ রহমান
গ্রাম-শ্রীরামপুর, ডাক-হরিশংকরপুর, মাগুড়া, যশোর, নৌ-নং-৭২০০৬০

পিও (এস) এম আর ইসলাম
গ্রাম-ঘলঘলিয়া, ডাক-শহর শ্রীপুর থানা-দেবহাটা, খুলনা, নৌ-নং-৭২০০৬১

পিও (এস) এ জলিল
গ্রাম-কমলাপুর, ডাক-ইব্রাহিমপুর, থানা-হিরারামপুর, ঢাকা, নৌ-নং-৭২০০৬৩

এসএ-১ এম বি রহমান
গ্রাম-জগন্নাথপুর, ডাক ও থানা-ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, নৌ-নং-৭২০০৬৪

এল/টপ এম কে আলী
গ্রাম-পালামিয়া, ডাক-ভবদিয়া, থানা-রাজবাড়ি, ফরিদপুর, নৌ-নং- ৭২০০৯৮

এ বি এম করিমুল হক
গ্রাম-লেমুয়া, ডাক-লেমুয়া বাজার, থানা ও জেলা-ফেনী, নৌ-নং- ৭৫০১৬১

সিপিও (রাইঃ) এস এম ইমাম হোসাইন
গ্রাম-ডিগ্রীঢাল, ডাক-ডারাকান্দি, জেলা-পাবনা, নৌ-নং-৭৫০১৯৮

এলএমই এম শাহ্ নূর আহমেদ
গ্রাম ও ডাক/থানা-বনবাড়িয়া জেলা-পাবনা, নৌ-নং-৭৫০২৮৮

পিও (অবঃ) এম নজরুল ইসলাম রেজা
গ্রাম-আন্দেরচর, ডাক-সাহেবরামপুর থানা-কালকিনী, মাদারীপুর,নৌ-নং-৭৮০২৭৩

এলএমই মোঃ জহির হাসান
গ্রাম-গোপিনাথপুর, ডাক ও থানা-গোপালগঞ্জ জেলা-গোপালগঞ্জ, নৌ-নং-৭৯০২১৪

এল/এনকে সৈয়দ সহিদুল হক
গ্রাম-ধোপাখালী, ডাক-কামারগালী ডিপারা থানা-কচুয়া, খুলনা, নৌ-নং-৭৬০৫২

এল/এনকে এম ফজলুল হক
গ্রাম-কর্নপুর, ডাক-সুবগ্রাম, থানা ও জেলা-বগুড়া, নৌ-নং- ৭৬০৫৭

সিপাই (এমওডিসি) এম আব্দুর রশিদ
গ্রাম-নায়ারনপুর, ডাক ও থানা-নবীনগর জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৭৬০৬৭

এলআরইএন এ এন আর আহমেদ
গ্রাম-চকদা, ডাক-লনসিং, থানা-নরিয়া,জেলা-শরিয়তপুর, নৌ-নং-৬৭০৭২৬

ইআরএ-৩ কে এম হোসাইন
গ্রাম ও ডাক-আটগ্রাম, থানা-সাটুরিয়া জেলা-মানিকগঞ্জ, নৌ-নং-৬৬০৩৪৯

আরএ-৪র্থ এ রায়হান
গ্রাম-ঈদগা বাড়ী, ডাক ও থানা-কোতয়ালী জেলা-দিনাজপুর

সিআরএসজি আলী আহ্হেদ
গ্রাম-জগন্নাথপুর, ডাক-গংগামন্ডল, থানা-দেবীদ্বার, জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৭৬০৬০০

পিওআরএসজি এম আইফারুক
গ্রাম ও ডাক-দায়চারা, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৭৭০৩১৭

এমই-১ (অবঃ) মোঃ সমসের আলী
গ্রাম-বৈদ্যবাড়ী, ডাক-বরুকাবাজার, থানা-ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ নৌ-নং-৬৪০৫৬৭

ইআরএ-৩য় সৈয়দ মোশাররফ হোসেন
গ্রাম-পূর্ব গিড্যা, ডাক-দারুল আমান, থানা-ভেদরগঞ্জ, ফরিদপুর, নৌ-নং-৬৩২৯৯

এম ই-১ মোঃ মোকাদ্দেস হোসেন
গ্রাম-শোমসপুর, ডাক ও থানা-খোকসা, জেলা-কুষ্টিয়া, নৌ-নং

শহীদ আক্তার উদ্দিন বীর বিক্রম
এ তাহের - ২
গ্রাম-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, থানা-সুধারাম, জেলা-নোয়াখালী

আঃ মোত্তালেব
রুহুল আমিন - ২

আঃ হাই
শহীদ ফজল আলি
দীন মোহাম্মদ

মোঃ ইসমাইল

সিরাজদৌল্লা

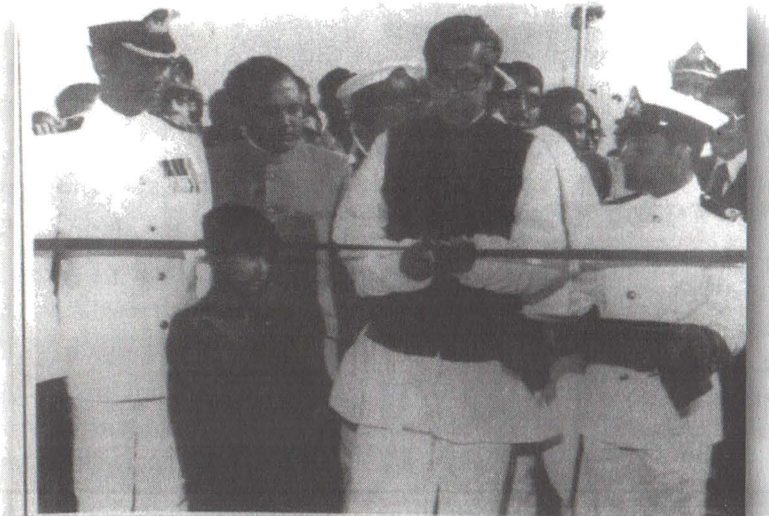
বি জাকের
শহীদ এ,আই সরকার
আমির হোসেন

সিপিও (অবঃ) এম.এ.বারী
গ্রাম-গাগলাইল, ডাক-মাতিয়া, থানা ও
জেলা-কিশোরগঞ্জ, নৌ-নং-৬৪৩৪০

এল/এস এম এন উদ্দিন
গ্রাম-নাওতলা, ডাক-মাধাইয়া, থানা-
চান্দিনা,জেলা-কুমিল্লা, নৌ-নং-৭২০০২৫

মোঃ রফিকউল্লাহ
গ্রাম- কালিকা
ডাক- বাংলাবাজার
থানা- বেগমগঞ্জ
জেলা- নোয়াখালী
নৌ-নং - ৬৫৪৫৭

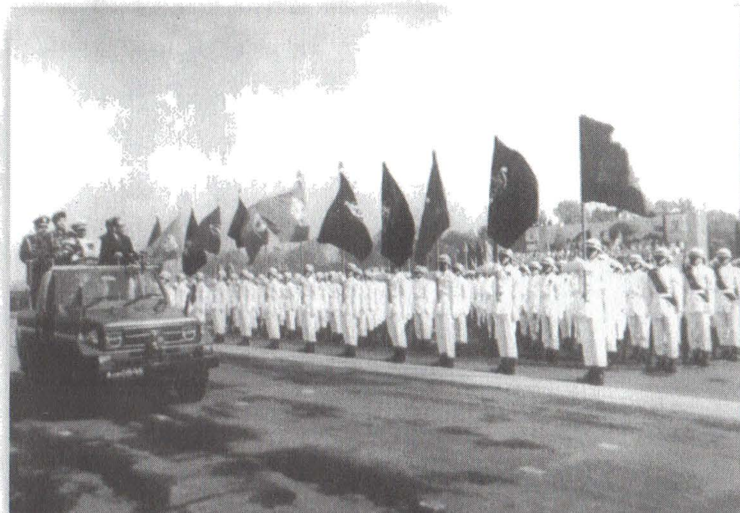
নৌ বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা হুবহু ছাপা হলো। ভুলবশত কোন নৌ মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ পড়ে থাকলে প্রকাশকের ঠিকানায় নাম ঠিকানা পাঠাতে হবে এবং উল্লেখিত তালিকা সম্বন্ধে কারো আপত্তি থাকলে তা জানাতে পারেন। পরবর্তী সংসকরণে সকল নৌ কমান্ডোর বর্তমান ঠিকানা ছাপানোর জন্য প্রত্যেকের বর্তমান ঠিকানা এবং যাঁদের ছবি ছাঁপা হয়নি তাঁদের দু'কপি ছবি পাঠানোর অনুরোধ করছি।



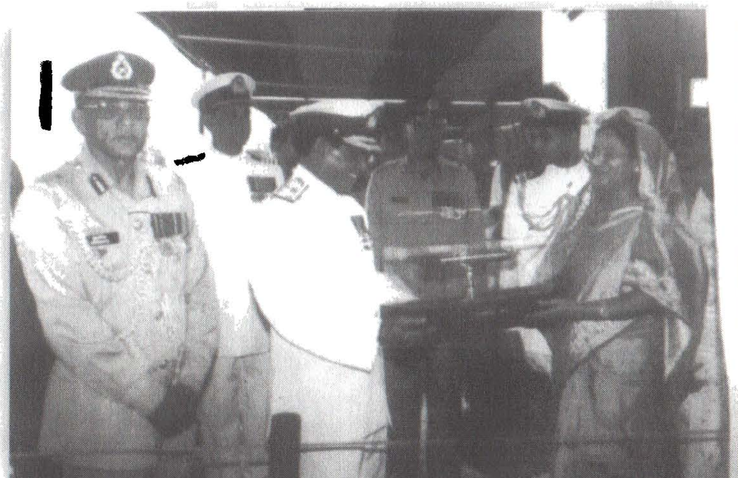
১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামে বা নৌ জা ঈসা খান কমিশন করেন।



স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতি নৌ বাহিনীর সালাম গ্রহণ করছেন। পাশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
ও তিন বাহিনী প্রধানবৃন্দ।



স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতি নৌ বাহিনীর সালাম গ্রহণ করেন।



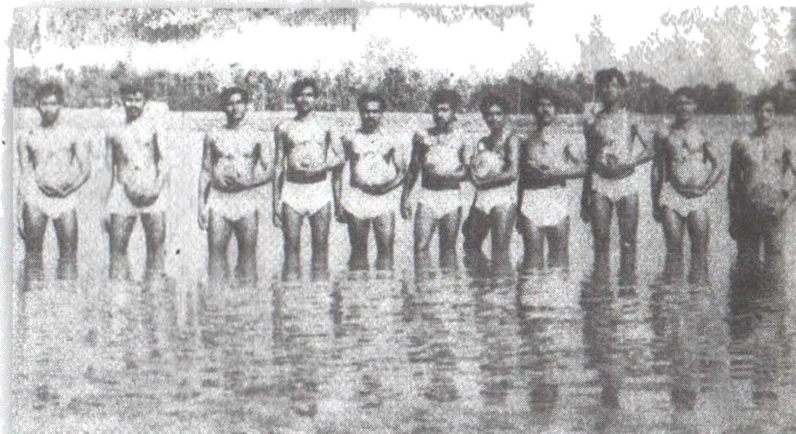
প্রধানমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর প্রধান। পাশে সেনা বাহিনী প্রধান
লেঃ জেঃ মোস্তাফিজুর রহমান বীর বিক্রম।



প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডেটের হাতে সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন।



বা নৌ প ক সংঘের সভানেত্রী বেগম কামরুন্নেসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী **প্রধানের পত্নী মিসেস জনসন কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন।**





নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণের দৃশ্য।
একজন নৌ-কমান্ডোর পেটে সহযোদ্ধা লিমপেড মাইন বেঁধে দিচ্ছেন

Chittagong Port Blocked

Eight Ships Sunk In A Day By Guerrillas

AGARTALA, Aug 25.—Chittagong port is blocked by ships sunk by Bangladesh guerrillas, according to a delayed report from across the border, says UNI.

The report released by the eastern regional headquarters of the Bangladesh forces said seven ships and two barges were sunk on the night of August 15 by a special group of guerrillas in Chittagong port just opposite Jetty No 13.

This and other guerrilla activity had blocked the approach of the port.

An eighth ship was sunk in in the oil jetty the same day.

One of the ships destroyed carried ammunition which was being unloaded.

Liberation army headquarters claimed that 24 men of the special guerrilla squad who participated in the operation all returned safely to base.

An early report had said that guerrillas had sunk seven other ships carrying arms at Mangla port near Khulna about the same time.

Another report said there was a heavy exchange of fire in the Chittagong port area, at the Cantonment and at the airport on the nights of August 16 and 17 between Punjabi and Baluch soldiers. Three officers and 20 other ranks were killed in the clash and many were injured. A large number of Baluchis who were on sentry duty at the port were shot dead.

CURFEW IMPOSED

The Pakistan Army authorities have imposed curfew in the Chittagong port area and in the Karnafully river bed.

In Mymensingh district, guerrillas sank two Pakistan Army speedboats and badly damaged a motor launch at Chelipara Char on August 19.

According to PTI reporting from Mujibnagar guerrillas recently demolished two bridges in the Meherpur area in Kushtia district and damaged a railway station at Arani in Rajshahi district.

In the Sylhet sector, an Army contingent was attacked on August 13 at Sasana Bazar in the Shamshernagar area by freedom fighters who captured a motor launch and three cargo boats. Several troops were killed.

Guerrilla units killed at least 75 Pakistan troops including a dozen Razakars in several ambushes in the three districts of Noakhali, Sylhet and Comilla during the period from August 17 to 21.

১৫ আগস্ট ১৯৭১। বাংলাদেশের বন্দরে জাহাজ ডুবির পরে কলকাতার স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার রিপোর্ট।
সৌজন্যে ঃ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।



অপারেশন জ্যাকপট অভিযানে নৌ-কমান্ডোরা মংলা বন্দরের উদ্দেশ্যে **রায় মঙ্গল নদী পাড়ি দিচ্ছেন।**



মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে নৌ-কমান্ডোদের স্মৃতিস্মারক গ্রহণ করছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান



নৌ বাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল আবু তাহের'র হাতে নৌযুদ্ধের ইতিহাস সংবলিত গ্রন্থ 'মুক্তিযুদ্ধ ও নৌ-কমান্ডো অভিযান' তুলে দিচ্ছেন গ্রন্থকার। পাশে বদিউল আলম বীরউত্তম ও সাবমেরিনার আবেদুর রহমান বীর বিক্রম।